ইতিহাস-পুরুষ

নেতাজী

এই গ্রন্থে এমন এক মানুষের কথা বলা হয়েছে যিনি আমাদের এই লৌকিক জগতের অধিবাসী হয়েও আপন অনন্য সাধারণ কর্ম-ক্ষমতায় অলৌকিক প্রতিভাধর এক পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছেন।

বিশ্ব-ইতিহাসের যে অধ্যায়গুলিতে সংগ্রামী জন-নায়কদের উজ্জ্বল উপস্থিতি, সেখানে প্রদীপ্ত মহিমায় বিরাজ করছেন ইতিহাস-পুরুষ নেতাজী।

মানুষ যখন নিজের সীমার বন্ধনকে ছিন্ন করে অগ্রসর হয় তখনই তার মধ্যে ধীরে ধীরে জেগে ওঠেন মহামানব। সুভাষচন্দ্র কেবলমাত্র নিজের স্বার্থের গণ্ডীকেই লঙ্ঘন করে যান নি, তিনি তাঁর সাধনার শক্তিতে অতিক্রম করে গেছেন দেশকালের সীমা-রেখাকে। নেতাজী তাই বিশ্বের প্রতিটি সংগ্রামী মানুষের কাছে এক অবিনশ্বর প্রেরণার উৎস। এই গ্রন্থ সেই রহস্যময় পুরুষের প্রায়-অলৌকিক কর্মজীবনের এক সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস।

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

ইতিহাস-পুরুষ

নেতাজী

এই গ্রন্থে এমন এক মানুষের কথা বলা হয়েছে যিনি আমাদের এই লৌকিক জগতের অধিবাসী হয়েও আপন অনন্য সাধারণ কর্ম-ক্ষমতায় অলৌকিক প্রতিভাধর এক পুরুষে রূপান্তরিত হয়েছেন।

বিশ্ব-ইতিহাসের যে অধ্যায়গুলিতে সংগ্রামী জন-নায়কদের উজ্জ্বল উপস্থিতি, সেখানে প্রদীপ্ত মহিমায় বিরাজ করছেন ইতিহাস-পুরুষ নেতাজী।

মানুষ যখন নিজের সীমার বন্ধনকে ছিন্ন করে অগ্রসর হয় তখনই তার মধ্যে ধীরে ধীরে জেগে ওঠেন মহামানব। সুভাষচন্দ্র কেবলমাত্র নিজের স্বার্থের গণ্ডীকেই লঙ্ঘন করে যান নি, তিনি তাঁর সাধনার শক্তিতে অতিক্রম করে গেছেন দেশকালের সীমা-রেখাকে। নেতাজী তাই বিশ্বের প্রতিটি সংগ্রামী মানুষের কাছে এক অবিনশ্বর প্রেরণার উৎস। এই গ্রন্থ সেই রহস্যময় পুরুষের প্রায়-অলৌকিক কর্মজীবনের এক সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস।

আমাদের প্রকাশনায়

লেখকের

আর একখানি গ্রন্থ

কৃষ্ণকথা চিরন্তনী

দাম ঃ বারো টাকা

ইতিহাস-পুরুষ

নেতাজী

কালীপদ সরকার

১৩৮৬

প্রথম সংস্করণ :
মাঘ, ১৩৮৬ : জানুয়ারী, ১৯৮০

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা৭০০ ০৭৩
৯৪ সাউথ মালাকা : এলাহাবাদ ২১১ ০০১
১০২ প্রসাদ চেম্বার্স : অপেরা হাউস : বোম্বাই ৪০০ ০০৪
৩৮৩১ পাতৌদি হাউস রোড : নতুন দিল্লী ১১০ ০০২

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্যামল সেন

মুদ্রক :
বংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা ৭০০ ০০৯

দাম :
কুড়ি টাকা

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় দাদা—

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একনিষ্ঠ সহকর্মী

হেমন্তকুমার বসুর

স্মৃতির উদ্দেশে—

সর্বদেশে আর সর্বকালে একমাত্র দুঃখ
বরণ আর আত্মাহুতির ভেতর দিয়েই
আদর্শ সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে।

—সুভাষচন্দ্র

ভূমিকা

ইতিহাস-পুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন-কাহিনী রূপকথার ন্যায় বিস্ময়কর রোমাঞ্চময়, শেষ অধ্যায় যার এখনো রহস্যাধাঁরে আবৃত। কোন দেশনায়ক নেতাজীর ন্যায় এমন বিশ্বব্যাপী কৌতূহল সৃষ্টি এবং শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হন নি। নেতাজী তাঁর জীবন-প্রভাতে বলেছিলেন, "স্বদেশ-সেবা আমি সাময়িক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করিনি, স্বরাজলাভের পুণ্য প্রচেষ্টাই আমার জীবনের তপঃ ও স্বধ্যায়, আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান।" তাঁর জীবন সেই বাণীর মূর্ত অভিব্যক্তি-ভাস্বর।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অবদান শুধু বিরাটই নয়, বৃহত্তম। নেতাজী বিজয়ী বীরের ন্যায় স্বদেশে ফিরে আসতে পারেন নি, কিন্তু ফিরে এসেছিল নেতাজীর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আত্মদানব্রতী আজাদ হিন্দ ফৌজ, তারা সঙ্গে করে এনেছিল নেতাজীর সংগ্রামী ঐতিহ্য, নির্ভীক কর্মনিষ্ঠা এবং অলৌকিক দেশ-প্রেমের প্রাণবন্ত অভিজ্ঞান-আলেখ্য। দিল্লীর লালকেল্লার সামরিক আদালতে বন্দী সেনানীদের বিচারকালে যেদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের শৌর্য, দেশপ্রেম এবং আত্ম-বলিদানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তা ছড়িয়ে গেল সারা ভারতবর্ষে, সেদিন এক অদৃশ্য তড়িৎ-প্রবাহে বিদ্রোহমুখর হয়ে উঠল সমগ্র দেশ। সেই বহ্নি-প্লাবনে নিশ্চিহ্ন হল ব্রিটিশ ভীতি-মোহ-ইন্দ্রজাল। সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী-শাসকের নির্ভরস্থল সেনাবাহিনার আনুগত্য ঘোর সংশয়াকুল হল। লালকেল্লার আদালতে অবশেষে বিচারক ব্রিটিশ সরকারকেই বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে প্রকারান্তরে দাঁড়াতে হল অপরাধীর কাঠগড়ায়। নেতাজীর জয় সম্পূর্ণ হল। বাকী রইল শুধু লালকেল্লার চূড়ায় ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করতে।

তার জন্যও বেশীদিন বিলম্ব করতে হল না। আজাদ হিন্দ ফৌজের ঐতিহ্য এবং নেতাজীর নাম-প্রবাহে ভারতের জনসমুদ্র সহসা উন্মোথিত হয়ে উঠল, এগিয়ে এল ছাত্র ও যুবার দল। বিদ্রোহ করল বোম্বাই-এর উপকূলে ইংরাজের ভারতীয় নৌ-বাহিনী। নৌ-বিদ্রোহ দমনে ভারতীয় সেনাদল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে গুলীগোলা ছুড়তে অসম্মত হল। বৃহত্তর বিস্ফোরণের সঙ্কেত উদ্বিগ্ন করল ইংরাজ সরকারকে। যুদ্ধক্লান্ত, মধ্য ইউরোপে সোভিয়েত রাশিয়ার বিস্তার প্রতিরোধে নিযুক্ত, ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে নব বিদ্রোহোন্মুখ ভারতের সম্মুখীন হওয়া সম্ভবপর হল না। ইংরাজ ভারত সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে গেল।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর, ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড এটেলি ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। লর্ড এটেলীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে এই ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটেছিল। কলকাতার রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কথা প্রসঙ্গে লর্ড এটেলীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয় করবার পর ব্রিটিশ এত শীঘ্র ভারত সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে গেল কেন ?' উত্তরে লর্ড এটেলি এক কথায় বলেছিলেন 'It was because of Subhas Bose.' [সুভাষচন্দ্র বসুর জন্যই]।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন ঃ

"গান্ধীজীর সত্যাগ্রহই যে আমাদের স্বাধীনতালাভের একমাত্র কারণ—এটাকে জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ বলে এখন আর অনেকেই গ্রহণ করতে চান না। অপপ্রচারের ফলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে যে সত্যটা চাপা পড়েছিল তা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে। এখন অনেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নেতাজীর অবদানও খুব বড়।

"নেতাজীর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য চিরদিন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে এক প্রধান স্থান লাভ করবে। গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে একে একে কংগ্রেসের সকল নেতারা নিজেদের বিচার-বুদ্ধি গান্ধীজীর পাদপদ্মে বিসর্জন দিয়ে অন্ধ বিশ্বাসে তাঁর নির্দেশমত চলেছেন। পণ্ডিত

জওহরলাল নেহরু তীব্র ভাষায় গান্ধীজীর মত ও পথের প্রতিবাদ করেছেন—কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, গান্ধীজীর সম্মোহন শক্তি এত প্রভাবশালী ছিল যে, মুখে প্রতিবাদ করলেও তিনি কাজের বেলায় গান্ধীজীর অনুসরণ না করে পারেন নি। এই যুগে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কেবল সুভাষচন্দ্র বসুই গান্ধীজীর নির্দেশিত পথে না চলে ভারতের মুক্তিলাভের অন্য উপায় নির্ধারণ করার সাহস ও শক্তি দেখিয়েছেন, আর কেবল উপায় নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁর নির্ধারিত পথে অগ্রসর হয়েছেন।”

একদিন ইংরাজদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভারতের কিছু লোক বলেছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জার্মানী এবং জাপানের ক্রীড়নক। সে কথার উত্তর দেওয়া এখন অনাবশ্যক। বিষয়টি দুঃখজনক নির্বুদ্ধিতা ও হীনমন্যতার স্বাক্ষর মাত্র। তবুও দুজন নিরপেক্ষ বিদেশী মণীষীর উক্তি এ সম্পর্কে উদ্ধৃত করছি। এঁরা সেমিনারের নিমন্ত্রিত অতিথি কিংবা তোষণ-প্রয়াসী রাজনীতিক নন।

জার্মানীর বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডঃ ভৈগট তাঁর ‘ইণ্ডিয়ান ইমেজ অব জার্মানী’ গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন: “সুভাষচন্দ্র বসু নাৎসি-দল এবং জার্মান জাতি সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। যেহেতু তিনি হিটলারের সহিত হাত মিলিয়েছিলেন, সেজন্য তিনি ফ্যাসিবাদের সমর্থক ছিলেন, এ কথা সত্য নয়। যুদ্ধের প্রথম পর্বে জার্মানীর অসামান্য সাফল্যে মিঃ বসু আকৃষ্ট হলেও হিটলারের নীতিতে তিনি অসুখী ছিলেন।

“নাৎসি-দলের কর্মকুশলতা মিঃ বসুর নিকট প্রশংসার যোগ্য বিবেচিত হলেও, নীতির দিক থেকে তা ছিল তাঁর নিকট অপরিসীম ঘৃণার বস্তু। স্বদেশের স্বাধীনতালাভের মহান উদ্দেশ্যই নাৎসিবাদের প্রতি তাঁর ঘৃণাকে অতিক্রম করে তাঁকে হিটলারের সহিত মিলিত করেছিল।”

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি সিঙ্গাপুরের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক চিয়াং হাই

ডিঙ-এর প্রবন্ধ থেকে। অধ্যাপক চিয়াং হাই ডিঙ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র পরিচালিত মুক্তি সংগ্রামের একজন প্রত্যক্ষ দর্শক। তিনি সিঙ্গাপুরের প্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক 'Straits Times' পত্রিকায় From a Colonial Port to Island Nation শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি অমৃতবাজার পত্রিকায় ১১।৮।৮৬-তে পুনঃ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে অধ্যাপক চিয়াং হাই ডিঙ নেতাজী প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

"নেতাজী জাপানের তাঁবেদার অথবা সমর্থক ছিলেন না। প্রতিভাদীপ্ত এই বিপ্লবী নায়ক একমাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে জাপানের সাহায্য নিয়েছিলেন। এ সত্য অনস্বীকার্য যে, (১) নেতাজীর সংগ্রামের ফলেই ব্রিটিশ অধীনতা পাশ থেকে ভারতের মুক্তি ত্বরান্বিত হয়েছিল; (২) ভারতের মুক্তি মালয় ও সিঙ্গাপুরসহ এশিয়ার পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতালাভের পথ সুগম করেছিল। তাই নেতাজী এবং তাঁর সংগ্রামের সহিত যুক্ত প্রতিটি ঘটনা সকল এশিয়াবাসীর নিকট পরম পবিত্র।"

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে নেতাজীর চিন্তাধারা কি ছিল তা নিয়ে কিছু বিতর্ক প্রচলিত আছে। এ সম্বন্ধে নেতাজীর সর্বার্থসাধক কথা হল :

"Free India will not be a land of Capitalists, Landlords and castes. Free India will be a social and political democracy."

শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন গণতন্ত্র সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ এবং কি পন্থায় ভারতবর্ষে সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে নেতাজী তাঁর শেষ কথা বলে যান নি, বলে যাওয়ার সময়ও পান নি।

বিভিন্ন সময়ে লেখা নেতাজীর পত্র, প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ থেকে একটি বিষয়ে কিন্তু নিঃসংশয় হওয়া যায় তা হল নেতাজীর চিন্তা ও কর্মে অধ্যাত্মবোধের প্রভাব এবং তাঁর গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাস।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন-সাধনা ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সহিত এক হয়ে মিশে আছে। নেতাজীর কথা বলতে গিয়ে ভারতের

স্বাধীনতা সংগ্রামের কথাও এসেছে এবং সেই কথা অপক্ষপাত দৃষ্টি ও স্বীকৃত তথ্যের উপর নির্ভর করে বলা হয়েছে।

গ্রন্থে নেতাজীর স্বরচিত মূল্যবান পত্র, বাণী ও বক্তৃতার উদ্ধৃতি পাঠকবর্গের অনুসন্ধিৎসা মেটাবার সহায়ক হবে। বই-এর কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল ইংরাজীর বাংলা অনুবাদ দেওয়া হয়েছে, তবে বিশেষ বিশেষ স্থলে মূল ইংরাজী ভাষ্যও আছে।

শেষ অধ্যায়ে সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে যুক্তি-নির্ভর পথে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের উপর আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।

ইতিহাসে এমন একটি চরিত্রের সন্ধান মিলে না যার সঙ্গে সুভাষ-চন্দ্রের তুলনামূলক আলোচনা চলে। নেতাজী স্বতন্ত্র, নেতাজী অনন্য। সে কথা তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

আমি কারো প্রতিচ্ছবি নই, প্রতিধ্বনি নই, কারো Prototype নই—I am myself."

দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে স্বাধীনতালাভকে কেউই সানন্দে গ্রহণ করেন নি। নেতাজী বার বার এ সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। উপমহাদেশের ভৌগলিক সত্তাকে খণ্ডিত করে বহু অভাবিত জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, জনগণের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হয়নি এবং কল্যাণলাভের পথ সঙ্কুচিত হয়েছে। অবশ্য অনেক আদর্শ স্বপ্নের এমনই পরিণতি ঘটে।

ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়েছে, দেশের নেতৃবৃন্দ স্বীকৃত আদর্শ অনুযায়ী কাজ করতে পারেন নি। বিচ্ছিন্ন উপমহাদেশের অগণিত মানুষের নিকট স্বাধীনতালাভ অর্থহীন হয়ে আছে।

ইতিহাসের গতিপথ কল্পনার চেয়েও বিস্ময়কর। শ্রীঅরবিন্দের কথায়—History is not a teaching, not even a revelation it is a decisive action direct from the Supreme."

ধ্যান-শান্ত ঋষির এই সত্য উপলব্ধির আলোকে নেতাজী সুভাষ-

চন্দ্রের জীবন ও স্বদেশ-ব্রতপালন অনুশীলন করলে নেতাজীর মহান প্রাণ-প্রবাহের সত্যকার ঐশ্বর্য মানসগোচর হয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে ভারতে এবং ভারতের বাইরে বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছে এবং আরও বহু লেখা হবে। প্রবহমান সেই পবিত্র সাধনা-ধারায় আমার শ্রদ্ধার্ঘ্যটুকু মিশিয়ে দিলাম।

গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, সাবমেরিন যাত্রা শেষে নেতাজী পেনাং বন্দরে অবতরণ করেন (১৩৬ পৃঃ) প্রকৃতপক্ষে তা নয়, বন্দরে কিছু অসুবিধা থাকায় সাবমেরিন পেনাং-এর পরিবর্তে নিকটবর্তী সাবাঙ বন্দরে ভিড়ে। নেতাজী সাবাঙে নামেন এবং পেনাং হয়ে বিমানে টৌকিও যান।

গ্রন্থের শেষে আকর গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হয়েছে। ঐ সকল গ্রন্থের লেখকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি মেসার্স রূপা অ্যাণ্ড কোং-এর পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রী ডি. মেহরা এবং বেলঘরিয়া নেতাজী পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমান রণেন্দ্র ব্যানার্জিকে যাঁরা সব সময় মূল্যবান গ্রন্থাদি দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন।

সুভাষচন্দ্রের জীবনপঞ্জীতে তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির সাল ও তারিখ সংযোজিত হয়েছে। সবশেষে আছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বরণীয়দের স্মরণীয় উক্তির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বিচিত্রা।

●

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

●



সুভাষচন্দ্র বসু

"ওই মহামানব আসে।
উদয় শিখরে জাগে 'মাভৈঃ মাভৈঃ'
নব জীবনের আশ্বাসে।"

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী উড়িষ্যার কটক শহরে জন্ম নিলেন মানবলোকের মহাবিস্ময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। এই সময় উড়িষ্যা ছিল বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত। সুভাষচন্দ্রের পিতা শ্রদ্ধেয় জানকী-নাথ বসু ছিলেন কটকের সরকারী উকিল, মাতা ধর্মপ্রাণা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী। সুভাষচন্দ্র পিতামাতার নবম সন্তান।

জানকীনাথের পূর্বনিবাস ২৪পরগনা জেলার কোদালিয়া গ্রামে, যার বর্তমান নাম সুভাষগ্রাম। জানকীনাথ গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের মন্ত্রী ও নৌ-সেনাপতি পুরন্দর খানের (গোপীনাথ বসু) ১৩তম অধস্তন সন্তান। সুভাষচন্দ্রের মাতা হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত বংশের কন্যা। জননীর ধর্মভাব নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র শৈশবে প্রথমে কয়েক বছর মিশনারী পরিচালিত কটকের ইংরাজী স্কুলে এবং পরে রেভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে পড়েন। কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীবেণীমাধব দাসের চরিত্রগুণে সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বেণীমাধব কিশোর ছাত্রের মনে মানবতার উচ্চ আদর্শ ও নৈতিক একনিষ্ঠার গভীর ছাপ এঁকে দেন।

সুভাষচন্দ্রের পিতামাতা ভাইবোন সকলেই সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান। পিতা জানকীনাথ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সহিত জড়িত না থাকলেও, জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে যোগ দিতেন। তিনি এক সময় কটক পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য হন। ১৯১৭ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মতভেদের কারণে জানকীনাথ লাভজনক সরকারী উকিলের পদে ইস্তফা দেন এবং ১৯৩০ সালে তাঁর রায়-বাহাদুর খেতাবটি সরকারকে ফিরিয়ে দেন।

জানকীনাথ বসু ধনী না হলেও সঙ্গতিবান উচ্চ মধ্যবিত্তের দলে পড়তেন। বাড়ী, গাড়ী, পাচক, ভৃত্য সবই তাঁর ছিল। কটকে সম্মান প্রতিপত্তিও কম ছিল না। কিন্তু বালক সুভাষচন্দ্র পার্থিব বৈভব সম্পর্কে কিছুটা উদাসীন ছিলেন। তিনি স্কুলে পড়বার সময় স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থ পাঠে আগ্রহী হন এবং সহপাঠীদের সঙ্গে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য অর্থ সংগ্রহ, পীড়িতের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক চিন্তা তাঁকে প্রভাবিত করে এবং কিশোর বয়সেই তিনি একটি জীবনাদর্শের জন্য উন্মনা হয়ে উঠেন। এ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—"যে আদর্শের জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম তাই পেলাম বিবেকানন্দের বাণীতে, যার জন্য আমার সমগ্র সত্তা উৎসর্গ করতে পারি। বয়স তখন সবে মাত্র পনের। আমার জীবনে এক প্রচণ্ড বিপ্লব ঘটে গেল। বিবেকানন্দ আমার জীবনে প্রবেশ করলেন।"

১৯১৩ সালে সুভাষচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উচ্চ শিক্ষার্থে কলিকাতায় এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি তখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র এবং থাকতেন মির্জাপুর স্ট্রীটের একটি মেসে। তিনি কিছু ভাল ছেলে নিয়ে একটি দল গড়েছিলেন।

অবিবাহিত থেকে দেশসেবা ছিল দলের উদ্দেশ্য। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এই দলের সদস্য ছিলেন। সুভাষচন্দ্র মাঝে মাঝে দলের সভায় যোগ দিতেন। দলের কর্মীরা কুমিল্লায় একটি সেবাকেন্দ্র খোলেন, উহাই পরে অভয়াশ্রম নামে প্রসিদ্ধি পায়।

এই সময় সুভাষচন্দ্র সন্ন্যাস জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এক বন্ধুর সহিত গৃহত্যাগ করেন। লছমনঝোলা, হৃষীকেশ, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, গয়া ভ্রমণ করে মনোমত গুরুর সন্ধান না পেয়ে কিছুটা নিরাশ হৃদয়ে বাড়ী ফিরে আসেন। বাড়ীতে এসে তিনি টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকেন। পড়াশুনার প্রভূত ক্ষতি সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষায় বসেন এবং ১৯১৫ সালে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাশ করেন। তারপর দর্শনে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়া শুরু করেন।

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কাল। বাংলাদেশের কিছু প্রতিভাবান ছাত্র বিপ্লবী গুপ্ত দলে যোগ দেন। তাঁদের সহিত সুভাষচন্দ্রের পরিচয় হয় কিন্তু গুপ্ত সমিতিগুলির সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের প্রতি তাঁর মন সাড়া দেয় না। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সম্বন্ধে তখন থেকেই তাঁর একটি পৃথক নিজস্ব ধারণা গড়ে উঠছিল। ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জির দলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত থাকলেও তিনি দলের আদর্শকে খুব স্পষ্ট এবং বাস্তবানুগ বলে মনে করতে পারেন নি।

১৯১৬ সালের জানুয়ারীতে ছাত্রদের প্রতি অশালীন আচরণের জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক এ. এফ. ওটেন বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত হন। এই দুঃখজনক ঘটনার সহিত সুভাষচন্দ্র প্রত্যক্ষ-ভাবে জড়িত না হলেও, ছাত্রবিক্ষোভের দলনেতা হিসাবে অধ্যক্ষের বিরাগ ভাজন হন এবং কলেজ থেকে তাঁর উপর বহিষ্কারের নোটিশ দেওয়া হয়। এই আদেশের ফলে সুভাষচন্দ্রের পড়াশুনা সাময়িক-ভাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি কলিকাতা ছেড়ে কটক চলে যান।

ঘটনাটির স্মৃতি অধ্যাপক ওটেনের মনে থেকে যায়। সুভাষচন্দ্র

দণ্ডিত হলেও তিনি ঘটনার সহিত জড়িত ছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে মিঃ ওটেনের মনে সন্দেহ ছিল। বহুকাল পরে চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে, ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে অধ্যাপক ওটেন কিছু বই লেখেন। বই-গুলির মধ্যে 'Song of Aton and others' কাব্যগ্রন্থে 'সুভাষচন্দ্র' শিরোনামে একটি কবিতা আছে। কবিতাটি সুভাষচন্দ্রের প্রশস্তিসূচক।

বৎসরকাল কটকে অতিবাহিত করে সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় ফিরে এসে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলেন। কটকে অবস্থান কালে তিনি বেশির ভাগ সময় উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে কলেরা রোগীদের সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকতেন। গ্রামবাসীদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং অসহায় অবস্থা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যয়নকালে সুভাষচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিয়ে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। ফোর্ট উইলিয়মের লিংকনস রেজিমেণ্টের উপর ছিল শিক্ষাদানের দায়িত্ব, কমাণ্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন গ্রে'র আন্তরিক চেষ্টায় বাহিনীটি কয়েক মাসের মধ্যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করেছিল।

১৯১৯ সালে দর্শনে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি. এ. পাশ করে সুভাষচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত মনোবিজ্ঞানে এম. এ. পড়া শুরু করলেন। কিন্তু বেশি দিন এম. এ. পড়া হল না, ১৯১৯ এর ১৫ই সেপ্টেম্বর পিতার ইচ্ছানুসারে আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে তাঁকে ইংলণ্ড যাত্রা করতে হল।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাবহুল যুগ। ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন ব্যর্থ হবার পর দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই যুগে কংগ্রেস ছিল ব্রিটিশ সহযোগী, জনসাধারণ রাজভক্তিপরায়ণ এবং ব্রিটিশের

ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও পুলিস একান্ত ব্রিটিশ অনুগত। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে প্রত্যাশিত স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদীসুলভ কঠোর মনোভাব জাতীয় নেতৃবৃন্দের ক্ষোভের কারণ হল।

১৯১৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক দমনমূলক রৌলাট আইন প্রবর্তন এবং জালিয়ানাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেশবাসীকে যুগপৎ বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ করল। নিদারুণ অসহায় অবস্থার প্রতিকার কল্পে ভাবনা জাগল জনচিত্তে।

জালিয়ানাবাগের হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ বড়লাটকে পত্র লিখলেন এবং সেই সঙ্গে ফিরিয়ে দিলেন তাঁর স্যার উপাধি। ইংরাজ সরকারের প্রতি ভারতবাসীর আনুগত্য ও বিশ্বাসের বাঁধে গভীর ফাটল ধরল।

এদিকে সুভাষচন্দ্র ২৫শে অক্টোবর লণ্ডনে পৌঁছলেন, আই. সি. এস পরীক্ষার তখন মাত্র আটমাস বাকী। তিনি পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং কেমব্রিজে মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানে ট্রাইপোজ সহ ডিগ্রী কোর্সে পড়া শুরু করে দিলেন। কেমব্রিজের স্বাধীন ছাত্র-শিক্ষক পরিবেশ সুভাষচন্দ্রের বেশ ভাল লাগল।

যথা সময়ে সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে সাফল্য অর্জন করলেন এবং কিছুদিন পরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানে ট্রাইপোজ সহ বি. এ. ডিগ্রীও লাভ করলেন। আই. সি. এস. পরীক্ষায় তাঁর সাফল্যের সংবাদে জনকজননী এবং আত্মীয় বন্ধু আনন্দিত হলেন এবং তাঁর নিকট অনেক অভিনন্দন বার্তা আসতে লাগল।

সুভাষচন্দ্রের মনে কিন্তু তখন ভিন্ন স্রোত বইতে শুরু হয়েছে। এক নতুন চিন্তায় তিনি উদ্‌বেল হয়ে উঠেছেন। কিশোরকাল থেকে যে আদর্শ পুরুষ সুভাষচন্দ্রের হৃদয়মন্দিরে আসন পেতে বসেছিলেন তিনি যেন দিব্য মূর্তিতে আর্বিভূত হয়ে তাঁকে বললেন, 'তুমি কোথায়

চলেছ ? তুমি কি ভুলে গিয়েছ তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়ের সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়, তুমি জন্ম হতে মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।' একদিকে পিতামাতা ভ্রাতা প্রভৃতির অভিলাষ পূরণ এবং নিজের নিরাপদ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি, অন্য দিকে বিপদ-দুঃখময় অনিশ্চিত জীবন—দুই বিরুদ্ধ ভাব তরঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মন দোলায়িত হল।

১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে জালিয়ানাবাগ হত্যার নিন্দা ও নব-ঘোষিত মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার আইনের অসারতার কথা বলা হল এবং সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হল। অল্পকাল পরে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে কলিকাতা অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হল এবং অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পিত হল দক্ষিণ আফ্রিকা প্রত্যাগত ব্যারিস্টার, অহিংস বিপ্লবের প্রবক্তা শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর উপর। কংগ্রেসের আদর্শ সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হল—'সর্ব প্রকার বৈধ ও নিরুপদ্রব পন্থায় স্বরাজ লাভ এবং তার জন্য ভারতবাসী মাত্রকেই সাধনায় দীক্ষিত করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য।'

তুর্কীর সুলতান ছিলেন একাধারে সম্রাট এবং মুসলমান জগতের ধর্মগুরু বা খলিফা। প্রথম বিশ্বসমরে তুর্কী পরাজিত হলে তুর্ক-সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে, খলিফার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠে। মুসলমানগণ খলিফার অধিকার ও গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করেন। বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশের নিকট তুর্কীর পরাজয় ঘটেছিল, সে কারণ আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী। ভারতীয় মুসলমানগণও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই আন্দোলন খিলাফত আন্দোলন নামে খ্যাত।

গান্ধীজী প্রস্তাবিত অসহযোগ আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খিলাফত আন্দোলনের সহিত কংগ্রেসের আন্দোলনের সংযুক্তি

ঘটালেন। মুসলমানদের যোগদানের ফলে ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন এক বিরাট গণ-সংগ্রামের রূপ নিল।

বাংলায় খ্যাতনামা ব্যারিস্টার শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর বিপুল উপার্জন এবং রাজোচিত ঐশ্বর্য দেশ সেবায় উৎসর্গ করে আন্দোলনের পুরোধায় এসে দাঁড়ালেন। দেশবাসী তাঁকে সম্মানিত করল 'দেশবন্ধু' আখ্যায়।

অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন লালা লাজপত রায়, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, শ্রীবল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীএন. সি. কেলকার, শ্রীরাজাগোপালাচারী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ মুঞ্জে, মিঃ মোহাম্মদ আলি, মিঃ সৌকত আলি, শ্রীসত্য-মূর্তি, ডাঃ আনসারী, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আন্দোলনে অংশ নিলেন শত সহস্র খ্যাত ও অখ্যাত দেশ সেবক। আন্দোলন পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী পরলোকগত মহারাষ্ট্র নেতা বালগঙ্গাধর তিলকের নামে 'তিলক স্বরাজ ফাণ্ড' খুলে এক কোটি টাকার যে আবেদন প্রচার করলেন, তাতে ভাল সাড়া মিলল। কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যাও কয়েক লক্ষে পৌঁছল।

সরকার গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড, জরিমানা, দৈহিক নির্যাতন প্রভৃতি দমনমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করলেও আন্দোলনের অগ্রগতি রোধ করতে ব্যর্থ হলেন। গান্ধীজী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন—তিনি এক বছরের মধ্যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করবেন।

লণ্ডনে বসে সুভাষচন্দ্র ইতিমধ্যে মন স্থির করে ফেলেছেন। দেশে ফিরে দেববাঞ্ছিত চাকুরী গ্রহণের দ্বারা উপার্জন, ক্ষমতা ও নির্বিঘ্ন জীবন ভোগের আয়ত্ত অভিলভ্যকে দেশজননীর চরণে উৎসর্গ করতে তিনি প্রস্তুত হলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের সিদ্ধান্ত করে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখলেন :

> আপনি বাংলাদেশে আমাদের সেবা যজ্ঞের ঋত্বিক, তাই আপনার নিকট আমি উপস্থিত হয়েছি আমার যৎসামান্য

বিদ্যা-বুদ্ধি ও উৎসাহ নিয়ে। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করবার আমার বিশেষ কিছুই নেই। আছে শুধু নিজের মন এবং তুচ্ছ এই শরীর। আমার আর কিছু দেবার নেই। আজ আমি প্রস্তুত, আপনি শুধু কাজের আদেশ দিন।

সহকারী ভারত সচিব স্যার উইলিয়ম ডিউক এবং সিভিল সার্ভিস বোর্ডের সেক্রেটারি মিঃ রবার্টস সুভাষচন্দ্রকে আই. সি. এস. ত্যাগ না করবার জন্য অনুরোধ জানালেন। স্যার উইলিয়ম এক সময়ে উড়িষ্যার কমিশনার ছিলেন এবং জানকীনাথের সহিত তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি সুভাষচন্দ্রের বড়দাদা শ্রীসতীশচন্দ্র বসুকে দিয়ে সুভাষচন্দ্র যাতে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেন তার চেষ্টা পর্যন্ত করলেন। কিন্তু কোন ফল হল না। সুভাষচন্দ্র তাঁর সংকল্পে অবিচল রইলেন।

১৯২১ সালের ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র তাঁর মেজদাদা শ্রীশরৎচন্দ্র বসুকে লিখলেন :

আমি পথের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছি, এখন আর আপোসের কোন উপায় নেই। হয় আমাকে এই অসার চাকুরী ত্যাগ করে সর্বান্তঃকরণে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ অথবা জীবনে এতদিন যে মহান আদর্শ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এসেছি তাকে বিসর্জন দিয়ে চাকুরী গ্রহণ করতে হবে।

ধীরে ধীরে সুভাষচন্দ্রের মন থেকে সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল। পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়, বন্ধু এবং লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের অনুরোধ কোথায় যেন বিলীন হয়ে গেল। ১৯২১এর ২৮শে এপ্রিল তিনি শ্রীশরৎচন্দ্র বসুকে লিখলেন :

ব্রিটিশ সরকারের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় যে এসে গেছে সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। প্রতিটি সরকারী কর্মচারী, তা তিনি সামান্য চাপরাশী হোন কিংবা প্রাদেশিক গভর্নরই হোন, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের

স্থায়িত্বের পিছনে শক্তি যোগান। সরকারকে উৎখাত করার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হল সরকারের সংশ্রব বর্জন করা। ইহা তলস্তয়ের মতবাদ কিংবা গান্ধীজী ইহা প্রচার করেছেন সেজন্য বলছি না—আমি নিজেই এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি।

কয়েকদিন হল আমি আমার পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছি।

সুভাষচন্দ্র তাঁর এক বন্ধু, কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, শ্রীচারুচন্দ্র গাঙ্গুলীকে লিখলেন :

তুমি জান, কর্তব্যের আহ্বানে একদিন আমি জীবন সমুদ্রে তরী ভাসিয়েছিলাম। তরী এখন এমন একটি বন্দরে পৌঁছেছে যেখানে ক্ষমতা, সম্পদ এবং অর্থ আমার করায়ত্ত। কিন্তু আমার হৃদয়ের অন্তরতম স্থান থেকে কে যেন আমাকে বলছে—'তুমি এতে সুখ পাবে না, বিক্ষুব্ধ সাগর তরঙ্গের উপর নৃত্যছন্দে ভেসে চলার মাঝে তোমার সুখ নিহিত। অন্তরের সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, তরী আজ আবার ভাসিয়ে দিলাম। শুধু তিনিই জানেন এ তরী কোথায় গিয়ে ভিড়বে।

তরুণ ভারত পথিক চললেন দুর্গম অজানা পথে, তাঁর প্রাণে বাজে বাঁধন ভাঙ্গার গান, অন্তরে আত্মোৎসর্গের সুরতরঙ্গ।

"—যে শুনেছে কানে
তাঁহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সংকট আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি ; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।"

॥ ২ ॥

আটলান্টিকের নীল জলরাশি পার হয়ে জাহাজ ভূমধ্যসাগরের বুক বেয়ে সুয়েজ অভিমুখে চলেছে। সমুদ্র তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জাহাজ দুলছে কাঁপছে, তরুণ যাত্রী স্থির অচঞ্চল। সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে চলেছেন, মন তাঁর চিন্তামগ্ন। ইতিমধ্যে তিনি পৃথিবীর নানা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসগুলি আর একবার ভাল করে পড়ে ফেলেছেন, সেই সব সংগ্রামের নেতৃবৃন্দ কি পদ্ধতি ও রণকৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছেন।

বছর দুই আগে ইংলণ্ডে যাবার সময় চিন্তা ছিল নিজের ভবিষ্যৎ ঘিরে, সে চিন্তা আর তাঁর নেই; চিন্তা এখন স্থান নিয়েছে বৃহত্তর পটভূমিতে, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের উপায় উদ্ভাবনায়।

দিনকয়েকের মধ্যেই জাহাজ সুয়েজে পড়ল, জাহাজের গতিবেগ কমল, নিস্তরঙ্গ জল কেটে অর্ণবযান লোহিত সাগরের দিকে চলল। পিছনে পড়ে রইল মানব সভ্যতার এক আদি লীলাভূমি মিশর দেশ আর সেই চিরবিস্ময় পিরামিড। সুয়েজের দুই তীর জুড়ে মরু-বালুচর, মাঝে মাঝে ছায়াঘেরা খেজুর কুঞ্জ। কোথাও বা দুচারটি দীর্ঘদেহী আরব তরুণ তীরে দাঁড়িয়ে, চোখে তাঁদের যেন বিস্ময়-জিজ্ঞাসা। হয়ত তারা মিশরীয় কিংবা পালেস্তাইনবাসী। কদিন আগেও তারা ছিল তুর্ক সাম্রাজ্যের অধীনে, এখন ইংরাজের ম্যাণ্ডেটারী শাসনে। যুদ্ধের সময় ইংরাজ বলেছিল—কুশাসক তুর্কীর

বিরুদ্ধে তোমরা বিদ্রোহ কর, আমরা তোমাদের স্বাধীনতা দেব। তারপর কি হল ? কোথায় গেল সেই প্রতিশ্রুতি ?

লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে জাহাজ ভিড়ল এডেনে। এডেন ভারত সাম্রাজ্যের পশ্চিম রক্ষাদ্বার, পূর্বদ্বার সিঙ্গাপুর। ব্রিটিশের দুই নৌ-দুর্গ দুই দ্বারে। মহারাষ্ট্র তরুণ বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে রাজদ্রোহের অভিযোগে এই এডেনের কারাগারে নির্বাসিত হয়েছিলেন এবং এখানেই অগোচরে তাঁর জীবনদীপ নিভেছিল। জাহাজ এডেন ছেড়ে এগিয়ে যায়। ১৯২১ সালের ১৬ই জুলাই জাহাজ ভিড়ল বোম্বাই বন্দরে।

জাহাজ থেকে নেমে সুভাষচন্দ্র গেলেন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে বোম্বাই-এর মণিভবনে। গান্ধীজীর বয়স তখন ৫২, সুভাষচন্দ্রের ২৩। দেশ অসহযোগ আন্দোলনে তরঙ্গিত। উভয়ের মধ্যে আলোচনাকালে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে যে কটি প্রশ্ন করেছিলেন তার মধ্যে তিনটি প্রশ্ন ছিল বিশেষ অর্থবহ। প্রশ্ন তিনটি হল :

1. How were the different activities of the Congress going to culminate in the last stage of the campaign, namely, the non-payment of taxes ?

2. How could mere non-payment of taxes or civil disobedience force the Government to leave the Indians free ?

3. How could Mahatma promise Swaraj within one year as he had been doing since the last session of the Indian National Congress ?

[(১) কংগ্রেস যে সকল কর্মসূচী নিয়েছে সেগুলি কি ভাবে সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্ব অর্থাৎ কর-বন্ধ আন্দোলনে পরিণত হবে ?

(২) কেবল কর-বন্ধ অথবা আইন অমান্য আন্দোলন কি

প্রকারে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হবে ?

(৩) বিগত কংগ্রেস অধিবেশনের সময় থেকে মহাত্মা যে বলে আসছেন এক বছরের মধ্যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করবেন তার যৌক্তিকতা কি ?]

গান্ধীজী প্রদত্ত প্রথম প্রশ্নের উত্তরটি সুভাষচন্দ্রের নিকট বাস্তবানুগ বলে বিবেচিত হলেও, বাকী দুটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী যা বললেন, তা সুভাষচন্দ্রের মনে রেখাপাত করতে পারল না।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মপন্থা সম্পর্কে, ১৯২১ সালে বোম্বাই-এ তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎকালে যে অনৈক্য দেখা দিয়েছিল, ১৯৪০ সালে ওয়ার্দায় তাঁদের শেষ সাক্ষাৎকার পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত ছিল।

যাই হোক, গান্ধীজীর পরামর্শ অনুসারে সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় এসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তরুণ সাধক এবং রাজর্ষি দেশনেতার মধ্যে নিভৃতে কথাবার্তা হল। দেশবন্ধুর মাঝে সুভাষচন্দ্র সত্যিকার নেতার সন্ধান পেলেন। তাঁদের এই মিলন ছিল রামায়ণের বিশ্বামিত্র-রামচন্দ্র মিলনের ন্যায়। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের আবির্ভাব লগ্নের জন্য দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করে ছিলেন। সময় হলেই তিনি অযোধ্যার রাজসভায় উপস্থিত হলেন। রাজা দশরথের অনিচ্ছাকে মহর্ষি জয় করে তরুণ রাজকুমারকে অধিগ্রহণ করলেন। দীক্ষা দিলেন তাঁকে আর্য-ধর্ম বিস্তারের মহান ব্রতে এবং অসুরবধের জন্য রামচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন অমোঘ আয়ুধ ব্রহ্মাস্ত্র। দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করলেন মৃত্যুঞ্জয় স্বদেশমন্ত্র। হৃদয়ে তাঁর সংস্থাপিত হল বজ্রসম দৃঢ়সংকল্প।

সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেসে যোগদান স্বাধীনতা সংগ্রামে নব প্রাণ-সঞ্চার করল। তাঁর অসামান্য স্বার্থত্যাগ ছাত্র ও যুব সমাজকে দেশ-ব্রতে করল উদ্‌বুদ্ধ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালে বাংলার সহস্রাধিক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী

বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, যুদ্ধান্তে তাঁদের অনেকেই মুক্তি পেয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন এই ঐতিহ্যময় ত্যাগব্রতী দেশসেবকদের অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে অভিলাষী হলেন। দেশবন্ধুর উদ্যোগে গান্ধীজী এবং সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী বিপ্লবীদের মধ্যে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। দেশবন্ধু রুদ্রনীতির পূজারীদের বললেন—"অহিংস গণ-আন্দোলন জনগণের চিত্তকে দুর্বল অথবা নীতি ভ্রষ্ট না করে তার প্রতিরোধ শক্তিকে জোরদার করে তুলবে। তোমাদের অস্ত্র এবার সংহত করে আমাদের আন্দোলনে নেমে পড়, এতে তোমাদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হবে, বৃহত্তর পটভূমিতে তোমাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। তারপর, এপথে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে না পারলে তোমাদের পথেই সমগ্র দেশকে সঙ্গে নিয়ে তোমরা এগিয়ে যেও।"

গান্ধীজী সশস্ত্রপন্থীদের বললেন—"ভারতবাসীর হাতে অস্ত্র থাকলে আমি এখনি বলতাম, অস্ত্র কোষমুক্ত কর। কিন্তু ভারতবর্ষ নিরস্ত্র। তাই তাদের অহিংস অসহযোগ পন্থায় সংগ্রাম করতে আহ্বান জানিয়েছি।"

আলোচনায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই কংগ্রেসের আন্দোলনকে পূর্ণ সুযোগ দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। অনেকে কংগ্রেসের অনুগত সক্রিয় সদস্য হতে এগিয়ে এলেন। অগ্নিযুগের রথী মহারথীদের অহিংস নীতি গ্রহণ, চরকাব্রত পালন এবং কংগ্রেসে ক্ষমতার পদলাভের জন্য অশোভন আগ্রহ শুধু যে তাঁদের ভাবমূর্তিকে ম্লান করল তাই নয়, সশস্ত্র সংগ্রামের আদর্শের প্রতিও আঘাত হানল। সুখের বিষয় সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসীদের সকলে অবসাদগ্রস্ত ক্ষমতালোভীদের দলে ভিড়লেন না।

কংগ্রেসে যোগদানের অল্প দিনের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ, প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রচার সচিব এবং কংগ্রেস

স্বেচ্ছাসেবক দলের অধিনায়কের কর্মভার গ্রহণ করলেন। সুভাষচন্দ্রের উৎসাহ, কৃচ্ছ্রসাধন এবং কর্মনিষ্ঠা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে মুগ্ধ করল।

১৯২১ সালে ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারত ভ্রমণে এলেন। ভারতবর্ষের মানুষের অবতারবাদে বিশ্বাসের ন্যায় রাজভক্তিও ছিল মজ্জাগত। ইংরাজ সরকার আশা করেছিলেন যুবরাজের আগমন উপলক্ষ্যে ভারতবাসীর রাজভক্তি আবার প্রবল হয়ে উঠবে এবং মিঃ গান্ধীর বিদ্রোহ—আন্দোলনকে নিষ্প্রভ করবে। আশা নিরাশায় পর্যবসিত হ'ল। কংগ্রেস যুবরাজের সংবর্ধনা বর্জন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করায় যুবরাজ ভারতবর্ষের যে শহরেই গেলেন, কংগ্রেসের ডাকে সেখানেই হরতাল হল, কালো পতাকা হস্তে প্রতিবাদ মিছিল বেরুল। ১৯২১-এর ডিসেম্বরে যুবরাজ কলিকাতায় এলে সংবর্ধনা বর্জনের ভার পড়ল তরুণ সুভাষচন্দ্রের উপর, দেশবন্ধু দিন কয়েক আগে গ্রেপ্তার বরণ করেছিলেন। কলিকাতায় হরতাল অভূতপূর্বভাবে সফল হল। মহানগরীর প্রাণ স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্ভ্রম নগরী কলিকাতার বুকে মহামান্য যুবরাজের প্রতি এরূপ অবমাননা প্রদর্শন সরকারের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হল। সংবর্ধনা বর্জন আন্দোলন অবৈধ ঘোষিত হল এবং দু চার দিনের মধ্যে আন্দোলনের সংগঠক সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ হলেন।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে সুভাষচন্দ্র হলেন দেশবন্ধুর কারাসঙ্গী. সচিব ও সেবক। দেশবন্ধুর আহার্যও সুভাষচন্দ্র রন্ধন করে দিতেন।

দেশবন্ধুর পত্নী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী সুভাষচন্দ্রকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন। বহুদিন পরে বেদনাপ্লুত অন্তরে সুভাষচন্দ্রের প্রসঙ্গে বাসন্তী দেবী বলেছিলেন :

> সুভাষ খুব ভাল রাঁধতে পারত। ওঁর দিনের খাবার আমি তৈরি করে নিয়ে যেতাম। রাতে ওঁর খাবার জেলের মধ্যে সুভাষ তৈরি করে দিত। আমার উপর সুভাষের আবদার

অভিমানের অন্ত ছিল না। বলা নেই কওয়া নেই সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে একদিন রাত এগারটার সময় হুম করে এসে হাজির হল আমার কাছে। এসেই হুকুম—শীগগির খেতে দিন, ভীষণ খিদে পেয়েছে। আমি বললাম—ওমা, সে কি কথা! খাওয়াদাওয়া কখন শেষ, কাজের লোকেরা সব পাট চুকিয়ে চলে গেছে। এখন আমি তোমার জন্যে রান্না করতে বসি আর কি!' বাবু কি আর সে কথা শোনেন। আবদার ধরে বসেছেন ভাতে-ভাত খাব। বোঝাই, ওরে লক্ষীছাড়া, ওদিকে যে তোর মা না খেয়ে খাবার নিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে। কিন্তু বৃথা অনুরোধ। শেষ পর্যন্ত ঐ রাতে যা হোক দুটো সিদ্ধ করে আমাদের পূর্ব বাংলায় যাকে বলে ভাতে-ভাত রেঁধে, পেট ঠাণ্ডা করে না দেওয়া পর্যন্ত আমার রেহাই পাবার উপায় ছিল না। তাই ওর মা প্রায়ই আমাকে বলতেন—আমি ওর জন্ম দিয়েছি, কিন্তু ওর মা ত আপনি।

অসহযোগ আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। কংগ্রেস এই সর্বপ্রথম একটি সুসংহত সংগ্রামী রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি গ্রহণ করল। শত সহস্র ছাত্র যুবক এবং প্রবীণ ব্যক্তি নিজ নিজ বৃত্তি, পেশা ও উপার্জন ছেড়ে গণ-আন্দোলনে যোগ দিয়ে, কারাদণ্ড বরণ করলেন। আন্দোলনের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে গান্ধীজী ১৯২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী বড়লাটকে এক চরম পত্র দিয়ে জানালেন, সাত দিনের মধ্যে সরকার যদি হৃদয়ের পরিবর্তন না দেখান, তাহলে তিনি কর-বন্ধ আন্দোলন শুরু করবেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী উত্তর প্রদেশের একটি গ্রাম, চৌরিচৌরায় পুলিসী অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হয়ে জনতা থানা আক্রমণ করল এবং জনতার হাতে কয়েক জন পুলিস নিহত হল। এই ঘটনার সংবাদে গণ-আন্দোলনের সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে চিন্তিত হলেন সর্বাধিনায়ক

গান্ধীজী। তিনি আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায় প্রমুখ নেতারা তখন জেলে, গান্ধীজীর সিদ্ধান্তে তাঁরা বিস্মিত এবং দুঃখে নৈরাশ্যে অভিভূত হলেন। আন্দোলন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করল।

এই সময় মোস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তুর্কীতে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটল। সুলতান ক্ষমতাচ্যুত হলেন। সুলতানের অপসারণের সঙ্গে খলিফা পদের অবলুপ্তি ঘটল। খিলাফত আন্দোলনেরও অবসান হল। ভারতবর্ষের খিলাফত আন্দোলনকারী মুসলমানগণ, যাঁরা কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন, একে একে জাতীয় আন্দোলন থেকে সরে গেলেন। অনেকে মুসলিম লীগে যোগ দিলেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়াস এইভাবে ব্যর্থ হলেও অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপকতায় ইংরাজ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে, কংগ্রেসের সহিত একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় আসবার জন্য ভিতরে ভিতরে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে সে সুযোগ নষ্ট হল।

> দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এ সম্পর্কে সখেদে বলেছিলেন: মহাত্মা সংগ্রাম আরম্ভ করেন সুন্দরভাবে, এগিয়ে যান নির্ভুল পদ-ক্ষেপে, একটির পর একটি সাফল্য লাভ করে সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্বে পৌছবার পর, তাঁর মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেয় এবং তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন।

১৯২২-এর মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্র জেল থেকে ছাড়া পেলেন। সেপ্টেম্বর মাসে উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হল। বহু গ্রাম জলমগ্ন হওয়ায় দুর্গতি চরম আকার ধারণ করল। বন্যাস্রোতে অনেক লোক প্রাণ হারাল, অসংখ্য গবাদি পশু ভেসে গেল, ক্ষেতের ফসল নষ্ট হল। বন্যার সংবাদ কলিকাতা পৌছতেই, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের

উদ্যোগে একটি বন্যাত্রাণ সমিতি গঠিত হল এবং সমিতি ত্রাণকার্যের উদ্দেশ্যে খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ এবং রোগসংক্রমণ নিবারক ঔষধসহ বন্যার্ত অঞ্চলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একদল স্বেচ্ছাসেবক পাঠালেন।

সুভাষচন্দ্র অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ত্রাণকার্যে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রতিদিন তিনি সকাল থেকে রাত বারটা পর্যন্ত কাজ দেখতেন। সুপরিচালিত সেবাকর্ম দেখে সরকারী কর্মচারীরাও তাঁদের ত্রাণসামগ্রী বণ্টনের জন্য সুভাষচন্দ্রের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ছিল অবশ্য নগণ্য। আচার্য রায়ের ত্রাণতহবিলে জিনিসপত্র বাদে নগদে উঠেছিল চারলক্ষ টাকা, সরকার প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল কুড়িহাজার টাকা।

সরকারী সাহায্যের অপ্রতুলতার সমর্থনে গভর্নরের এক্‌জিকিউটিভ কাউনসিলের সদস্য বর্ধমানের মহারাজা বলেছিলেন, 'সরকার দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়।' প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্গত জনসাধারণের প্রতি সরকারের দায়িত্ব বোধের এই ছিল পরিচয়। বন্যাত্রাণের কাজ দেখে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র খুশী হয়ে বলেছিলেন—সুভাষের সংগঠন কাজে কোথায়ও ফাঁক দেখতে পেলাম না। গভর্নর লর্ড লিটনও রিলিফের কাজ দেখে প্রশংসা করেছিলেন।

বন্যাত্রাণ কাজ শেষ করে কলিকাতায় ফিরে এলে জাতীয় বিদ্যাপীঠের ছাত্রবৃন্দ এক প্রকাশ্য সভায় সুভাষচন্দ্রকে সংবর্ধিত করলেন। অভিনন্দনের উত্তরে সুভাষচন্দ্র বললেন :

> আমি যে আজ দেশমাতৃকার আহ্বানে আমার সামান্য শক্তি নিয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি—তার প্রেরণা জুগিয়েছেন দেশবন্ধু : তাঁর নেতৃত্বে কাজ করা আমার জীবনে পরম সৌভাগ্য। আর আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি উৎসাহ।

কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একটি বৃহৎ ত্রিতলগৃহে জাতীয় বিদ্যাপীঠ অবস্থিত ছিল। গৃহের একতলায় ছিল প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিস। তখনকার দিনে বাড়ীটির ভাড়া ছিল মাসিক এক হাজার

টাকা। অধ্যাপক মণ্ডলীতে অনেক গুণী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সুভাষচন্দ্র আকর্ষণ করেছিলেন ঔপন্যাসিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কবি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে। তাঁরা প্রায়ই বিদ্যাপীঠে আসতেন। সেই সূত্রে সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে উঠে।

নিরলস শ্রম, বিনয় এবং আন্তরিকতার গুণে সুভাষচন্দ্র নেতা দেশবন্ধু, সহযোগী ও অনুগামীদের হৃদয় জয় করলেন। তখন তাঁর নিজের গাড়ী ছিল না, সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর কংগ্রেস অফিস থেকে অধিক রাত্রে তিনি হেঁটে বাড়ী ফিরতেন।

১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। কংগ্রেসের কর্মপন্থা গান্ধীজীর অভিমত অনুযায়ী কেবল গঠনমূলক কাজ, যথা—চরকা কাটা, মাদক বর্জন, অস্পৃশ্যতা নিবারণ প্রভৃতিতে সীমাবদ্ধ রাখা; অথবা গঠনমূলক কাজের সঙ্গে আইন সভায় নির্বাচিত হয়ে সরকারের বিরোধিতা করা এ সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দিল। সভাপতি দেশবন্ধু, মতিলাল নেহেরু, হাকিম আজমল খাঁ, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখ নেতারা রণনীতি পরিবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। কিন্তু প্রতিনিধিদের অধিকাংশ পরিবর্তনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করায় দেশবন্ধু সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন।

দেশবন্ধু তখন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও অন্য সহযোগীদের নিয়ে কংগ্রেসের ভিতরে স্বরাজ্য পার্টি গড়লেন। পার্টির উদ্দেশ্য হল— আইন সভার ভিতরে ও বাইরে সরকারের বিরোধিতা করা।

স্বরাজ্যদল বাংলায় শক্তিশালী হয়ে উঠল। সুভাষচন্দ্র স্বরাজ্য দলের মুখপত্র দৈনিক 'বাংলার কথা'র সম্পাদক এবং ইংরাজী দৈনিক 'ফরোয়ার্ডে'র পরিচালক নিযুক্ত হলেন। সংবাদপত্রের কাজ ছাড়া স্বরাজ্য পার্টি সংগঠনের এক প্রধান দায়িত্ব পড়ল তাঁর উপর।

কংগ্রেসে গান্ধীজীর প্রভাবের পিছনে ছিল ভারতবাসীর ভক্তিবাদ আশ্রয়ী মন। গান্ধীজীর চিন্তাধারায় ছিল তলস্তয় ও রাস্কিন ভাবিত নতুন এক অহিংস সমাজ গঠনের রূপকল্পনা। সমকালীন জাগতিক

পরিবেশ ও প্রয়োজন পরিপন্থী হলেও, গান্ধীবাদের এই চিরায়ত আবেদন একদল মনীষীকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং গান্ধীজীকে ঘিরে তাঁরা একটি ভক্ত পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছিলেন। দেশের কিছু বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী অহিংস নীতির দ্বারা স্বার্থহানি ঘটবার আশঙ্কা না থাকায়, গান্ধী পরিমণ্ডলকে অর্থাভাব জনিত দুশ্চিন্তা থেকে সর্বদা মুক্ত রেখেছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের পিছনে এই জাতীয় ভক্ত-পরিমণ্ডল না থাকলেও সারা দেশে তাঁর সমর্থক ও অনুগামীর সংখ্যা কম ছিল না। গয়া কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে দেশবন্ধু ভারতময় প্রচার-সফর করলেন। বাংলা ও বাংলার বাইরে যাঁরা গান্ধী-নেতৃত্বের ব্যর্থতা উপলব্ধি করেছিলেন তাঁরা স্বরাজ্যদলের পতাকাতলে সমবেত হলেন। দেশবন্ধুর প্রতিটি সভায় প্রচুর লোক হত। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর চিন্তাকে বাস্তবরূপ দিতে অক্লান্ত চেষ্টা করে চলেছেন। 'ফরোয়ার্ড' ও 'বাংলার কথা'-য় তাঁর যুক্তি সমৃদ্ধ প্রবন্ধ বের হচ্ছে। সংগঠনের কাজও সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। স্বরাজ্য দলের প্রভাব এত বৃদ্ধি পেল যে গয়া কংগ্রেসের পর ছয় মাস অতিবাহিত হতে না হতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে স্বরাজ্য দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল।

১৯২৩ সালে কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জারদের মধ্যে আপোস হল, স্বরাজ্য দল অনুসৃত আইনসভা-প্রবেশের কর্মনীতি অনুমোদন লাভ করল। অল্প দিন পরে আইন সভাগুলিতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল, তাতে স্বরাজ্যদলের প্রার্থীরা জয়ী হলেন। বাংলা প্রদেশে স্বরাজ্যদলের বহু মুসলমান প্রার্থী নির্বাচন লড়ে আইনসভার সদস্য হলেন। হিন্দু-মুসলমান সদস্যদের মিলিত শক্তির নিকট বার বার সরকার পক্ষ পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন এবং সরকারের অর্থমঞ্জুরী বিলগুলি আইনসভা কর্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ায় বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতাবলে সেগুলিকে কার্যকর

করতে হল। আইনসভার হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রভাব আইন সভার বাইরে সমগ্র দেশের উপর বিস্তৃত হল।

১৯২৪ সালে স্বরাজ্য দল কলিকাতা পৌর সভার নির্বাচনে জয়-লাভ করল। নব গঠিত পৌরসভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মেয়র এবং জনাব সহীদ সুরাবর্দ্দী ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হলেন। পৌর সভার প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হলেন সুভাষচন্দ্র। কলিকাতা পৌর-সভা বিদ্রোহীদের অধিকারে চলে যাওয়ায় সরকারের অস্বস্তি বৃদ্ধি পেল।

পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তার মাসিক বেতন ছিল তিন হাজার টাকা। সুভাষচন্দ্র নিতেন দেড় হাজার টাকা। উৎসাহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব পালন করে চললেন। তাঁর উদ্যোগে কলিকাতায় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিনামূল্যে দরিদ্র শিশুদের জন্য দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র, প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হল। ইংরাজ সরকারের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কলিকাতায় এলে তাঁদের প্রতি পৌরসভার পক্ষ থেকে যে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের প্রথা প্রচলিত ছিল তা রহিত হল। প্রবর্তিত হল তার পরিবর্তে বিশিষ্ট জাতীয় নেতাদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা। নাগরিক চেতনা প্রসারকল্পে 'কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হল। পৌরসভার কর্মীদের আমলা-তান্ত্রিক মনোভাব পরিহার করে জনসেবকের ন্যায় আচরণে অভ্যস্ত হবার জন্য সুভাষচন্দ্র নির্দেশ দিলেন। নবগঠিত পৌরসভা জন-মানসে নিঃস্বার্থ সেবা ও কল্যাণের আদর্শ স্থাপনে অনেকটা সফল হল।

স্বরাজ্যদলের শক্তিবৃদ্ধি সরকারের আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠল এবং কিছু দিনের মধ্যেই দলের উপর আক্রমণ শুরু হল। স্বরাজ্য-দলের বিশিষ্ট কর্মীরা গ্রেপ্তার হতে থাকলেন। ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর ১৮১৮ সালের ৩ আইনে গ্রেপ্তার হলেন সুভাষচন্দ্র এবং আইন

সভার দুই সদস্য শ্রীঅনিল বরণ রায় ও শ্রীসত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র। সন্দেহ ভাজনদের বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারারুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারীও করলেন। দমনমূলক তৎপরতার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখা দিলে সরকার পক্ষ থেকে বলা হল— 'বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার কারণে এঁদের কারারুদ্ধ করা হয়েছে। বৈপ্লবিক নব উদ্যোগের মূলে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।'

সুভাষচন্দ্রের অনির্দিষ্টকালের কারাদণ্ড দেশবন্ধুকে অভিভূত করল। পৌরসভার অধিবেশনে মেয়র চিত্তরঞ্জন তীব্র ভাষায় সরকারের উদ্দেশ্যে বললেন—'শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতা পৌর-সভার প্রধান কর্মকর্তারূপে যে সব কাজ করেছেন তার মধ্যে রাজদ্রোহমূলক যদি কিছু থেকে থাকে তবে তার পূর্ণ দায়িত্ব তিনি স্বয়ং গ্রহণ করছেন এবং তার জন্য সরকার যেন তাঁকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করেন।'

সরকার অবশ্য দেশবন্ধুকে গ্রেপ্তার করলেন না, কিংবা সুভাষ চন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহমূলক কার্যকলাপের কোন অভিযোগ আনতেও পারলেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে সরকারের দৃষ্টিতে নিঃশঙ্কচিত্ত, কর্মকুশলী, জনপ্রিয়, সুভাষচন্দ্র ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যের স্থিতির পক্ষে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন, সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ অথবা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার প্রমাণ না থাকলেও, তাঁকে পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তার পদে থেকে প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির সুযোগ দিতে সরকার অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। সরকার জানতেন, দেশবন্ধুর রাজনৈতিক সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র সুভাষচন্দ্রকে নিষ্ক্রিয় করতে পারলে, দেশবন্ধু ও স্বরাজ্যদলের প্রভাব বিনষ্ট হবে।

সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে আলিপুর জেলে রাখা হল, তারপর তাঁকে রাখা হল বহরমপুর সেন্ট্রলা জেলে। কিন্তু সরকার তাতেও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে সরকার সুভাষচন্দ্রকে বার্মার মান্দালয় জেলে নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

রাত্রিকালে সুভাষচন্দ্রকে গোপনে, সশস্ত্র প্রহরায়, কলিকাতায় এনে, লালবাজার পুলিস-জেলে রাখা হল। পরদিন ভোরে পুলিস বিভাগের সহকারী ইনসপেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যানের নিয়ন্ত্রণাধীনে সান্ত্রীদল তাঁকে পুলিস ভ্যানে গঙ্গাতীরে এনে অপেক্ষমান একটি মোটর লঞ্চে তুলল। মোটর লঞ্চটি নদীবক্ষে কিছুকাল ঘোরাঘুরি করল, তারপর সাধারণ যাত্রীদের অগোচরে এক পৃথক দ্বার দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে রেঙ্গুনগামী জাহাজে তুলে দিল। সুভাষচন্দ্র জাহাজের ক্যাবিনে অবরুদ্ধ হলেন।

ঐ জাহাজে আরও কিছু রাজবন্দীদের মান্দালয় জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মান্দালয় যাত্রা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র তাঁর 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে লিখেছেন :

"সকাল নয়টা নাগাদ আমাদের জাহাজ সমুদ্রের দিকে আগাইয়া চলিল। আমরা কাহারা, কেন এই বিরাট আয়োজন—তাহা জানিবার জন্য অন্যান্য যাত্রীদের খুব কৌতূহল হইয়াছিল। জাহাজ দূর সমুদ্রে পড়িবার পর আমাদের ক্যাবিনগুলির সম্মুখ হইতে সশস্ত্র পাহারা তুলিয়া লইয়া আমাদের দেখাশুনার জন্য কেবল সাদা পোশাকের অফিসারদের রাখা হইল। আমাদের চারদিনের এই সমুদ্রযাত্রা বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। মিঃ লোম্যান ছিলেন আমোদ প্রিয় মানুষ—এবং আমরা তাঁহার সহিত সম্ভবপর সকল বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতাম ; তাহার মধ্যে গভর্নর, একসিকিউটিভ কাউনসিলর, জননেতা, প্রভৃতির সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও থাকিত। এমন কি রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি পুলিসের অত্যাচারের প্রশ্নও তুলিয়াছিলাম। মিঃ লোম্যান প্রথমে এই অভিযোগ অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরূপ দুষ্কার্য করা হইয়াছে।

রেঙ্গুন হইতে মান্দালয় কুড়ি মাইল দীর্ঘ পথ। আমাদের উপর কড়া পুলিস পাহারা ছিল এবং পথে যেখানেই থামিতে হইয়াছে

সেখানেই ট্রেনের উভয় পার্শ্বে তাহারা লাইন করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িত। তাহারা যেরূপ শশব্যস্ত ভাব দেখাইত তাহাতে মনে হইতে পারিত যে আমরা খুব উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী, না হয় হিংস্র প্রাণী।"

এক সময় লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ছয় বৎসর মান্দালয় জেলে নির্বাসনে কাটিয়েছিলেন। জেলখানাটা ছিল মোটা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী, শীত ও বর্ষার প্রকোপ থেকে রক্ষার অনুপযোগী। অসহায় বন্দীদের দুর্গতির মধ্যে বাস করতে হত। মান্দালয় একদা স্বাধীন বার্মার রাজধানী ছিল। পরিত্যক্ত রাজধানী যেমন শ্রীহীন হয় মান্দালয়ের অবস্থা ছিল সেই রকম।

॥ ৩ ॥

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দার্জিলিং-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দেহত্যাগ করলেন। দেশবন্ধুর অকাল বিয়োগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অপূরণীয় ক্ষতি হল। তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন মাত্র পাঁচ বছরের কিন্তু এই অল্প সময়ে দেশবন্ধু তাঁর অসাধারণ বিচারবুদ্ধি এবং দূরদর্শিতার দ্বারা মুক্তিসংগ্রামকে বাস্তব-ধর্মী করে তুলতে পেরেছিলেন। তাঁর উদার সহৃদয়তা বাংলার হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রচেষ্টাকে অনেকটা সাফল্যের পথে নিয়ে গিয়েছিল। দেশবন্ধুর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সমগ্র দেশ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল।

ইতিমধ্যে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আশ্রম জীবনে ফিরে গিয়েছেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি কংগ্রেসের সামনে যে গঠনমূলক কর্মসূচী রেখেছেন তার উপর মুষ্টিমেয় বর্ষীয়ান কর্মী ছাড়া কারও আস্থা ছিল না। বর্তমান কালে চরকার প্রচলন এবং খাদির সাহায্যে সরকারকে বিপর্যস্ত করার চিন্তা অনেকের নিকট দুর্বোধ্য ছিল। কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেসকর্মীদের নিকট খাদির চেয়ে অন্য কার্যকর রাজনৈতিক কর্মপন্থা অধিকতর আকর্ষণীয় ছিল।

খাদি প্রচার নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কিছু কথাবার্তা হয়। শরৎচন্দ্র তখন হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

গান্ধীজী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন :

Why don't you believe that attainment of Swaraj will be helped by spinning ?

শরৎচন্দ্র উত্তরে বলেছিলেন :

"I think attainment of Swaraj can only be helped by soldiers and not by spiders."

চরকা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ

"The programme of Charka is so utterly childish that it makes one despair to see the whole country deluded by it."

সবার চেয়ে প্রাণ খুলে বললেন কবি নজরুল তাঁর স্বভাব-সুন্দর ছন্দে—

"সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই,
বসে বসে দিন গুনি।
জাগরে জোয়ান, বাত ধরে গেল,
মিথ্যার তাঁত বুনি॥"

এই ছিল চরকা-খাদি সম্পর্কে বাংলার অতি প্রিয় লোকনায়কদের অভিমত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যর কৃপায় এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষায় বাংলায় অস্পৃশ্যতা কখনো সামাজিক ব্যাধি হয়ে উঠতে পারে নি। মাদক ব্যবহার পূর্ববঙ্গে খুবই সীমিত ছিল, পশ্চিমবঙ্গে যা ছিল তাও মুখ্যত শহর ও শিল্পাঞ্চলে। মাদক দ্রব্য ব্যবহারকারী বঙ্গসমাজে সর্বত্র নিন্দিত হত। এই সব কারণে গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মসূচী বাঙ্গালীদের আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হল।

মান্দালয় জেলে দেশবন্ধুর মৃত্যুসংবাদ সুভাষচন্দ্রকে বিষাদে আচ্ছন্ন করল। তাঁর দুঃখ কতটা গভীর ছিল তার পরিমাপ সম্ভব নয়। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে এই সময় সুভাষচন্দ্র যে পত্রখানা লেখেন তাতে তাঁর ভারাক্রান্ত হৃদয়ের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হল।

মান্দালয় জেল
১২ই আগস্ট, ১৯২৫।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

মাসিক বসুমতীতে আপনার 'স্মৃতিকথা' তিনবার পড়লুম— বড় সুন্দর লাগল। মনুষ্য চরিত্রে আপনার গভীর অন্তর্দৃষ্টি, দেশবন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও আত্মীয়তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার অপূর্ব বিশ্লেষণ করে রস ও সত্য উদ্ধার করবার ক্ষমতা—এই উপকরণের দ্বারাই আপনি এত সুন্দর সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

যাহারা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিল তাদের মধ্যে কতকগুলি গোপন ব্যথা রয়ে গেল। আপনি সে গোপন ব্যথার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করে শুধু যে সত্য প্রকাশ করবার সহায়তা করেছেন তা নয়—আপনি আমাদের মনের বোঝাটাও হালকা করেছেন। বাস্তবিক "পরাধীন দেশের সব চেয়ে বড় অভিশাপ এই যে মুক্তি সংগ্রামে বিদেশীয়দের অপেক্ষা দেশের লোকদের সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করতে হয়।" এই উক্তির নিষ্ঠুর সত্যতা—তাঁর অনুগামী কর্মীরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এবং এখনো বুঝছে।

আপনার সমস্ত লেখার মধ্যে এই কথাগুলি আমার সবচেয়ে ভাল লাগল, "একান্ত প্রিয়, একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করতে থাকে—এ সেই। আজ আমরা যাহারা তাঁর পাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নেই, পরের কাছে জানাইতে ভালও লাগে না।" বাস্তবিক, হৃদয়ের নিগূঢ় কথা পরের কাছে কি সহজে বলা যায়? তারা উপহাস করলে হয়ত সহ্য করা যায়। কিন্তু তারা যদি রসবোধ না করিতে পারে, তাহলে অসহ্য বোধ হয়, মনে হয় 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং

শিরসি মা লিখ মা লিখ।' আমাদের অন্তরের কথা, অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কে বুঝিতে পারে?

আর একটি কথা আপনি লিখেছেন—যা আমার খুব ভাল লেগেছে। * * * 'আমরা দেশবন্ধুর কাজ করিতাম।' প্রকৃতপক্ষে আমি এমন অনেককে জানি যাঁরা তাঁর মতে বিশ্বাস করিতেন না—কিন্তু তাঁর বিশাল হৃদয়ের মুগ্ধকর আকর্ষণে তাঁরা তাঁর জন্য কাজ না করে পারতেন না। আর তিনিও মত-নির্বিশেষে সকলকে ভালবাসতেন। মানুষের ভালমন্দ স্বীকার করে নিয়েই যে তাকে ভালবাসা উচিত—এই কথায় তিনি বিশ্বাস করতেন, এই বিশ্বাসের উপরই তাঁর জীবনের ভিত্তি।

অনেকে মনে করে যে আমরা অন্ধের মতো তাঁকে অনুসরণ করতুম। কিন্তু তাঁর প্রধান চেলাদের সঙ্গে ছিল তাঁর সব চেয়ে বেশি ঝগড়া। নিজের কথা বলতে পারি যে, অসংখ্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া হত। কিন্তু আমি জানতুম যে যত ঝগড়া করি না কেন—আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা অটুট থাকবে—আর তাঁর ভালবাসা থেকে আমি কখনও বঞ্চিত হব না। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে যত বড় ঝঞ্ঝা আসুক না কেন—তিনি আমাকে পাবেন তাঁর পদতলে। আমাদের সকল ঝগড়ার মিটমাট হতো মার (শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী) মধ্যস্থতায়। কিন্তু হায়,—"রাগ করিবার অভিমান করিবার জায়গাও আজ আমাদের ঘুচিয়া গেছে।"

আপনি এক জায়গায় লিখেছেন, "লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালি গালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা!" সেদিনকার কথা এখনও আমার মনে স্পষ্ট অঙ্কিত আছে। আমরা যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলিকাতা ফিরি—তখন নানা

প্রকার অসত্যে ও অর্দ্ধসত্যে বাংলার সব কাগজ ভরপুর। আমাদের স্বপক্ষে ত কথা বলে নাই—এমন কি আমাদের বক্তব্যটিও তাদের কাগজে স্থান দিতে চাহে না। যে বাড়ীতে এক সময় লোক ধরত না, সেখানে কি বন্ধু কি শত্রু—কাহারও চরণধূলি আর পড়ে না। কাজেই আমরা কয়টি প্রাণী মিলে আসর জমাতুম। পরে যখন সেই বাড়ীর পূর্ব গৌরব ফিরে এল—বাহিরের লোক এবং পদ প্রার্থীরা যখন এসে আবার সভাস্থল দখল করল—তখন আমরা কাজের কথা বলবার সময় পাই না। কত পরিশ্রমের ফলে কি রকম হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ভাণ্ডারে অর্থ সঞ্চয় হল, নিজেদের খবরের কাগজ প্রকাশিত হল এবং জনমত অনুকূল দিকে ফেরান হল তা বাহিরের লোক জানে না। বোধহয় জানবেও না। কিন্তু এ যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, ঋত্বিক, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন! ভেতরের আগুন এবং বাহিরের কর্মভার—এই দুয়ের চাপ তাঁর পার্থিব দেহ আর সহ্য করতে পারল না।

অনেকে মনে করেন যে তাঁর স্বদেশসেবা ব্রতের উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতৃকার চরণে সর্বস্ব উৎসর্গ করা। কিন্তু আমি জানি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এর চেয়েও মহত্তর। তিনি তাঁর পরিবারকেও দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন এবং অনেকটা সফলও হয়েছিলেন।

* * * সময়ে সময়ে আমি মনে না করে পারি না যে দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যু ও দেহত্যাগের জন্য তাঁর দেশবাসী এবং তাঁর অনুচরবর্গ কতটা দায়ী। তারা যদি তাঁর কাজের বোঝা কতকটা লাঘব করতেন, তাহলে বোধহয় তাঁকে এতটা পরিশ্রম করে আয়ু শেষ করতে হত না। * * *

যাক্—কি কথা বলতে আরম্ভ করে কোথায় এসে

দাঁড়িয়েছি। আমার—শুধু আমার কেন সকলের এখানে অনুরোধ ও ইচ্ছা আপনি 'স্মৃতি কথা'র মতো দেশবন্ধু সম্বন্ধে আরও কয়েকটা প্রবন্ধ বা কাহিনী লিখুন। আপনার ভাণ্ডার এত শীঘ্র শূন্য হতে পারে না—অতএব লেখার জন্য উপাদানের অভাব হবে বলে আমি আশঙ্কা করি না। আর আপনি যদি লেখেন, তবে সুদূর মান্দালয় জেলে বসে কয়েকজন বাঙ্গালী রাজবন্দী যে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে রচনা পাঠ ও উপভোগ করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আমি বোধহয় খুব বেশি দিন এখানে থাকব না। কিন্তু খালাস হবার তেমন আকাঙ্ক্ষা এখন আর নেই। বাহিরে গেলেই যে শ্মশানের শূন্যতা আমাকে ঘিরে বসবে—তার কল্পনা করলেই যেন হৃদয়টা সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে। এখানে সুখে দুঃখে ও স্বপ্নের মধ্যে দিনগুলি এক রকম কেটে যাচ্ছে। পিঞ্জরের গরাদের গায়ে আঘাত করে যে জ্বালাবোধ হয়—সে জ্বালার মধ্যেও যে সুখ পাওয়া যায় না—তা আমি বলতে পারি না। যাঁকে ভালবাসি—যাঁকে অন্তরের সহিত ভালবাসার ফলে আজ আমি এখানে—তাঁকে বাস্তবিকই ভালবাসি—এই অনুভূতিটা সেই জ্বালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধহয় বদ্ধ দুয়ারের গরাদের গায়ে আছাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষতবিক্ষত হলেও—তার মধ্যে একটা সুখ একটা শান্তি একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়। বাইরের হতাশা, বাইরের শূন্যতা এবং বাইরের দায়িত্ব—এখন আর মন যেন চায় না।

এখানে না এলে বোধহয় বুঝতুম না যে সোনার বাংলাকে কত ভালবাসি। আমার সময়ে সময়ে মনে হয় বোধ হয় রবিবাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা করে লিখেছেন—

"সোনার বাংলা! তোমায় আমি ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

যখন ক্ষণেকের তরে বাংলার বিচিত্ররূপ মানস-চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠে—তখন মনে হয় এই অনুভূতির জন্য অন্ততঃ এত কষ্ট করে মান্দালয় আসা সার্থক হয়েছে। কে আগে জানত—বাংলার মাটি, বাংলার জল—বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস—এত মাধুরী—আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে!

কেন এ পত্র লিখে ফেললুম জানি না। আপনাকে পত্র দিব একথা আগে কখনও মনে আসে নি। তবে আপনার লেখা পড়ে কতকগুলো কথা মনে আসাতে লিপিবদ্ধ করলুম। আর যখন লিখেই ফেলেছি—তখন পাঠিয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আপনি আমাদের সকলের প্রণাম গ্রহণ করবেন। পত্রের উত্তর ইচ্ছা হয়—দেবেন। তবে উত্তর দাবি করবার মতো ভরসা রাখি না। যদি উত্তর দেন সেই আশায় ঠিকানা দিলুম।

C. O., G. I. G., C. I. D.
13, Elysium Row, Calcutta.

দুঃখের মাঝে মনের গহনে যে সুর বহে যা মানুষকে অলক্ষ্যে প্রাণছন্দে বাঁচিয়ে রাখে এবং দুঃখজয়ের শক্তি জোগায় সুভাষচন্দ্রের পত্রখানিতে তার স্পষ্ট আভাস লক্ষিত হয়। দেশবন্ধুর প্রতি সুভাষচন্দ্রের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির চিত্রও পত্রে ফুটে উঠেছে। পত্রে আর যা আছে তা হল সুভাষ-

চন্দ্রের অনাবিল অন্তরোপলব্ধি, কল্পনা ও স্বপ্নের ছোঁয়াচে রঙিন একটি মনের পরিচয়।

মান্দালয় জেলে সুভাষচন্দ্র ব্রহ্মদেশের ভাষা, প্রাচীন ইতিহাস, ধর্মসংস্কৃতি এবং ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতবর্ষ ও সিংহলের অতীত সম্পর্ক বিষয়ক গ্রন্থাদি পড়ে সময় কাটাতেন।

তখন বার্মাতেও ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলন চলছিল। আন্দোলনের নেতা ছিলেন রেভারেণ্ড ইউ-ওত্তামা। সুভাষচন্দ্র বার্মার স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে সম্ভবপর সংবাদ সংগ্রহ করতেন।

এইভাবে তাঁর বন্দী জীবনের দুই বৎসর অতিবাহিত হল। যুদ্ধ নেই, বিদ্রোহ নেই, এমন কি কোন আন্দোলনও নেই দেশে, তথাপি ভারত রক্ষা বিধানে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কাল দেশকর্মীদের কারারুদ্ধ করে রাখা শুধু যে অবৈধ ছিল তাই নয়, মানবতার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আচরণের ছিল হীন দৃষ্টান্তস্বরূপ। সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসী প্রতিবাদ-মুখর হল। ১৯২৬ সালের নভেম্বরে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল, তাতে কলিকাতার একটি কেন্দ্র থেকে অনুপস্থিত সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস প্রার্থীরূপে আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হলেন। নির্বাচনে কংগ্রেসের শ্লোগান ছিল—'বাহিরে আনবার জন্য ভিতরে পাঠাও।'

সরকারকে তখন সমস্যার সম্মুখীন হতে হল। নির্বাচনের রায় মেনে নিয়ে সুভাষ চন্দ্রকে মুক্তি দিয়ে আইন সভায় যোগদানের সুযোগ দান অথবা নির্দিষ্ট অভিযোগে তাঁকে আদালতে বিচারের জন্য উপস্থিত করা—এই দুয়ের একটি সরকারের করণীয় হয়ে দাঁড়াল।

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র গুরুতর রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে, ক্ষয়রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। কঠিন পীড়ার সংবাদ দেশে পৌঁছতে সর্বত্র উৎকণ্ঠা দেখা দিল এবং সরকারের নিকট অবিলম্বে সুভাষচন্দ্রের মুক্তির দাবি উত্থাপিত হল।

একটি মেডিকেল বোর্ড দ্বারা রোগ পরীক্ষার জন্য তাঁকে মান্দালয় থেকে রেঙ্গুন জেলে আনা হল। মেডিকেল বোর্ড সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দেবার সুপারিশ করলেও, সরকার তাঁকে মুক্তি দিয়ে ভারতবর্ষে তাঁর প্রত্যাবর্তনে রাজী হলেন না।

বঙ্গীয় আইন সভায় নির্বাচিত সকল হিন্দু-মুসলমান সদস্য এক যোগে সুভাষচন্দ্রের মুক্তির দাবি তুললে, সরকার পক্ষ থেকে এক বিকল্প প্রস্তাবে বলা হল—সুভাষচন্দ্র যদি নিজ ব্যয়ে চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে যেতে চান, তাহলে সরকার তাঁকে মুক্তি দিয়ে রেঙ্গুন থেকে ইউরোপগামী কোন জাহাজে তুলে দিতে সম্মত আছেন।

প্রস্তাবটি ইনসিন জেলে সুভাষচন্দ্রের নিকট উপস্থাপিত করলে তিনি তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। রেঙ্গুন জেলের সুপারের সঙ্গে বাদ প্রতিবাদের কারণে সুভাষচন্দ্রকে রেঙ্গুন জেল থেকে ইনসিন জেলে আনা হয়েছিল।

প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি তাঁর বড়দাদা শ্রীসতীশচন্দ্র বসুকে ১৯২৭ সালের ৪ঠা এপ্রেল যে পত্র দেন তাতে লিখলেন :

> "বর্তমান ঘটনার সর্বাপেক্ষা মন্দ ফল কি হইতে পারে তাহা আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি। তথাপি আমি মনে স্থির করিয়াছি জন্মভূমি হইতে চিরকালের জন্য নির্বাসন অপেক্ষা জেলে থাকিয়া মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়ঃ। এই অশুভ ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াও আমি নিরুৎসাহ হই নাই। কারণ কবির উক্তিতে আমি বিশ্বাস করি—গৌরবের পথ শুধু মৃত্যুর পথে লইয়া যায়। * * * ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে আমি নিজে শান্তিতে আছি এবং সম্পূর্ণ নির্বিকার ভাবে সকল অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত আছি। আমাদের সমগ্র কৃতপাপের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি—ইহাতেই আমার তৃপ্তি। আমাদের চিন্তা ও আদর্শ অমর হইয়া থাকিবে—আমাদের মনোবৃত্তি জাতির স্মৃতি হইতে কখনও মুছিয়া

যাইবে না, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদের প্রিয় উত্তরাধিকারী হইবেন, এই বিশ্বাস লইয়া আমি চিরদিন সকল প্রকার বিপদ ও অত্যাচারকে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়া কাল কাটাইতে পারিব।"

বড়দাদাকে পত্র দেবার একদিন পরে সুভাষচন্দ্র তাঁর এক বন্ধুকে নিম্নে উদ্ধৃত পত্রখানি লেখেন। পত্রখানি সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শনের উজ্জ্বল অভিজ্ঞান স্বরূপ।

ইনসিন জেল
৫ই এপ্রেল, ১৯২৭।

পরম প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। অনেক প্রশ্ন করিয়াছেন—কি উত্তর দিব জানি না। অনেক কথাই লিখিতে ইচ্ছা করে কিন্তু লেখা যায় কি ?

শরীরের সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই—যথাপূর্বং তথা পরং। পরিণাম কি দাঁড়াইবে জানি না। এখন আর শরীরের কথা ভাবি না। গত কয়েক মাসের মধ্যে আমার মনের গতি কোনও কোনও দিকে দ্রুতবেগে চলিয়াছে। আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে জীবনে ষোল আনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত না হইলে মেরুদণ্ড ঠিক রাখা মুশকিল হইয়া পড়ে। জীবন প্রভাতে এই প্রার্থনা বুকে লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম—'তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি'। ভবিষ্যতের কথা জানি না, তবে এখন পর্যন্ত ভগবান সে প্রার্থনা সফল করিয়া আসিতেছেন। তাই আমি বড় সুখী—সময়ে সময়ে মনে হয় আমার মত সুখী আর জগতে কয়জন আছে ? এখন এই বৃত্তাকার উন্নত প্রাচীরের বাহিরে যাইবার আশা যে পরিমাণ সুদূর পরাহত হইতেছে, সেই পরিমাণে আমার চিত্ত শান্ত ও উদ্‌বেগ-

শূন্য হইয়া আসিতেছে। অন্তরের মধ্যে বাস করা ও অন্তরের আত্মবিকাশের স্রোতে জীবন তরী ভাসাইয়া দেওয়ার মধ্যে পরম শান্তি আছে এবং বেশিদিন রুদ্ধ অবস্থায় বাস করিতে হইলে অন্তরের শান্তিই একমাত্র সম্বল—তাই সুদীর্ঘ কারাবাসের সম্ভাবনায় আমি এক অপূর্ব শান্তি পাইতেছি। Emerson বলিতেন—we must live wholly from within—একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং এই সত্যের উপর আমার বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হইতেছে।

আমার মতো যাঁহাদের অবস্থা, তাঁহারা যদি বাহিরের ঘটনার দ্বারা জীবনের সার্থকতা বা বিফলতা নির্ধারণ করেন তবে 'মৃত্যুরেব ন সংশয়'। যে মাপকাঠির দ্বারা আমাদের (অর্থাৎ বন্দীদের) বিচার করিতে হইবে—তাহা অন্তরের—বাহিরের নয়। কারণ বাহিরের মাপকাঠিতে হয়তো আমাদের জীবনের মূল্য শূন্যবৎ। এখানেই যদি যবনিকাপাত হয় তবে বাস্তব সংসারের উপর আমার স্থায়ী ছাপ না থাকিতেও পারে। কিন্তু জীবনে যদি আর কোন কাজ করিতে না পারি—আদর্শকে বাস্তবের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার সুযোগ না পাই—তাহা হইলেও আমার জীবন ব্যর্থ হইবে না। মহান আদর্শ যদি প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকি—কায়মনপ্রাণ যদি সেই মহান আদর্শের সুরে বাঁধিয়া থাকি, আদর্শের সহিত নিজের অস্তিত্ব যদি মিশিয়া থাকে—তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট—আমার জীবন জগতের কাছে ব্যর্থ হইলেও, আমার (এবং বোধহয় ভাগ্যবিধাতার) কাছে ব্যর্থ নয়। জগতের সব কিছু ক্ষণভঙ্গুর—শুধু একটা বস্তু ভাঙ্গে না বা নষ্ট হয় না—সে বস্তু ভাব বা আদর্শ। আমাদের আদর্শ, আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, আমাদের চিন্তাধারা—অবিনশ্বর। ভাবকে প্রাচীরের দ্বারা কি কেহ ঘিরিয়া রাখতে পারে ?

ষোল আনা দিতে হইলে অপর দিকে আদর্শকে ষোল আনা পাওয়া চাই। ত্যাগ ও অমৃত—Renunciation and realisation—একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ। এখন এই ষোল আনা পাওয়া ও ষোল আনা দেওয়ার জন্য আমার মন-প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

যিনি এত দুর্বলতার মধ্য দিয়া আমাকে শক্তির উচ্চ শিখরে লইয়া আসিয়াছেন—তিনি কি দয়া করিবেন না? উপনিষদ বলে, 'যমেবৈষবৃনুতে তেন লভ্যঃ'—এখন দেখা যাক্।

Systematic study অনেক দিন হইল ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছি। জাতীয়তাভিত্তিক কয়েকটি মূল সমস্যার সমাধানের জন্য লেখাপড়া ও গবেষণা করিয়াছিলাম—আপাততঃ কাজ বন্ধ আছে। কবে আবার আরম্ভ করিতে পারিব জানি না। বাহিরে গেলে এ কাজ চাপা পড়িবে—তাই এখানে থাকিতে কাজ শেষ করিবার ইচ্ছা ছিল। আমার কারাবাসের কাজ বোধ হয় এখনো সমাপ্ত হয় নাই—তবে বোধহয় যাইবার বিলম্ব আছে। * * * *

ভগবান আপনাদের সকলকে কুশলে রাখুন এবং আপনাদের ক্রিয়াকলাপের উপর তাঁহার শুভ আশিস নিরন্তর বর্ষিত হউক—ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ইতি—

সুভাষচন্দ্রের অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। দেহের ওজন ষাট পাউণ্ড কমে গেছে। আত্মীয়, বন্ধু এবং দেশবাসী গভীর ভাবে উদ্‌বিগ্ন। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি জনমতের প্রতিধ্বনি তুলে সুভাষচন্দ্রের মুক্তির দাবি করে চলেছে। সরকার তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন আভাস দিচ্ছেন না। সুভাষচন্দ্রও স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় চিন্তাহীন,

সংকল্পে অটল অনড়। রোগশয্যায় আত্মস্থ মুক্তিসাধকের ধ্যান মানসে অন্তরতম অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। কণ্ঠে তাঁর অভয়মন্ত্র।

"মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ॥
দুঃখের মন্থন বেগে উঠিবে অমৃত,
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে নির্ঝরিয়া গলিবে যে
প্রস্তরশৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ॥"

ইনসিন জেলের সুপার মেজর ফিগুলে কিছুকাল আগে মান্দালয় জেল-সুপার ছিলেন। তিনি সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের অবনতি লক্ষ্য করে বিস্ময় ও দুঃখ বোধ না করে পারলেন না। চিকিৎসকের অভিমত অনুসারে তিনি বন্দীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারের নিকট খুব কড়া নোট পাঠালেন।

সুভাষচন্দ্রের অবস্থা দিন দিনই খারাপ হতে লাগল, আত্মীয়স্বজন তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিলেন। ১৯২৭ সালের ৬ই মে সুভাষচন্দ্র তাঁর মেজদাদা শ্রীশরৎচন্দ্র বসুকে লিখলেন—

> আমার সিদ্ধান্ত—সহজ বিচারের ফল। ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ সিদ্ধান্ত আরো দৃঢ়তর হইবে।*** কারাগারে আমার যতই দিন যাইতেছে ততই আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে জীবনের সংগ্রামের মূলে রহিয়াছে মতবাদের সংঘর্ষ—সত্য ও মিথ্যা ধারণার সংঘর্ষ। কেহ ইহাকে সত্যের বিভিন্ন স্তর বলিয়া থাকেন। মানুষের ধারণাই মানুষকে চালিত করিয়া থাকে। এই সমস্ত ধারণা নিষ্ক্রিয় নহে। হেগেলের Absolute Idea, ম্যান ও সোপেনহারের Blind Will এবং হেনরী বার্গসনের Elan Vital-এর মতোই এ সমস্ত ধারণা ক্রিয়াশীল। এই সমস্ত

ধারণা নিজেদের পথ নিজেরা সৃষ্টি করিয়া লইবে। আমরা ত মাটির পুতুল মাত্র, ভগবানের তেজরাশির কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র আমাদের মধ্যে নিবদ্ধ। আমাদিগকে এই ধারণার নিকট আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে।

ঐহিক ও জড়দেহের সুখদুঃখকে অগ্রাহ্য করিয়া যে এই-ভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারে তাহার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। আমার ধারণা যে একদিন জয়ী হইবে সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সুতরাং আমার স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি কোন চিন্তাই করি না।

গভর্নমেণ্টের শর্তের উত্তরে আমি যাহা লিখিয়াছি তাহাতে আমি আমার মত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছি। আমি উৎকৃষ্টতর শর্ত পাইবার জন্য পাটোয়ারী চাল দিতেছি বলিয়া কোন কোন সমালোচক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দয়তায় আমি দুঃখিত। আমি দোকানদার নহি, দর কষা-কষি আমি করি না। কূট চালের পিচ্ছিল পথ আমি ঘৃণা করি। একটা আদর্শ ধরিয়া আমি দণ্ডায়মান। ব্যস, এই খানেই শেষ। আমি জীবনকে এত প্রিয় মনে করি না যে, তাহা রক্ষার জন্য আমি চালাকির আশ্রয় লইব। মূল্য সম্বন্ধে আমার ধারণা বাজারের ধারণা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। শারীরিক ও বৈষয়িক সুখের নিরিখে জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ণয় করা যায় বলিয়া আমি মনে করি না।

আমাদের সংগ্রাম দৈহিক শক্তির নহে। বৈষয়িক লাভও আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য নহে। সেণ্ট পল বলিয়াছেন—"আমরা রক্তমাংসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করি না। আমাদের সংগ্রাম তাহাদের বিরুদ্ধে যাহারা পৃথিবীর অন্ধকারের নায়ক, আমাদের সংগ্রাম উচ্চ পদাধিষ্ঠিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে।" স্বাধীনতা এবং সত্যই আমাদের আদর্শ, রাত্রির পর যেমন

দিন আসে আমাদের চেষ্টাও ঠিক তেমনি সত্য, সত্য সফল হইবেই। আমাদের শরীর নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু অটল বিশ্বাস ও দুর্জয় সংকল্পের বলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের চেষ্টার সফল পরিণতি দেখবার মতো সৌভাগ্য কাহার হইবে একমাত্র ভগবান তার বিধান কর্তা। আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, আমি কাজ করিয়া যাইব, তারপর যাহা হয় হইবে।

***যদি সরকার আমার সুইজারল্যাণ্ডে বাস বাধ্যতামূলক বলিয়াই মনে করেন তাহা হইলে আপনারা কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়াই কথাবার্তা চালান বন্ধ করুন।

এই হল কঠিনে-কোমলে গড়া সুভাষ চরিত্রের চিরস্বচ্ছ রূপ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে-ই সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে এসেছে সে-ই এই চরিত্রগুণে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি। এবার সরকারকেও অবশেষে নতি স্বীকার করতে হল। সরকার সুভাষচন্দ্রকে বার্মার বন্দীশালা থেকে ভারতে এনে আলমোড়া জেলে আটক রাখবার সিদ্ধান্ত করলেন। ১৯২৭ এর ১২ই মে তাঁকে রেঙ্গুন থেকে কলিকাতা গামী একটি জাহাজে তুলে দেওয়া হল। চারদিন পরে জাহাজ কলিকাতা পৌঁছবার পূর্বে মেটিয়াবুরুজে থামল এবং সুভাষচন্দ্রকে ইনভেলিড চেয়ারে শুইয়ে জাহাজ থেকে একটি লঞ্চে তোলা হল। লঞ্চটি পুলিস প্রহরাধীনে গঙ্গাবক্ষে কোথাও অবস্থান করে রইল।

সরকার একটি মেডিকেল বোর্ড দ্বারা পুনরায় সুভাষচন্দ্রকে পরীক্ষা করালেন। মেডিকেল বোর্ডে গভর্নরের চিকিৎসক মেজর হিংস্টন ও লেঃ কর্নেল স্যাণ্ডস, ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন। মেডিকেল বোর্ড তাঁদের রিপোর্ট তারযোগে দার্জিলিং-এ গভর্নর স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসনের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। ঐ দিনই (১৬ই মে) আবশ্যক চিকিৎসার জন্য সুভাষচন্দ্রকে বিনাশর্তে মুক্তির আদেশ দেওয়া হল।

সুভাষচন্দ্রের মুক্তির সংবাদে দেশবাসী উল্লসিত হল। 'ফরোয়ার্ড' এবং 'ইংলিশম্যান' বিশেষ মুক্তিসংবাদ সংখ্যা প্রকাশ করল এবং এক ঘণ্টার মধ্যে সকল কপি বিক্রি হয়ে গেল। কলিকাতা ও হাওড়ার পৌরসভার অফিসে ছুটি ঘোষিত হল, দোকানপাট বন্ধ হল, উৎফুল্ল জনতা রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে ঘুরল, সন্ধ্যায় নগরীর বহুগৃহ দীপমালা উদ্ভাসিত হল।

গৃহে ফিরে শয্যাশায়ী সুভাষচন্দ্র জ্বর গায়ে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিলেন :

> আবার আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। আমার মনে হয়, এখন আমার প্রথম ও প্রধান কাজ নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা, তাহা হইলেই আমি যথা সম্ভব শীঘ্র আমার পরিত্যক্ত কাজ পুনরারম্ভ করিতে পারিব। এতদিন জেলে বাস করিবার পর আমার সহযোগী অন্যান্য বন্দীদের কথাই অহর্নিশি মনে জাগিবে। আমি আশা করি আমার দেশবাসীরা ত্বরায় আমার রোগমুক্তি কামনা করিবেন—তাহা হইলেই আমরা যথাসম্ভব শীঘ্র প্রাণমন ঢালিয়া স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারিব।

সুভাষচন্দ্রের মুক্তির সংবাদে কংগ্রেস মহলে সকলেই খুশী হলেন। ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে তাঁর দ্রুত রোগমুক্তি কামনা করে অসংখ্য তারবার্তা ও পত্র আসতে লাগল। সুচিকিৎসা, মুক্ত পরিবেশ এবং পরিচর্যায় সুভাষচন্দ্র ধীরে ধীরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হয়ে উঠলেন। দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি আর একটি বিবৃতি দিলেন :

> আমার কারামুক্তির পর থেকে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে নানা ভাবের সমবেদনা ও আনন্দ জ্ঞাপক অসংখ্য সংবাদ পাইতেছি। ধনী-দরিদ্র বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল স্থানের ও সকল সম্প্রদায়ের লোকের এরূপ আকুল অভ্যর্থনা এবং আমার রোগমুক্তির জন্য ব্যাকুল

প্রার্থনায়, আমি শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কৃতজ্ঞতা ও আনন্দে এতই অভিভূত ছিলাম যে এতদিন এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে পারি নাই। বর্তমান সময়ের দলাদলি ও সাম্প্রদায়িক কলহের মধ্যে, সকল সম্প্রদায়ের ও সকল দলের লোকই আমাকে আমার হৃতস্বাস্থ্য অর্জনের প্রার্থনা করিয়া যে আন্তরিক অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করিতেছি। আমার স্বাস্থ্য চিন্তায় উদ্‌বিগ্ন হইয়া বাংলার বহু গৃহে ভগবৎ চরণে যে প্রার্থনা জানানো হইতেছে—তাহাতে আমি অতিশয় অভিভূত হইয়াছি।

দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমানে আমার যেরূপ স্বাস্থ্য, তাতে পৃথক ভাবে প্রত্যেকের পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু আশা করি একটু সবল হইলেই তাহা পারিব।***

সম্মুখে অপেক্ষাকৃত বিশ্রাম ও অবসরের যে সময় রহিয়াছে সে সময় আমি অহর্নিশি ভগবানের চরণে এই প্রার্থনাই করিব যে, দেশবাসী আমার প্রতি যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্পণ করিয়াছেন—আমি যেন কিয়দংশও তাহার যোগ্য হইতে পারি। এখন আমার প্রধান কাজ হইবে—আমাদের সম্মুখে যে সমস্যা রহিয়াছে তাহার সমাধানকল্পে আমি যেন নিভৃতে প্রস্তুত হইতে পারি।

চতুর্দিকেই নবজাগরণের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। পূজনীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অন্তর্ধানের পর যে ঘনান্ধকার আমাদিগকে আবৃত করিয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ অপসারিত হইতেছে। যাহা এখনও আছে, তাহার মধ্যেও নব প্রভাতের নবীন সূর্যের অরুণ আভা দেখা যাইতেছে। সময় হইলে, কর্মের আহ্বান আসিলে, আমরা যেন সকলেই একাগ্রচিত্তে পুনরায় কার্য আরম্ভ করিতে পারি। আজ ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

॥ ৪ ॥

দেশবন্ধুর মৃত্যু এবং মহাত্মার আশ্রমবাস কংগ্রেসের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে মন্থর করেছিল। বাংলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে দলাদলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অবর্তমানে শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু এ দুয়ের কে প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রধান হবেন প্রকাশ্যতঃ তাই নিয়ে ছিল কলহ। কিন্তু ভিতরকার কারণ ছিল ভিন্ন। কংগ্রেসের ক্ষমতা করায়ত্ত করবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল অনুশীলন ও যুগান্তর দলের মধ্যে, স্বরাজ্য পার্টি ও গান্ধীপন্থীদের মধ্যে। অন্যদিকে জাতীয় আন্দোলন মন্দীভূত হওয়ায়, মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আত্ম প্রসারের সুযোগ পেল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটলে বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমানগণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-রক্ষায় সোচ্চার হন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ এঁদের মদত দেয়, জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে। মুসলিম লীগের জন্মের বহু পূর্বে, বিভেদনীতির প্রবক্তারূপে বড়লাট লর্ড ডাফরিন ঘোষণা করেন ভারতে হিন্দু ও মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি। বড়লাটের উক্ত ঘোষণার পরেই উত্তর প্রদেশের মুসলিম নেতা স্যার সৈয়দ আহম্মদ বলেন—

বর্তমান অবস্থায় মুসলমান ও হিন্দুর পক্ষে একত্রে

ক্ষমতার সিংহাসনে বসে সমভাবে অধিকার ভোগ কি কখনো সম্ভব হতে পারে ? কখনই না।

স্যার সৈয়দ আহম্মদ সেদিন যা বলেছিলেন পরবর্তীকালে মুসলিম লীগের নেতা মিঃ এম. এ. জিন্না তারই প্রধান ধারক ও বাহক হলেন। জাতীয়তাবাদীরা মনে করতেন হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য সৃষ্টির মূলে ইংরাজের ভেদনীতি, ইংরাজ শাসনের অবসান ঘটাতে পারলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সহজতর হবে।

১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কয়েকদিন পরে তাঁকে নিখিল ভারত কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হল। কংগ্রেসের কাজ, সংবাদপত্র পরিচালনা, স্বরাজ্যদলের বকেয়া সমস্যা এবং কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ, সব কিছুর দায়িত্ব পড়ল সুভাষচন্দ্রের উপর। বাড়তি রইল কংগ্রেসের দুঃখজনক উপদলীয় কোন্দলের নিষ্পত্তির কাজ।

ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের শাসন সংস্কারকল্পে ইংলণ্ডের বিশিষ্ট আইনজীবী স্যার জন সাইমনকে সভাপতি করে সাতজন ব্রিটিশ সদস্যের একটি কমিশন নিয়োগ করলেন। ভারতীয় প্রতিনিধিবর্জিত সাইমন কমিশনকে কংগ্রেস বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিল এবং ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাইমন কমিশনের সদস্যবৃন্দ বোম্বাই-এ পদার্পণ করার দিনটিতে সারাদেশে হরতাল পালন করে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের আহ্বান জানাল। সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় নির্ধারিত দিনে কলিকাতা সহ সমগ্র বাংলায় আর একটি সফল হরতাল পালিত হল।

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত এক সর্বদল সম্মেলনে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে সভাপতি করে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ একটি পাল্টা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করলেন। সুভাষচন্দ্র ঐ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হলেন। কমিটি অনেক অনুসন্ধান, তথ্য সংগ্রহ এবং সমীক্ষার পর একটি মূল্যবান রিপোর্ট প্রণয়ন করল। রিপোর্ট

প্রণয়নে সুভাষচন্দ্রের যথেষ্ট অবদান থাকলেও প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের ভিত্তি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের সহিত তিনি একমত হতে পারলেন না, তাঁর অভিমত ছিল শাসন তন্ত্রের ভিত্তি হওয়া উচিত পূর্ণ স্বাধীনতা। রিপোর্টটি নেহেরু রিপোর্ট নামে খ্যাত।

১৯২৮ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্র সবরমতী আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করলেন এবং দেশে যে নব উদ্যমের সূচনা দেখা দিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মহাত্মাকে আশ্রমজীবন থেকে বেরিয়ে এসে সংগ্রাম শুরু করার জন্য অনুরোধ জানালেন। মহাত্মা গান্ধী সুভাষচন্দ্রকে বললেন, দেশ যে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত এমন আলো তিনি দেখছেন না।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে হিন্দুস্থান সেবাদলেব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিরূপে সহস্রাধিক যুবক সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র তাঁদের আহ্বান করে বললেন—তরুণরা কখনো অত্যাচার অনাচার ও শোষণকে মেনে নিতে পারে না। পরিবর্তনের জন্য তাঁরা তাই বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ সার্থক হয় যখন তার পিছনে থাকে নিঃস্বার্থ সেবার প্রবৃত্তি। এই সেবার মন্ত্র হল আত্মোৎসর্গ।

তারপর, ডিসেম্বরের শেষভাগে পার্ক সার্কাস ময়দানে বসল কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন। পার্ক সার্কাস ময়দান ছিল তখন ঘন তৃণাচ্ছাদিত, শিরীষ-দেবদারুর ছায়া নিবিড় ছোট একটি বনভূমির মতো। অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বেছে নিয়েছিলেন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়কের পদ। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীটিকে সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণ সামরিক পদ্ধতিতে গড়েছিলেন এবং এই বাহিনীই পরে বৈপ্লবিক সংস্থা 'বেঙ্গল ভলানটিয়ারস্' নামে খ্যাতি লাভ করেছিল।

অধিবেশনে লক্ষাধিক নরনারীর সমাবেশ ঘটেছিল। উদ্‌বোধন

সঙ্গীত গেয়েছিলেন কবি নজরুল—তাঁর সেই 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে' গান প্রাণের সুরে ভরে।

অধিবেশনে গান্ধীজীর প্রস্তাব ছিল ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ভিত্তিক স্বরাজ কংগ্রেসের লক্ষ্য, সুভাষচন্দ্র তাঁর সংশোধনী প্রস্তাবে বললেন—কংগ্রেসের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা হোক। ১৩৫০-৯৭৩ ভোটে গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হল। সেই সঙ্গে নেহেরু রিপোর্টও কংগ্রেস কর্তৃক অনুমোদিত হল। কিন্তু মুসলমান নেতারা রিপোর্টটিকে মেনে নিতে অস্বীকার করায়, নেহেরু রিপোর্টের রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস পেল।

কংগ্রেসের এই অধিবেশন গান্ধীজী সহ সকল নেতৃবর্গের উপস্থিতিতে বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ ছিল। মিশর অধিবেশনে পর্যবেক্ষক-রূপে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু কংগ্রেসে গান্ধীজীর সর্বময় কর্তৃত্ব মেনে নেবার ফলে স্বরাজ্য দলের বিলুপ্তি ঘটল।

কংগ্রেসের আদর্শ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ভিত্তিক স্বরাজ লাভ গৃহীত হলেও, বিনা সংগ্রামে যে ব্রিটিশের হাত থেকে তা পাওয়া যাবে এমন আশা কারো মনে ছিল না। সুতরাং অধিবেশন শেষে কংগ্রেস প্রতিনিধি ও কর্মীগণ যখন ঘরে ফিরলেন, তখন তাঁরা এই ধারণা নিয়ে গেলেন যে আর একটি সংগ্রাম আসন্ন।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গগনে সুভাষচন্দ্রের অভ্যুদয় বিদ্রোহী যুবশক্তির প্রাণে নতুন আশার সঞ্চার করল। ধ্বংস ও সৃজন দুই কাজই যৌবনের। স্বাস্থ্যবান দৃঢ়চিত্ত যুবকরাই পারে আদর্শের জন্য নির্ভয়ে নিঃশেষে নিজেদের বিলিয়ে দিতে। প্রবীণ নেতাদের সংস্কারবাদী দ্বিধা জড়িত চিন্তাধারা যুব মনে সাড়া জাগাতে পারে না। দেশের যুব আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার জন্য তাই ডাক পড়ল তরুণ বিদ্রোহী নায়ক সুভাষচন্দ্রের।

১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লাহোরে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে পাঞ্জাব প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। নভেম্বরে তাঁরই

সভাপতিত্বে মধ্যপ্রদেশ যুব সম্মেলন এবং ডিসেম্বরে বেরারে ছাত্র সম্মেলন হল। সর্বত্রই প্রচুর উৎসাহ, উদ্যম এবং আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পেল। যুবক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র সংশয়হীন কণ্ঠে বললেন :

> তরুণের অভিযান সমস্ত রকম বাধা বন্ধন দূর করে নূতন এক কল্যাণময় বিশ্বসমাজ গঠনে প্রয়াসী, অস্থিরতা ও অসন্তোষ তাই যুব আন্দোলনের লক্ষণ। বন্ধন থেকে মুক্তি, সংস্কার ও চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, মানবতাবিরোধী স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান—যুব আন্দোলনের মূল আহ্বান। অন্ধ আনুগত্য ও যুক্তিহীন বশ্যতার পরিবর্তে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতীতিতে চলার দিকেই এই আন্দোলনের প্রাবল্য।

সুভাষচন্দ্রের কথায় নেই মতবাদের পরানুকৃতি, তাত্ত্বিকের তর্কজাল কিংবা কূটনীতিকের বাকচাতুরী। সহজ সরল তাঁর আবেদন, অন্তরস্পর্শী তাঁর ভাবাবেগ। তিনি যুবকদের বললেন :

> যুব আন্দোলনের লক্ষ্য হল এক নূতন আদর্শের প্রেরণায় সমগ্র জীবনকে নূতনভাবে গড়ে তোলা। এই আদর্শ আমাদের জীবনে এনে দেবে এক অনাগত জীবনের সংকেত। এই আদর্শ হল সর্বাঙ্গীণ মুক্তি ও পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের আহ্বান—যা আমরা চাই তা হল সার্বিক জাগৃতি—যার স্পর্শে আমাদের জীবনে আসবে আমূল রূপান্তর। খানিকটা সংস্কারে চলবে না, উপরে চুনকাম করেও কোন লাভ নেই। প্রয়োজন আছে আজ আমাদের সমগ্র জীবনের নব পরিগ্রহ তথা পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধন।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং নতুন কোন আন্দোলন না হওয়ার ফলে, বিদ্রোহী যুবমন সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সংস্থাগুলির দিকে ঝুঁকল। কলিকাতার চৌরঙ্গী এলাকায় বোমা ছুঁড়লেন তরুণ ছাত্র গোপীনাথ সাহা, লক্ষ্য ছিল পুলিস কমিশনার মিঃ টেগার্ট, ভুলক্রমে

মরলেন অপর এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক। বিচারে গোপীনাথ সাহার প্রাণদণ্ড হল। ১৯২৫ সালে কাকোরী রেলস্টেশনের নিকট ট্রেন থামিয়ে সরকারী টাকা লুণ্ঠিত হল। ১৯২৬ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজনৈতিক বন্দীর হাতে গোয়েন্দা বিভাগের পুলিস সুপার রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্র চ্যাটার্জির মৃত্যু ঘটল। ১৯২৮ সালে পাঞ্জাবে নিহত হলেন পুলিস ইনস্পেকটার মিঃ স্যাণ্ডার্স। ১৯২৯ সালে নয়া দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইন সভাগৃহে বোমা নিক্ষেপ করলেন সর্দার ভগৎ সিং। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে কিছু কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা গ্রেপ্তার হলেন।

১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দী যতীন্দ্র দাস সরকারের আচরণের প্রতিবাদে অনশন করে লাহোর জেলে মৃত্যুবরণ করলেন। মামলার অপর বন্দীরা সর্দার ভগৎ সিং, রাজগুরু, বটুকেশ্বর দত্ত, শুকদেব প্রভৃতি ফাঁসীতে প্রাণ দিলেন। পুলিস একটার পর একটা রাজদ্রোহমূলক ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করে দেশকর্মীদের কারারুদ্ধ করতে লাগল।

এই সময় রানাঘাটের নিকটে মাজদিয়া স্টেশানে এক ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় আহত যাত্রীদের প্রতি মারাত্মক অবহেলার বিষয়ে 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ করায় সরকার কর্তৃক পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের হয়। মামলায় সরকার পক্ষ 'ফরোয়ার্ডে'র বিরুদ্ধে দেড় লক্ষ টাকার ডিক্রী পান। ফলে, 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না। সুভাষচন্দ্রের তৎপরতায়, মামলার ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, একরাত্রির মধ্যে 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকাটি 'লিবার্টি' নাম নিয়ে যথারীতি প্রকাশিত হলে সরকার ও জনসাধারণ বিস্মিত হন।

১৯২৯ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন স্বয়ং গান্ধীজী, যিনি এক বছর আগে কালকাতা

অধিবেশনে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করলেও, লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য আবশ্যক কর্মসূচীর উল্লেখ না থাকায়, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের পরিচালনাধীনে একটি কৃষক, শ্রমিক ও যুব ফ্রন্ট গড়বার পরিকল্পনা মূল প্রস্তাবের সহিত সংযুক্ত করতে প্রয়াসী হন। প্রবীণ নেতৃবৃন্দের বিরোধিতায় সুভাষচন্দ্রের সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে গান্ধীজী বললেন—যেহেতু দেশে হিংসাত্মক নীতিতে বিশ্বাসী একটি দল আছে যাহারা বক্তৃতা, প্রস্তাব বা সম্মেলনাদিতে কর্ণপাত করিবে না, বরং কেবল প্রত্যক্ষ সংগ্রামেই বিশ্বাসী—একমাত্র আইন অমান্যের দ্বারাই আসন্ন অরাজকতা ও গুপ্ত অপরাধ হইতে দেশ রক্ষা পাইতে পারে।

অহিংসনীতির প্রচার সত্ত্বেও সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী কর্মীগণ তাঁদের আদর্শের প্রতি আস্থা হারান নি। তাঁরা জানতেন, ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থান বিশেষ সময় ও সুযোগ ছাড়া সম্ভবপর নয়। তার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রস্তুতি ও প্রতীক্ষার। সন্ত্রাসমূলক খণ্ড-অভিযান গুলিকে তাঁরা সেই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে মনে করতেন। তাছাড়া সশস্ত্র কর্মপন্থাকে সজীব ও সতেজ করে রাখার জন্যও এগুলির প্রয়োজন ছিল। কর্মনীতির প্রয়োজনে গোপনীয়তা রক্ষা ছিল দলের প্রথম ও প্রধান বিধান, আর তার জন্যই দলকে নিবিড় ও ছোট করে গড়তে হত। গুপ্তদলগুলি পৃথক হলেও আবশ্যক বোধে সংঘবদ্ধ হতে দ্বিধা করত না। সশস্ত্র সংগ্রামীদের কর্মসাধনাকে তাই বিচ্ছিন্ন ভাবে না দেখে, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে এক অখণ্ড শক্তি প্রবাহ বলে মানতে হয়। বিশেষ করে, সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডের সার্থকতা কর্মের চেয়ে বেশি ছিল কর্মীদের গভীর প্রেরণা সঞ্চারী নির্ভীক আত্মবলিদানের দৃষ্টান্তে—একথা ইতিহাস সম্মত সত্য।

১৯২৯ সালের ১২ই মে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে চট্টগ্রামে যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বললেন :

"মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা না হারালেও, অহিংস সংগ্রামের দ্বারা দেশের মুক্তিলাভ কি ভাবে সম্ভবপর তিনি বুঝে উঠতে পারেন না।"

[Judgement of the Special Tribunal for the trial of the Chittagong Armoury Raid Accused.]

পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণের পর সরকার পক্ষ থেকে কোনরূপ আপোস আলোচনার কথা উত্থাপিত না হওয়ায়, আন্দোলন শুরু করা ছাড়া কংগ্রেসের গত্যন্তর ছিল না। তবুও কংগ্রেসের নেতৃ-মণ্ডলী আন্দোলন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। সংগ্রামের সূচনা করলেন সুভাষচন্দ্র। ১৯৩০ সালের ২৩শে জানুয়ারী তিনি কলিকাতায় বহু সহকর্মীর সহিত আইন অমান্য করে কারাবরণ করলেন।

২রা মার্চ গান্ধীজী আইন অমান্য সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন এবং ৬ই এপ্রিল বোম্বাই-এর সন্নিকটে ডাণ্ডী গ্রামে কিছু অনুগামীর সহিত লবণ আইন ভঙ্গ করে সমুদ্র জল থেকে লবণ তৈরি করে আইন অমান্য করলেন। সরকার গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায়, ৫ই মে গান্ধীজী দলবলসহ ধরসনা গ্রামের লবণ-গোলা অধিকার করবেন বলে ঘোষণা করলেন। পুলিস ঐদিনই গান্ধীজী এবং তাঁর সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করল। গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সঙ্গে সমস্ত দেশে আইন অমান্য সংগ্রাম বিস্তৃত হল। এক বৎসরের মধ্যে নব্বই হাজার নরনারী আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করলেন। আন্দোলন দমনে সরকার অহিংস আইন অমান্যকারী সত্যাগ্রহীদের উপর অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন, গৃহতল্লাসীর নামে লুণ্ঠন, নারীর শ্লীলতাহানি, মিথ্যা মামলায় ধার্য

জরিমানা আদায়ের জন্য ঘরবাড়ী ক্রোক, পিটুনিকর ধার্য এবং গুলি-চালনা—কোন কিছু করতে বাদ দিলেন না।

১৯৩০-এর আন্দোলনে মুসলমানদের যোগদান ছিল খুবই সীমিত ধরনের। দমননীতি অতীব নিষ্ঠুর হলেও বোম্বাই-এর নিকটবর্তী শোলাপুর ছাড়া কোথাও আন্দোলনকারী জনতা অহিংস নীতি থেকে বিচ্যুত হন নি। সেখানে সামরিক আইন জারী হয় এবং পুলিস ও সৈন্যদল অকথ্য অত্যাচার চালায়। পেশোয়ারে গুলিচালনার ফলে একদিনে বহু লোক হতাহত হয়। বাংলায় মেদিনীপুর আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।

আন্দোলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপর গাড়োয়াল রেজিমেন্টের গুলি চালাতে অসম্মতি। সৈন্যদলটিকে তার জন্য সামরিক আদালতে কঠোর দণ্ড গ্রহণ করতে হয়।

সংবাদ পত্রের উপর কড়া বিধিনিষেধ প্রবর্তিত হওয়ায় জনসাধারণ পুলিসী অত্যাচারের কোন সংবাদ জানতে পারত না। এই সময়কার সেন্সর ব্যবস্থা সম্বন্ধে ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে ইংরাজ লেখক এডগার ওয়েলেস বলেছিলেন—

> "A censorship has been established in India, naturally because censorship is the most powerful weapon that bureaucracy can weild. It hides their mistakes. It perverts the truth. It is a stupid and senseless thing. It is a face saver of the officialdom. It qualifies rank failures for honours. It represents incompetent man as a man of genius. It is the first and most alarming sign of political panic. A censorship is a liar's charter and hides nothing from the enemy."
>
> —Statesman, 12.3.33.

মহাত্মা গান্ধী যখন ডাণ্ডী সমুদ্রতীরে লবণ আইন অমান্য করে

পৃথিবীর বৃহত্তম অহিংস গণ-সংগ্রাম রচনায় ব্যস্ত, তখন ভারতবর্ষের অপর প্রান্তে চট্টগ্রাম শহরে, ১৮ই এপ্রিল, সশস্ত্র বিপ্লবীদল এক দুঃসাহসিক অভিযান চালালেন। বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করলেন, রেল-টেলিগ্রাফ-টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন, চট্টগ্রামের ইংরাজ অফিসর-সওদাগররা প্রাণ ভয়ে শহর ত্যাগ করে জাহাজে উঠে সপরিবারে দূর সমুদ্রে আশ্রয় নিলেন, স্থানীয় পুলিসবাহিনী ব্যারাক ছেড়ে পালিয়ে গেল। সাময়িকভাবে হলেও চট্টগ্রামের উপর জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ল।

এই বিস্ময়কর সফল অভিযানের নায়ক ছিলেন চিরস্মরণীয় শ্রীসূর্য সেন এবং তাঁর দলের নাম ছিল ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি।

সুভাষচন্দ্র জেলে থাকাকালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি এবং কলিকাতা পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হলেন।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিযোগে বহু তরুণ গ্রেপ্তার হয়ে চট্টগ্রাম স্পেশাল ট্রাইবুনাল আদালতে বিচারার্থে আনীত হলে সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে কলিকাতার বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীসন্তোষকুমার বসু অভিযুক্তদের পক্ষ সমর্থন করতে চট্টগ্রামে গেলেন। মাঝে মাঝে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল ব্যারিস্টারদ্বয় সন্তোষ বসুকে পরামর্শ ও আইনগত সাহায্য দিতে আদালতে উপস্থিত হতেন। দুবছর ধরে বিচারকার্য চলল এবং এঁদের চেষ্টায় অভিযুক্তদের মধ্যে কিছু মুক্তি পেলেন এবং অপর সকলে প্রাণদণ্ডের আদেশ এড়াতে সক্ষম হলেন। নায়ক শ্রীসূর্য সেন পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করে ফাঁসী কাষ্ঠে মৃত্যু বরণ করলেন।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর, ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট ঢাকা শহরে পুলিস বিভাগের প্রধান মিঃ লোম্যান সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে নিহত এবং ঢাকার পুলিস সুপার মিঃ হডসন গুরুতররূপে আহত

হলেন। অভিযান চালিয়েছিলেন বিপ্লবী বীর শ্রীবিনয় বসু। পুলিস তাঁকে ধরতে পারল না।

তারপর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল কলিকাতার সরকারী দপ্তর রাইটার্স বিল্ডিংস-এ বিপ্লবীদের দুঃসাহসিক অভিযান। অভিযাত্রী ছিলেন বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স দলের সেই তরুণ বীর শ্রীবিনয় বসু, শ্রীবাদল গুপ্ত এবং শ্রীদীনেশ গুপ্ত। তাঁদের গুলিতে নিহত হলেন কারা বিভাগের প্রধান মিঃ সিমসন, আহত হলেন কয়েকজন ইংরাজ অফিসার। গুলি ফুরিয়ে গেলে বিনয় বসু পটাসিয়াম সাইনায়েড খেয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করলেন, বাদল ও দীনেশ গুপ্ত ফাঁসীতে প্রাণ দিলেন।

ব্রিটিশ সরকার দেশের মুক্তি-সংগ্রামের গতি ও পরিণতি লক্ষ্য করে চিন্তিত হলেন। অশান্ত অবস্থাকে আয়ত্তে আনবার উদ্দেশ্যে গান্ধীজীকে মুক্তি দিয়ে আপোস-আলোচনার ধূম্রজাল সৃষ্টিই সরকারের নিকট উৎকৃষ্ট পন্থা বলে বিবেচিত হল। অল্প দিনের মধ্যে বড়লাট লর্ড আরউইন ও মহাত্মাগান্ধীর মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হল।

১৯৩১ সালের ১৬শে জানুয়ারী কলিকাতায় এক প্রতিবাদ মিছিল পরিচালনা কালে সুভাষচন্দ্র পুলিস কর্তৃক প্রহৃত ও গ্রেপ্তার হলেন। তখন তিনি কলিকাতার মেয়র।

মার্চ মাসে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সুভাষচন্দ্র বোম্বাই-এ গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করলেন এবং লর্ড আরউইন ও গান্ধীজীর মধ্যে যে আলোচনা চলছিল তার বিশদ বিবরণ অবগত হলেন। প্রস্তাবিত চুক্তি ও আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার সম্পর্কে তিনি গান্ধীজীর সহিত একমত হতে পারলেন না।

মার্চের শেষে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে করাচীতে কংগ্রেসের যে সংক্ষিপ্ত অধিবেশন হল তাতে প্রস্তাবিত গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদিত হল। কংগ্রেস চুক্তির শর্তানুযায়ী আইন অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে, ভারতের ভবিষ্যৎ

শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে, প্রস্তাবিত লণ্ডন গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

করাচীতে কংগ্রেস অধিবেশন চলাকালে ঐ শহরেই সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে নওজোয়ান ভারত সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। অধিবেশনে গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হল। প্রস্তাবে বলা হল—চুক্তিটিতে নানা তুচ্ছ বিষয়ের অবতারণা থাকলেও স্বরাজের সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নি, রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির ব্যাপারে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ, ধর্মঘটী শ্রমিক বন্দী এবং রাজবন্দীদের বাদ দেওয়া হয়েছে।

সভাপতির ভাষণে চুক্তির ত্রুটিপূর্ণ শর্তগুলির কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে সুভাষচন্দ্র বললেন :

> গান্ধী-আরউইন চুক্তি জাতির পক্ষে আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ বিশেষ। আপোস আলোচনার দ্বারা ব্রিটিশের হাত থেকে দেশের শাসন ক্ষমতা লাভের আশা ভ্রান্তিমূলক। প্রস্তাবিত চুক্তি কার্যতঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দীপনাকে শিথিল করবে এবং ভবিষ্যতে এই জাতীয় ব্যাপক আন্দোলন যাতে গড়ে উঠতে না পারে তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য সরকারকে সময় ও সুযোগ দেবে।

কংগ্রেসের নিকট চুক্তিটি ছিল ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কংগ্রেসকে একমাত্র সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি ও বর্ধিত মর্যাদা-দানের নিদর্শনস্বরূপ। গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদনের ফলে আইন অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে প্রত্যাহৃত হল এবং আন্দোলনে দণ্ডিত বন্দীগণ মুক্তিলাভ করলেন। সাময়িক হলেও কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল।

১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরের জেলাশাসক মিঃ পেডি এবং ২৭শে জুলাই আলিপুরের জেলা ও সেসন জজ মিঃ গার্লিক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হলেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রিবেলায় পুলিস হিজলী জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে দুইজন রাজবন্দীকে হত্যা এবং শতাধিক রাজবন্দীকে আহত করল। পুলিসের এই জাতীয় নিষ্ঠুর ও অবৈধ গুলিচালনার প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করলেন।

সরকারের নৃশংস হীন প্রতিশোধমূলক কার্যের নিন্দার উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে কলিকাতার ময়দানে যে প্রতিবাদ সভা হল, অসুস্থতা সত্ত্বেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সেই সভায় উপস্থিত হয়ে বললেন :

এতবড় জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক। কিন্তু ডাক যখন পড়ল, থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে। * * * প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে ; কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি ?

একথা ভুললে চলবে না যে, প্রজাদের অনুকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের পরেই বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

সুভাষচন্দ্র সেদিন সেই সভায় বলেছিলেন :

আমরা জানি, আত্মত্যাগীর রক্তের বিনিময়েই স্বাধীনতা ক্রয় করা সম্ভবপর। সকল যুগ, সকল সময় হইতেই আমরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিতেছি। আমাদের ক্ষেত্রেও উহার ব্যতিক্রম আশা করা উচিত নয়।

হিজলীর গুলীবর্ষণের ঘটনায় এই সত্যই আমার নিকট

প্রতিভাত হইয়াছে। হিজলী-চট্টগ্রামের ব্যাপার বাংলা কখনও নীরবে সহ্য করিবে না। এক বাক্যে ইহার প্রতিকার দাবি করিবে।

১৯৩১ এর ১৪ই ডিসেম্বর কুমিল্লার জেলাশাসক মিঃ স্টিভেন্স বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হলেন। আততায়ী এবার পুরুষ নয়। ৮ম শ্রেণীর দুটি ছাত্রী কুমারী শান্তিসুধা ঘোষ এবং কুমারী সুনীতি চৌধুরী। উভয়েই বি. ভি.-র বালিকা কর্মী।

মেদিনীপুরে মিঃ পেডির পর নতুন জেলাশাসক মিঃ বার্জ বিপ্লবীর গুলিতে ধরাশায়ী হলেন। আক্রমণকারী বি. ভি-র কর্মী। চট্টগ্রামে-ঢাকা-কুমিল্লা-মেদিনীপুর-কলিকাতা ঘিরে সন্ত্রাসমূলক বৈপ্লবিক তৎপরতা শাসককুলের দারুণ ভীতির কারণ হল।

ঢাকার উপর এই সময় গুরুতর পুলিসী নির্যাতন চলতে থাকায় সুভাষচন্দ্র ঘটনার তদন্তের উদ্দেশ্যে কলিকাতা থেকে ঢাকার পথে ১৯৩১ সালের ৭ই নভেম্বর নারায়ণগঞ্জে পৌঁছলে, পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে চাঁদপুরে এনে কলিকাতায় ফিরে যেতে বলে। সুভাষচন্দ্র পুলিসের নির্দেশ অমান্য করলে তাঁকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক করা হয়। এক সপ্তাহ পরে সরকার তাঁকে মুক্তি দিলে তিনি ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহিত মিলিত হন এবং সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পুলিস-উপদ্রুত অঞ্চলও তিনি স্বচক্ষে দেখেন কিন্তু সপ্তাহকাল তাঁকে জেলে আটক রেখে, পুলিস সেখানে যে সকল জঘন্য অনাচার করেছিল তার অনেক প্রমাণ সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

এরপরে বিপ্লবীর গুলিতে মরলেন কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিস সুপার কুখ্যাত মিঃ ই. বি. এলিসন। এলিসন আইন অমান্য আন্দোলন কালে যশোহরে ভয়াবহ পুলিসী অত্যাচার এবং বহু নিন্দনীয় পন্থায় বন্দবিলা সত্যাগ্রহ দমনে তৎপর হয়েছিলেন। পুলিস বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আততায়ীর কোন সন্ধান পেল না।

১৯৩১ এর সেপ্টেম্বরে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে ইংলণ্ডে গেলেন এবং ডিসেম্বরে দেশে ফিরে এলেন শূন্যহাতে। মুসলমানদের জন্য সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচন প্রথার দাবি সম্পর্কে মুসলিম লীগ নেতা মিঃ জিন্নার অনমনীয় মনোভাবের কারণে বৈঠক সফল হল না। ব্রিটিশ সরকার অবশ্য মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কোন কার্পণ্য করলেন না। বাকিংহাম প্রাসাদে রাজকীয় ভোজসভায় মহাত্মা গান্ধীকে সংবর্ধনা জানান হল।

দেশে ফিরে গান্ধীজী দেখলেন, গান্ধী-আরউইন চুক্তির শর্ত সরকার কর্তৃক সর্বত্র লঙ্ঘিত হচ্ছে। তিনি বিষয়টি বড়লাটের গোচরে আনলেন। নতুন বড়লাট লর্ড উইলিংডন তেমন গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখতে চাইলেন না। এমন কি ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোরের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তখন গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করতে অসম্মতি জানালেন। গান্ধীজীর সম্বন্ধে বড়লাট লর্ড উইলিংডনের ধারণা ছিল—

"A sort of Jekyll & Hyde and the most Machiavellian bargaining little humbug I have come across."

—Judith M. Brown.

Gandhi and Civil Disobedience.

১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারী নৈরাশ্য পীড়িত মহাত্মার নেতৃত্বে বোম্বাই-এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসল। কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন তাতে বলা হল—কংগ্রেস সাত দিনের মধ্যে সরকারের কাছ থেকে সদুত্তর চায়, অন্যথায় আবার আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হবে।

সরকার প্রস্তুত ছিলেন। কালবিলম্ব না করে পুলিস গান্ধীজী, সর্দার প্যাটেল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, খান আবদুল গফ্ফর খান প্রমুখ নেতাদের কারারুদ্ধ করল। বোম্বাই থেকে কলিকাতা

ফেরার পথে কল্যাণ স্টেশানে ট্রেনের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র ১৮১৮ সালের ৩ আইনে গ্রেপ্তার হলেন। তাঁকে প্রথমে মধ্যপ্রদেশের সিডনী জেলে এবং পরে জব্বলপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হল।

জব্বলপুর জেলে সুভাষচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে ভাওয়ালী স্বাস্থ্য নিবাসে আটক রাখা হল। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি ঘটল না। তাঁর গায়ে সর্বক্ষণ জ্বর, পেটে বেদনা এবং অনিদ্রারোগ দেখা দিল। তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্ণৌ-এর একটি হাসপাতালে আনা হল। সেখানকার ইংরাজ ডাক্তার কর্নেল বাকলি রোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করে চিকিৎসার জন্য সুভাষচন্দ্রকে ইউরোপে যাবার পরামর্শ দিলেন।

ডাক্তারের সুপারিশমত সরকার সুভাষচন্দ্রকে জেল থেকে পুলিস নিয়ন্ত্রণাধীনে বোম্বাই এনে স্ট্রেচারে শুইয়ে ১৯৩৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী একটি ইউরোপগামী জাহাজে তুলে দিলেন। এইভাবে সুভাষচন্দ্র চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ভিয়েনা অভিমুখে রওনা হলেন। যাত্রার পূর্বে বিশেষভাবে পরিচিত দু-একজন ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হল না। বিদেশ-যাত্রা ও চিকিৎসার ব্যয়ও তাঁর নিজেরই সংগ্রহ করতে হল। মন তাঁর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।

"দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক
তবে তাই হোক্।
মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক
তবে তাই হোক॥"

॥ ৫ ॥

১৯২১ থেকে ১৯৩২ সাল—এগারটি বছর সুভাষচন্দ্র দেশের ছাত্র ও যুব আন্দোলন, কংগ্রেসের অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন এবং সশস্ত্র বৈপ্লবিক কর্মধারার সহিত যুক্ত থেকে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রামাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে ভারতবর্ষের মুক্তি প্রচেষ্টাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেলেন। এর জন্য তিনি বার বার কারাদণ্ড ও নির্বাসনদণ্ড হাসিমুখে বরণ করলেন। এই সময়ে তিনি কখনো কলিকাতা পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তা, কখনো মেয়র, অধিকাংশ সময় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, সংবাদপত্রের সম্পাদক ও পরিচালক, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক, দেশময় সভা-সমিতি-সম্মেলনের সভাপতি এবং জাতীয়তা-বাদের প্রধানতম প্রবক্তারূপে কঠোর পরিশ্রম করলেন। আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হলেও তিনি যোগদানের সুযোগ পাননি। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে অনেকে দুঃখময় দীর্ঘ কারাজীবনকে মেনে নিয়ে চলেছেন দেখা যায় কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রকৃতি ছিল স্বতন্ত্র। কারারুদ্ধ হলেই কিছুদিনের মধ্যে তাঁর অন্তর বিদ্রোহী হয়ে উঠত এবং তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তেন। বাইরের অসমাপ্ত কাজ তাঁকে অবিরত যেন আহ্বান করত এবং তিনিও জানতেন সে কাজ তাঁরই, সেই কাজের জন্যই তাঁর জন্ম এবং জীবনধারণ।

৮ই মার্চ সুভাষচন্দ্র ভিয়েনায় ডাঃ ফুর্থের নার্সিং হোমে ভর্তি

হলেন। সেখানে কিছুদিন চিকিৎসার পর সম্পূর্ণ রোগ নিরাময়ের জন্য গেলেন সুইজারল্যাণ্ডে। সুইজারল্যাণ্ড থেকে আবার ফিরে এলেন ভিয়েনায়। কেন্দ্রীয় আইনসভার অধ্যক্ষ শ্রীবিঠলভাই প্যাটেল তখন চিকিৎসার জন্য ভিয়েনায় বাস করছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সহিত বিঠলভাই-এর পরিচয় হল এবং অল্প দিনের মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল। বয়সের ব্যবধান উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন সৃষ্টিতে বাধা হল না।

১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলন ১৯৩০-এর ন্যায় ব্যাপক ও শক্তিশালী হতে পারল না। কংগ্রেসের বহু অনুগামী গান্ধীজীর অহিংসনীতি ও নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে শাসক সরকারের মনের পরিবর্তন সাধনের তত্ত্ব পূর্বের আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছিল। অবস্থা অনুধাবন করে মহাত্মা দ্বিতীয় দফার আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন এবং তাঁর চিরাচরিত প্রথায় সরকারকে বললেন— সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তিদান ও দমনমূলক অর্ডিন্যান্সগুলি বাতিল করে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করুন।

মহাত্মার আবেদনে সরকার সাড়া দিলেন না। যে স্রোত গঙ্গা দিয়ে বহে চলে গেছে তাকে কি আর ফিরিয়ে আনা যায়? ১৯৩০ সালের শেষে যা সম্ভবপর ছিল, ১৯৩৩ সালে তা আর ঘটল না।

আন্দোলন প্রত্যাহারের সংবাদে সুভাষচন্দ্র ক্ষুব্ধ হলেন। শ্রীবিঠলভাই প্যাটেল এবং সুভাষচন্দ্র ভিয়েনা থেকে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক যুক্ত বিবৃতি দিলেন।

> আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে মহাত্মা গান্ধী যা করলেন তাতে মেনে নেওয়াই হল যে কংগ্রেসের বর্তমান কর্মপন্থা অচল। আমরা সুস্পষ্টভাবে মনে করি, রাষ্ট্রনেতা হিসাবে মহাত্মা গান্ধী ব্যর্থ হয়েছেন। কংগ্রেসের পুনর্গঠনে নেতৃত্বের পরিবর্তন আবশ্যক।

বিশিষ্ট আইনজীবী, দূরদর্শী রাজনীতিক ও দেশসেবক শ্রীবিঠলভাই সুভাষচন্দ্রকে চিনেছিলেন। তিনি বিদেশে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রচার কার্যের জন্য তাঁর উইলে সুভাষচন্দ্রের জন্য এক লক্ষ টাকা দানের ব্যবস্থা করে গেলেন। ভিয়েনাতেই বিঠলভাই-এর মৃত্যু হল।

ইউরোপে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, জার্মানী, তুরস্ক, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আয়ার্ল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া এবং রুমানিয়া ভ্রমণ করলেন। প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রগঠন, শিক্ষাসংস্কৃতি, কৃষি ও শিল্পোন্নয়ন সংস্থাগুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে যত্নবান হলেন। এই সকল দেশের প্রধান প্রধান রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, অধ্যাপক এবং রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁদের চিন্তাধারার বিষয় গভীর মনোযোগ সহকারে শুনলেন। প্রয়োজনবোধে ভাব বিনিময়ও হল। তাঁর নির্বাসিত জীবনের দিনগুলি নব প্রতিশ্রুতির আভায় রঙিন হয়ে উঠল।

তিনি যে দেশে গেলেন সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়গণ তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণে অভিনন্দিত করল। তিনি ছাত্র ও তরুণ কর্মীদের নিজেদের কাজের সহিত ভারতের মুক্তি সংগ্রামের জন্য কিছু না কিছু করতে বললেন।

দলাদলির কোলাহলমুক্ত বিদেশে বার্চ-পাইনের নিভৃত ছায়াতলে বসে সুভাষচন্দ্র আপনার মনে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভবিষ্যৎ ব্লুপ্রিন্ট এঁকে চলেছেন। তিনি ইতিমধ্যে সান্নিধ্য পেয়েছেন মনীষী রোমা রোলাঁর, প্রগাঢ় বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়েছেন আয়ার্ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রনায়ক মিঃ ডি. ভ্যালেরার সঙ্গে। চেকোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান মিঃ বেনেস এবং তুরস্কের বিপ্লবী নায়ক কামাল আতাতুর্কের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। অবসর সময়ে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস – দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল।

এই সময় ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতীয়দের রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার নিমন্ত্রণ এল সুভাষচন্দ্রের কাছে। কিন্তু ব্রিটিশ

সরকার তাঁকে ইংলণ্ড গমনের অনুমতি না দেওয়ায়, তাঁর পক্ষে সম্মেলনের সভাপতিত্ব করা সম্ভব হল না। ১৯৩৩ সালের ১০ই জুন লণ্ডনের ফিয়ার্স হলে অনুষ্ঠিত সেই সম্মেলনে অনুপস্থিত সভাপতির ভাষণ পঠিত হল। সেই লিখিত অভিভাষণে ছিল :

> ইংরাজের মনোভাব এবং তার অস্তিত্ব হয়তো আরো অনেকদিন এমনি অটুট থাকবে, যদি আমরা অস্ত্রের সাহায্যে বা আর্থিক অবরোধের দ্বারা ইংরাজ ও তার সহযোগিদের জীবন অচল, ভীতিপ্রদ ও অতিষ্ঠ করে তুলতে না পারি। আইন অমান্য আন্দোলন তা করতে পারে নি।

ব্রিটিশের আচরণে সেদিন অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। যে ইংলণ্ড অনায়াসে কার্ল মার্কসকে আশ্রয় দিতে পারে, 'অর্ধনগ্ন বিদ্রোহী ফকির' গান্ধীজীকে রাজার ভোজসভায় এনে সমাদর দেখায়, সে কিনা নির্বাসিত নিঃসম্বল সুভাষচন্দ্রকে তার মাটিতে পা রাখতে দিতে এত ভয় পায়? গণতান্ত্রিক ব্রিটেনের ইতিহাসে এর একটিমাত্র নজির দেখা যায়—সে হল ঠিক একশত আঠার বছর আগে বন্দী রাজ্যচ্যুত সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টিকে ইংলণ্ডে অবতরণের অস্বীকৃতি।

সুভাষচন্দ্রের স্পষ্টোক্তি ইংলণ্ডের রক্ষণশীল পত্রিকাগুলির উষ্মার কারণ হল, তারা সুভাষচন্দ্রকে কমিউনিস্ট, ফ্যাসিস্ট, বিশ্ব-বিপ্লবী ইত্যাদিতে অভিহিত করে প্রবন্ধ লিখল এবং ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে এই বিপজ্জনক ব্যক্তিটির সম্পর্কে সতর্ক করে দিল।

সুভাষচন্দ্র ভিয়েনা থেকে অপপ্রচারের প্রতিবাদে এক বিবৃতি প্রকাশ করলেন :

> পৃথিবী জুড়ে নানা মতবাদের এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। তার মধ্যে শেষ পর্যন্ত কোন্‌টি টিঁকে থাকবে তার কোন স্থিরতা নেই। ভাল করে দেখে শুনে তার মধ্যে যা সত্য, যা ভারতের পক্ষে কল্যাণকর, তাই আমরা গ্রহণ করব।

আগে থেকে কোন নির্দিষ্ট মতবাদের কাছে আমাদের মস্তিষ্ক বন্ধক রাখতে আমরা রাজী নই।

পিতার গুরুতর অসুখের সংবাদ পেয়ে সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি নিয়ে বিমানে কলিকাতা রওনা হলেন। ১৯৩৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর, প্রায় তিন বছর ইউরোপে নির্বাসনে কাটাবার পর, তিনি করাচী হয়ে দমদম বিমানবন্দরে নামলেন। পিতার সহিত তাঁর দেখা হল না, দুদিন আগে জানকীনাথ ইহলোক ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। দমদম বিমান ক্ষেত্রে অপেক্ষমান পুলিস সুভাষচন্দ্রের উপর এক সরকারী আদেশ জারী করল—সুভাষচন্দ্র বিমানবন্দর থেকে সোজা তাঁর এলগিন রোডের বাড়ীতে চলে যাবেন, বাড়ীর লোক ছাড়া অপরের সহিত দেখাসাক্ষাৎ বা কথা বলা চলবে না, ডাক যোগে তাঁর নামে যে চিঠিপত্র আসবে সেগুলি না খুলেই পুলিসের গোয়েন্দা দপ্তরে জমা দিতে হবে। এই আদেশ অমান্য করলে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

শোকভারাক্রান্ত সুভাষচন্দ্রকে সরকারের এই আদেশ গভীর আঘাত দিল। বহুদিন গৃহছাড়া হয়ে কাটাবার পর দুঃখ বেদনা সন্তপ্তা জননীর নিকটে থাকবার আকর্ষণ ও দায়িত্ববোধ তাঁকে সরকারের অমানবিক প্রতিহিংসাপরায়ণ আদেশকে মেনে নিতে শক্তি জোগাল।

সরকার কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বছর পুরতে না পুরতেই সুভাষচন্দ্রের উপর নতুন আদেশ জারী হল—তাঁকে অবিলম্বে ইউরোপে নির্বাসনে ফিরে যেতে হবে। আদেশ অমান্য করলে কি হবে তা ত জানাই ছিল, কারাবাস দ্বারা দেশব্রত উদ্‌যাপনে সুভাষচন্দ্রের আর আগ্রহ ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিকল্প পন্থা তিনি তখন মনে মনে স্থির করে ফেলেছেন। দেশে থেকে বন্দীদশা বরণের চেয়ে তাঁর কাছে ইউরোপে অবস্থান করে, মুক্তি সংগ্রামের জন্যে কাজ করে যাওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে হল।

১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র পুনরায় ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করলেন। স্বর্গত বিঠল ভাই প্যাটেলের উইল অনুসারে সুভাষচন্দ্রের যে একলক্ষ টাকা পাবার কথা ছিল, তা এই সময় পেলে তাঁর কাজের সুবিধা হত। কিন্তু সে টাকা তিনি পেলেন না। আইনের ফ্যাঁকড়া তুলে উইলের অছিগণ আদালতের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট শর্তটি নাকচ করে দিলেন। অছিদের অন্যতম ছিলেন উইলকর্তার ভ্রাতা সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল।

সুভাষচন্দ্রের জরুরী প্রয়োজনে সব সময়ই অর্থাভাব মিটিয়েছেন শ্রীশরৎচন্দ্র বসু। এবারও তিনি সহায় হলেন।

ভিয়েনায় যাবার পথে সুভাষচন্দ্র রোমে ইতালীর রাষ্ট্র নায়ক মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করলেন। উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতিমূলক আলাপ হল।

ইতিমধ্যে লণ্ডনের মেসার্স উইশার্ট এণ্ড কোং লিঃ 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' প্রকাশ করেছে এবং সমগ্র ইউরোপে তার প্রভাব পড়েছে। প্রকাশক কোম্পানী বইখানির জন্য সুভাষচন্দ্রকে অগ্রিম রয়ালটি পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে।

'দি ইণ্ডিয়াল স্ট্রাগল' পড়ে দার্শনিক পণ্ডিত রোমা রোলাঁ সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন :

"ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জানতে হলে এই বই অপরিহার্য। ঐতিহাসিকের মহত্তম গুণ আপনার মধ্যে ফুটে উঠেছে। * * * রাজনীতির সীমাহীন কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকেও দলীয় মনোভাব আপনার বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেনি। এটা দুর্লভ। * * * আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন এই কামনা করি। ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য আপনার সুস্থ হয়ে উঠতেই হবে।"

সুভাষচন্দ্র এই সময় শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর দেহে একটি বড় রকমের অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল।

'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' ইংলণ্ডে প্রচুর বিক্রয় হল এবং ইংরাজ

পাঠকবর্গের নিকট ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ প্রকাশ করে দিল। ভারত সরকার বইখানির ভারতে প্রবেশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করে আদেশ জারী করলেন।

সুভাষচন্দ্র সুস্থতা লাভ করবার পর, বিশেষ আমন্ত্রণে ভিয়েনায় ইণ্ডিয়ান সেন্ট্রাল ইউরোপীয়ান সোসাইটির সম্মেলন এবং রোমে অনুষ্ঠিত এশীয় ছাত্র সম্মেলনে প্রধান অতিথিরূপে যোগদান করলেন। তারপর তিনি গেলেন আয়ার্ল্যাণ্ডে। ডাবলিন শহরবাসী সুভাষচন্দ্রকে নাগরিক সংবর্ধনা জানাল। আইরিশ নেতৃবৃন্দের সহিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হল।

ভিয়েনায় ফিরে এসে তিনি দেশে ফেরার সংকল্প করলেন। ভিয়েনার ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তন ব্রিটিশ সরকারের অভিপ্রেত নয় এবং স্বাধীন নাগরিকের ন্যায় তিনি ভারতে প্রবেশ করতেও পারবেন না। সুভাষচন্দ্র অবশ্য নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং ১৯৩৬ সালের ১১ই এপ্রিল বোম্বাই পৌঁছলেন। জাহাজেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল এবং তিনি যারবেদা জেলে অবরুদ্ধ হলেন।

সরকারের নীতিবিগর্হিত কঠোর আচরণে সমগ্র দেশ ক্ষুব্ধ হল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবং কংগ্রেস সোস্যালিস্টদল সরকারের কাজের নিন্দা করল এবং অবিলম্বে সুভাষচন্দ্রের মুক্তির দাবি জানাল। ১৯৩৬ এর ১০ই মে সারা ভারতে 'সুভাষ দিবস' পালিত হল। সংবাদপত্রগুলি প্রশ্ন তুলল—সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে সরকারের উচিত বিচারের জন্য তাঁকে আদালতে উপস্থিত করা। সরকার তা কেন করছেন না? জবাব দিন।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানালেন। তিনি বললেন: "বাংলাদেশে হাজার হাজার নরনারী আজ বন্দীশালায়। বিচারের দাবি করচিই, সেই দাবির পিছনে দুঃখ আছে দুঃসহ, কিন্তু জোর নেই। বিনা বিচারে যারা দণ্ডভোগ করছে অপরিমিত কাল ধরে, তাদের মধ্যে

দেশের যে বেদনা আছে, তার চেয়ে অনেক বড়ো আছে দেশের অসম্মান।

বিচারের অধিকারে আছে মনুষ্যত্বের সম্মান। তার থেকে আমরা বঞ্চিত। কেন না, আমরা বিশ্বের গোচর নই। আমাদের মূল্য নেই। এই দেশব্যাপী অভিসম্পাতের আক্রমণ হতে যদি কোনদিন নিজেদের রক্ষা করতে পারি তাহলেই আমাদের প্রত্যেক অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হবে দেশে-বিদেশে।”

ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও প্রশ্ন উঠল—সুভাষচন্দ্র বসুকে কেন বছরের পর বছর বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়েছে ?

সুভাষচন্দ্রের মুক্তির দাবি জোরদার হয়ে উঠতে থাকায় সরকার তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে কার্শিয়াং-এ শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর বাংলোয় গৃহবন্দী করে রাখলেন। কিছুদিন কার্শিয়াং বাস করবার পর কর্মহীন বন্দীজীবন সুভাষচন্দ্রের কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হল। সেখানে থাকাকালে ১৯৩৭ সালের মার্চে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল। সুভাষচন্দ্রের মুক্তির সংবাদে দেশবাসী আনন্দিত হল এবং শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক জনসভায় তাঁকে সংবর্ধনা জানাল।

সুভাষচন্দ্র তখনও ভাল করে সুস্থ হননি, চিকিৎসকের পরামর্শে বিশ্রামের জন্য তিনি ডালহৌসীতে গেলেন এবং অতিথি হলেন ডাঃ ধরমবীরের। বেশিদিন সুভাষচন্দ্রের সেখানে থাকা হল না। ডাঃ ধরমবীরের পরামর্শমত ১৯৩৭ সালের ১৮ই নভেম্বর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তিনি ইউরোপ যাত্রা করলেন।

ভারতবর্ষে ১৯৩৫ সালের নতুন শাসন সংস্কার আইন প্রবর্তিত হল। এই আইনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা ছিল, প্রদেশগুলির নির্বাচিত সরকারকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেওয়া

হয়েছিল এবং কেন্দ্রে ফেডারাল যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা ছিল। বড় লাটের হাতে দেওয়া হয়েছিল দেশ শাসনের সর্বময় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। হিন্দুদের মধ্যে বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত হিন্দুদের একটি তপশিল ভুক্ত করে দুটি পৃথক সম্প্রদায়ে ভাগ করা হয়েছিল। নতুন আইনে প্রথমতঃ ভারতবাসীকে মুসলমান ও অমুসলমান দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে ভারতীয় একজাতীয়তার আদর্শ বিনষ্ট করার ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছিল যা ছিল মুসলিম লীগের হিন্দু-মুসলমান দুইজাতি তত্ত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ; দ্বিতীয়তঃ অমুসলমানদের মধ্যে বর্ণ হিন্দু, তপশিলভুক্ত অনুন্নত হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতির জন্য পৃথক আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকায় আর এক দফা জাতি বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয়েছিল। তৃতীয়তঃ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকৃত ক্ষমতা ছিল বড় লাটের হাতে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় একজাতীয়তা ও রাষ্ট্রীয় সংহতির আদর্শের প্রতি ছিল চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

কংগ্রেস অনেক ভেবে চিন্তে কেন্দ্রে ফেডারাল যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যে বিধান ছিল সেটি বাদ দিয়ে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কার্যকর করতে সম্মত হল। সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা মেনে নেওয়ায় কার্যতঃ ভারতবর্ষ হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতিতে বিভক্ত হয়ে গেল। এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গড়তে সক্ষম হল কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভ কংগ্রেসের সংগ্রামী শক্তি বৃদ্ধির বদলে সংগঠনে আত্মতুষ্টির ভাব সঞ্চার করল।

ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার চার ভাগের তিন ভাগ হিন্দু মোটামুটিভাবে কংগ্রেসের সমর্থক ছিল। তাদের সঙ্গে ছিল জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ। সুতরাং কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন মেনে না নিলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে তা চালু করা সম্ভবপর ছিল না।

'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থখানির ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে ব্রিটিশ সরকার যে আদেশ দিয়েছিলেন জর্জ বার্নার্ডশ, এইচ. জি. ওয়েলস প্রমুখ বিখ্যাত লেখক তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন। বইখানি প্রকাশের পর ইংলণ্ডের কিছু প্রগতিশীল চিন্তাবিদ ও রাজনীতিক সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কিছুটা কৌতূহলী হলেন।

১৯৩৮ সালের বার্ষিক অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতি পদে সুভাষচন্দ্রের নাম প্রস্তাবিত হল। দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে প্রবাসী ভারতীয়গণ সুভাষচন্দ্রকে ইংলণ্ড ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানালেন। ব্রিটিশ সরকার এবার তাঁর ইংলণ্ড গমনে বাধা দিলেন না। ১৯৩৮ সালের ১০ই জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ইংলণ্ডে পৌঁছলে তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানান হল। সুভাষচন্দ্র শ্রী পি. বি. শীলের আতিথ্য গ্রহণ করে লণ্ডনের ডরচেস্টার হোটেলে উঠলেন।

অল্পক্ষণ পরেই বহু আলোচিত নির্যাতিত মুক্তি সংগ্রামীটিকে দেখবার এবং তাঁর কথা শুনবার জন্য আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা হোটেলে উপস্থিত হলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দীর্ঘকায় সৌম্যদর্শন দেশনেতা মর্যাদা-গভীর দক্ষতার সঙ্গে তাঁর বক্তব্য বলে গেলেন। সুভাষচন্দ্রের সংযত স্পষ্ট কথাগুলি শ্রোতাদের মুগ্ধ করল।

ভারতে প্রবর্তিত নতুন শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বললেন— প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা মেনে নিলেও কেন্দ্রে পরিকল্পিত ফেডারাল শাসনকে ভারতবর্ষ গ্রহণ করবে না।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বিপদ ও মানবাধিকার অবক্ষয় সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাওয়া হলে, তিনি বললেন— সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে যারা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করছে, আমাদের সর্বাঙ্গীণ সহানুভূতি তাদের জন্য, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে।

চীনের বিরুদ্ধে জাপানের আগ্রাসন এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বললেন—কংগ্রেস জাপানের নিন্দা করেছে এবং চীন ও গণতন্ত্রী স্পেনের প্রতি বর্তমান অবস্থায় সহানুভূতি জ্ঞাপন ছাড়া ভারতবর্ষ যতটুকু কার্যকর সাহায্য দিতে পারে তাহা দিতে সর্বদা প্রস্তুত আছে। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয়গণ স্পেনের জন্য যা করেছে তিনি তার সপ্রশংস উল্লেখ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনের নেতা ছিলেন লর্ড কিনোউল। ভারতীয়, ব্রিটিশ, আমেরিকান ও ইউরোপের দেশগুলির সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

১১ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে প্যাংক্রাশ টাউন হলে ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয়দের পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্রকে বিপুল সংবর্ধনা জানান হল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করলেন ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা মিঃ আর. পাম দত্ত।

বিপুল সংবর্ধনায় অভিভূত সুভাষচন্দ্র উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন :

> এই যে এত ভালবাসা আপনারা আমাকে জানালেন, অবশ্যই তা জনজীবনে আমার ভূমিকার জন্য। সত্যই আমার সে জীবন ঝঞ্ঝাময়, কিন্তু তার মধ্যে রোমান্সও আছে। আমার চেয়ে অল্পবয়সী যারা এখানে উপস্থিত, তাদের আমি আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি—বিদেশী শাসনের অন্ধকার দিক আছে ঠিকই, কিন্তু যে সব তরুণ-তরুণী দুঃসাহসের জীবন চায় তারা অ্যাডভেঞ্চারের রোমান্স এই শাসনে যথেষ্টই পাবে। আরও আশ্বাস দিতে পারি, শুধু রোমান্সই পাবে না, সেই সঙ্গে পাবে প্রচুর স্নেহ-ভালবাসা। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা যত পীড়ন করবে, তোমার দেশবাসী তত ভালবাসাই তোমাকে ফিরিয়ে দেবে।
>
> সকল দিক দেখে মনে হয়, ভারতকে স্বাধীনতা অর্জনের

জন্য আর একটা ভয়ঙ্কর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। কংগ্রেস তার জন্য প্রস্তুত।

কংগ্রেস নিশ্চয় প্রস্তুত। তবু—যদি পরবর্তী আন্দোলন ব্যর্থ হয়, ভারতের জনগণের ভিতর থেকে নবীন ও উত্তম নেতৃত্ব আসবে।

১২ই জানুয়ারী সকালে মিঃ এটলি, লর্ড স্নেইল এবং লর্ড কিনোউলের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর সুভাষচন্দ্র অপরাহ্লে ইণ্ডিয়া লীগ আয়োজিত ক্যাক্সটন হাউসের সভায় যোগ দিলেন। ভারতীয় সদস্যবৃন্দ ছাড়া এই সভায় মিঃ সোরেন সেন এম. পি., স্যার জন মেনার্ড, লর্ড ক্যারিংডন, মিঃ ব্রাডলি প্রমুখ ভারতের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ইংরাজ রাজনীতিক উপস্থিত ছিলেন। সভায় সুভাষচন্দ্র বললেন :

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে কোন ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলের সাহায্য পাওয়া যাবে, এমন চিন্তার দিন আর নেই। সংগ্রাম আমাদেরই—সে সংগ্রাম আমরাই করব। ব্রিটিশ শ্রমিকদলের কার্যকলাপ দেখে ভারতীয় জনগণের মোহভঙ্গ হয়েছে। ব্রিটেনে যাঁরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন না হলে ব্রিটেন কখনো সমাজতন্ত্রী দেশ হবে না।"

১৪ই জানুয়ারী লণ্ডনের কনওয়ে হলে ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে একটি সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হল। সভাপতি ছিলেন শ্রমিকদলের নেতা মিঃ জর্জ লন্‌সবেরী। এটি ছিল সুভাষচন্দ্রের অন্যতম বৃহৎ জনসভা। ইংলণ্ডের শ্রমিক ও উদার নৈতিক দলের বহু সদস্য সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সভায় এই সংবাদ ঘোষিত হতেই শ্রোতৃমণ্ডলী বিপুল হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন জানালেন মিঃ আর্থার গ্রীন উড এম. পি., লর্ড লিস্টোয়েল, মিঃ

বেসিল ম্যাথুস, প্রভৃতি। মিঃ লন্‌সবেরী তাঁর সভাপতির ভাষণে বললেন :

"যাঁরা মনে করেন মিঃ বসু ভারতীয় জনগণের আস্থাভাজন নন, কিংবা একজন ভয়ঙ্কর মানুষ, কংগ্রেসের সভাপতি পদে তাঁর এই নির্বাচন তাঁদের প্রতি যোগ্য উত্তর। আশা করা যায়, মিঃ বসুর সভাপতিত্ব কালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পথে দৃঢ়তর পদক্ষেপ করবে।"

সুভাষচন্দ্র সংবর্ধনার উত্তরে সভার উদ্যোক্তা ও শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন :

> শ্রমিক দল ভারতের মুক্তিসংগ্রামে কোন সত্যিকার সাহায্য করবে এমন আশা ভারতবাসী করে না। তবে সহানুভূতিশীল দল ও ব্যক্তির সহিত তিনি যোগাযোগ রক্ষায় বিশ্বাসী। ভারত বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতে পারে না।

ঐদিন লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্‌-এর পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপিত হল। সভাপতিত্ব করলেন প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক টনি। ছাত্রদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরাজ।

১৫ই জানুয়ারী রাত্রিতে ভারতীয় ছাত্র ইউনিয়ন, সিলোন ছাত্র পরিষদ, লণ্ডন মজলিস, গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান স্টুডেণ্টস সোসাইটি সমবেত ভাবে লণ্ডনের ১১২, গাওয়ার স্ট্রীটে সুভাষচন্দ্রকে সংবর্ধনা জানাল। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে বললেন :

"এদেশে তোমরা যারা রয়েছ, তোমাদের ভাবতে হবে দেশের মানুষকে কিভাবে মুক্তি দিতে পার। সর্ববিষয়ে মুক্তি দিতে হবে—রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে দিতে হবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তার অর্থ যদি হয় জমিদার, পুঁজিপতি, অভিজাত শ্রেণী বা তথা কথিত উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তার জন্য তৈরী থেকো।

ব্রিটেনের সোস্যালিস্ট লীগের নেতা মিঃ হোরাবিন সুভাষচন্দ্রের সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। ঐ সভায় ইংলণ্ডের

প্রগতিশীল লেখকদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় হল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্ট্রাচী, গোলানৎস, রিকওয়ার্ড, মরিস, ব্রাউন এবং মিসেস নাওমিচিশন।

সুভাষচন্দ্র একদিন বারট্রাণ্ড রাসেলের সহিত সাক্ষাৎ করলেন এবং একটি রাত দুজনে নানা আলোচনায় কাটালেন। হ্যারল্ড লাস্কি ও স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গেও তাঁর কথাবার্তা হল।

ব্রিটিশ শ্রমিক দলের সম্পাদক মিঃ মিডলটন সুভাষচন্দ্রের সম্মানে যে ভোজ সভার আয়োজন করলেন সেখানে মিঃ এটলি, মিঃ গ্রীন উড, মিঃ আর্নেস্ট বেভিন, মিসেস লরেন্স প্রমুখ শ্রমিকদলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সহিত সুভাষচন্দ্রের আলোচনা হল।

ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্য লর্ড হ্যালিফ্যাকস ও লর্ড জেটল্যাণ্ডের সহিতও সুভাষচন্দ্রের নিভৃতে কিছু কথাবার্তা হয়েছিল বলে জানা যায়।

ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকা সুভাষচন্দ্রের লণ্ডন ভ্রমণের বিশদ বিবরণ প্রকাশ করে লিখল :

"এই সর্ব প্রথম ইংরাজ সুভাষ বোসকে দেখতে পেল। ওর মধুর ব্যবহার, সংযত আচরণ ও ভারতীয় সমস্যা আলোচনার নিঃসংশয় ও নিশ্চিন্ত ধরনে আমরা মুগ্ধ।"

১৯শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র লণ্ডনের ক্রয়ডন বিমান বন্দর থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁকে বিদায় জানাতে সহস্রাধিক নরনারী বিমান বন্দরে উপস্থিত হয়েছিলেন। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসধ্বনি ও করতালির মধ্যে ভারত রাষ্ট্রনায়ক দেশে ফিরে চললেন।

২৪শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র করাচি বিমান বন্দরে অবতরণ করলেন। তাঁকে পুষ্প মাল্য শোভিত করা হল। তখন উৎফুল্ল মানুষের ভিড়ে বিমান বন্দর ভরে গেছে। জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস উচ্ছ্বসিত।

"চলো দুর্গম দূরপথ যাত্রী চলো দিবারাত্রি, করো জয় যাত্রা,
চলো বহি নির্ভয় বীর্যের বার্তা,
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়—সত্যের জয় বলো ভাই॥"

॥ ৬ ॥

গুজরাটের অন্তর্গত হরিপুরে কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশন বসল ১৯৩৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী। প্রায় দুইলক্ষ নরনারী অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে নির্বাচিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দরবার গোপাল দাস দেশাই সভাপতি, প্রতিনিধিবর্গ এবং দর্শক শ্রোতাদের অভিনন্দন জানিয়ে বললেন :

> আমরা এমন একজনের সভাপতিত্বের আশীর্বাদ পেয়েছি যাঁর স্বার্থত্যাগ, সেবা ও লাঞ্ছনা ভোগের ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন। আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে আমাদের সভাপতির সুনিপুণ নির্দেশে আমরা যেন লক্ষ্যের দিকে আরও এগিয়ে যেতে পারি এবং আমাদের ইতিহাসে আরও গৌরবজনক অধ্যায় সংযোজনা করতে পারি।

অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল, সর্দার প্যাটেল, খান আবদুল গফর খান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর সুলিখিত অভিভাষণে আন্তর্জাতিক পটভূমিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, অর্থনৈতিক শোষণমুক্তি, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, রাষ্ট্রভাষা, ইরান-চীন-আফগানিস্থান-নেপাল-বার্মা-সিংহল প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপন

ইত্যাদি বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে কংগ্রেসের সামনে একটি যুক্তিনির্ভর পথ-নির্দেশ রাখলেন।

কংগ্রেসের ভিতরে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলের উদ্ভবকে তিনি স্বাগত জানালেন। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি কেন্দ্র স্থাপনের পরামর্শ দিলেন। কংগ্রেস পরিচালিত প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলির কাজ আরো প্রগতিশীল করার কথা বললেন এবং সর্বশেষে সুভাষচন্দ্র ভারতের বিভিন্ন জেলে অবরুদ্ধ রাজবন্দীদের মুক্তির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেবার বিষয় উল্লেখ করলেন।

উপসংহারে মহাত্মা গান্ধীর নীরোগ দীর্ঘজীবন এবং তিনি যাতে দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারেন ঈশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা জানিয়ে সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণ শেষ করলেন।

কংগ্রেসের অধিবেশনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হল তার মধ্যে সব চেয়ে যেটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল :

"ভারতবর্ষ কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অংশ নেবে না। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে অর্থ বা লোকবলও নিয়োগ করবে না। ভারতে যে সমরায়োজন চলেছে, কংগ্রেস তাহা সমর্থন করবে না। ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়াবার চেষ্টা হলে কংগ্রেস তাহা প্রতিরোধ করবে।"

কংগ্রেস সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র এক বৎসরের মধ্যে যে কাজগুলি করেছিলেন তার মধ্যে ছিল একটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিশন গঠন, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত চীনের সাহায্যে ডাঃ কোটনিসের নেতৃত্বে একটি ভারতীয় চিকিৎসকদল প্রেরণ, আসাম প্রদেশে কংগ্রেস-প্রগতিশীল মুসলিম কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন এবং বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের মধ্যস্থতায় বিহারে বিহারী-বাঙ্গালী বিরোধের সন্তোষজনক মীমাংসা। তাছাড়া ছিল সভাপতির দেশময় সংগ্রামাত্মক প্রচার অভিযান।

১৯৩৯ সালের কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য তিনটি নাম প্রস্তাবিত হল—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু এবং ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া।

মহাত্মা গান্ধীর মনোভাব জেনে মৌলানা আজাদ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়ে ডাঃ সীতারামিয়ার অনুকূলে একটি বিবৃতি দিলেন :

> কংগ্রেস প্রতিনিধিদের কাছে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন ডাঃ সীতারামিয়াকে সমর্থন করেন। আমি এটাই আশা করব যে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছেন।

সুভাষচন্দ্র প্রার্থী পদ থেকে নাম প্রত্যাহার করলেন না। কেন তিনি দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি হতে সংকল্পবদ্ধ হলেন তার কারণ অজ্ঞাত। ক্ষমতার মোহে তিনি যে এ কাজ করেন নি সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই নেই। তবে মনে হয়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচার করে, সম্ভাব্য বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে, নিজের পরিকল্পনামত স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম পরিচালনার জন্য কংগ্রেসের কর্তৃত্ব তিনি নিজের হাতে রাখতে চেয়েছিলেন।

মৌলানা আজাদের পক্ষপাতিত্বমূলক বিবৃতির প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন :

> মিথ্যা আনুগত্যবোধকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে, কেননা সমস্যাটি ব্যক্তিগত নয়। অন্যান্য স্বাধীন দেশের ন্যায় ভারতেও সভাপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুস্পষ্ট সমস্যা এবং কর্মতালিকার ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। তবু যদি মৌলানা আজাদের মতো প্রতিষ্ঠাবান নেতার আবেদনের ফলে বেশির ভাগ প্রতিনিধি আমার পুনর্নির্বাচনের বিরুদ্ধে ভোট দেন, আমি তাঁদের নির্দেশ শিরোধার্য করে একজন সাধারণ সৈনিকের মতো দেশ ও কংগ্রেসের সেবা করব।

নির্বাচন উপলক্ষ্য করে কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। গান্ধীজী রইলেন অন্তরালে।

সর্দার প্যাটেল, আচার্য কৃপালনী প্রভৃতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্য ডাঃ সীতারামিয়ার অনুকূলে এক বিবৃতি প্রচার করলেন।

যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস নেতা মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই বললেন : "সর্দার প্যাটেল ও ওয়ার্কিং কমিটির কিছু সংখ্যক সদস্যের বিবৃতি পাঠ করে আমি বিস্মিত হয়েছি। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পক্ষে শ্রীবসুর বিরুদ্ধে এরূপ ক্ষতিকর বিবৃতি দেওয়া সঙ্গত হয় নি।"

আচার্য নরেন্দ্রদেব ও সর্দার শার্দূল সিং কবিশের বললেন : "কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের পক্ষে এ ধরনের বিবৃতি দান শুধু অন্যায় নয়, অপরাধ। প্রতিনিধিদের উচিত সুভাষ বসুকে জয়যুক্ত করা।"

ডাঃ খারে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বিবৃতি দিলেন, "কংগ্রেস কর্তৃক সর্বত্র প্রভুত্ব বিস্তার হওয়া সত্ত্বেও যে ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া নিজের মিউনিসিপালিটি ও জেলা বোর্ড দখল করতে পারেন নি, সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত তাঁর তুলনাই হয় না। যে ডাঃ সীতারামিয়া নিজের শহরে জাস্টিস পার্টির সম্মুখীন হতে পারেন না, তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখীন হতে সক্ষম হবেন, একথা কি করে আশা করা যায় ? যদি সত্যই আপনারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করতে চান, তবে শ্রীবসুকেই ভোট দিন। তাঁকে ভোট দেবার অর্থ গণতন্ত্র আর স্বরাজকে ভোট দেওয়া।"

সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে সংবাদপত্রে আবেদন জানালেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, নবাবজাদা হাসান আলি চৌধুরী, চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন, জনাব আবু হোসেন সরকার প্রমুখ জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বললেন ঃ "সুভাষই যোগ্য ব্যক্তি। তাঁকেই নির্বাচিত করা হোক।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে লিখলেন : "সুভাষের দ্বিতীয় বার সভাপতি হওয়া খুবই দরকার।"

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের দুই নেতা শ্রী এম. আর. মাসানী ও শ্রীমেহের আলি এক যুক্ত বিবৃতিতে বললেন, "এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, রাজনৈতিক। এর মধ্যে প্রাদেশিকতার স্থান নেই। তাই আমরা শ্রীবসুকেই সমর্থন করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

দক্ষিণ পন্থীদের নির্বাচন কৌশল ছিল কিছুটা ভিন্ন ধরনের। তাঁরা তাঁদের প্রার্থীর অনুকূলে প্রকাশ্যে যতটা প্রচার চালালেন, তার চেয়ে বেশী চেষ্টিত হলেন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, মন্ত্রী প্রভৃতির দ্বারা প্রতিনিধিদের প্রভাবিত করতে এবং সেই সঙ্গে ডাঃ সীতারামিয়া যে মহাত্মা গান্ধীর একান্ত আস্থাভাজন প্রার্থী সে কথাটা শোনাতেও ভুললেন না। দৃশ্যতঃ না হলেও, প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রকৃতিটি যে গান্ধী পন্থী বনাম গান্ধী-বিকল্প পন্থী ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৩০শে জানুয়ারী ভোটের ফল ঘোষিত হল। সুভাষচন্দ্র ১৫৮০-১৩৭৭ ভোটে ডাঃ সীতারামিয়াকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

নেপথ্য থেকে গান্ধীজী এবার মঞ্চে আবির্ভূত হলেন। তিনি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন :

"পট্টভি সীতারামিয়ার পরাজয় আমারই পরাজয়। নির্বাচন দ্বন্দ্ব থেকে মৌলানা সাহেব তাঁর নাম প্রত্যাহার করার পর আমার চেষ্টাতেই ডাঃ সীতারামিয়া নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান নি—অতএব এ পরাজয় তাঁর চেয়ে আমারই অধিক। যাই হোক সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন। প্রথম থেকেই আমি তাঁর পুনর্নির্বাচনের বিরোধী ছিলাম। তাহলেও আমি তাঁর বিজয়ে আনন্দিত।"

গান্ধীজীর বিবৃতি দেশবাসীকে বিস্মিত করল। সুভাষচন্দ্র তখন মালদহ জেলা রাজনৈতিক কর্মীসম্মেলনের সভাপতিত্ব করছিলেন। কলিকাতায় ফিরে এসে তিনি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিলেন :

> এবারকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখে আমাদের স্বাধীনতার শত্রুরা যদি মনে করে যে, কংগ্রেসের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিয়েছে তাহলে আমি স্পষ্ট করেই বলব যে, আমাদের ঐক্য বরাবরের মতোই অটুট থাকবে। কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যে মতান্তর থাকা অসম্ভব নয়। তা বলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যখন তারা সংগ্রাম করে, তখন তারা হয়ে উঠে এক এবং অভিন্ন।
>
> মহাত্মার সহিত কোন কোন ব্যাপারে কিঞ্চিৎ মতভেদ ঘটে থাকলেও মহাত্মার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমি কারো চাইতে কম শ্রদ্ধাবান নই। আমার সম্পর্কে মহাত্মা কি অভিমত পোষণ করেন জানিনে। তবে যাই হোক না কেন, তাঁর বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হবার জন্য আমি সব সময়ই যত্নবান থাকব। কেননা, সবার বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হতে পারলেও যদি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের আস্থাভাজন হতে না পারি, তাহলে সত্যিই তা আমার পক্ষে মর্মন্তুদ হবে।

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্র সেবাগ্রামে গিয়ে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করলেন। উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হল। গান্ধীজীর মনোভাবের কিন্তু পরিবর্তন ঘটল না। তিনি সুভাষচন্দ্রকে তাঁর পছন্দমত ব্যক্তিদের নিয়ে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে বললেন।

কয়েকদিন পরে মহাত্মা এক বিবৃতিতে তাঁর অভিমত আরো স্পষ্ট করে জানালেন: "যেখানে মতের বিভেদ সেখানে একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয়। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, গোড়া থেকেই আমি তাঁর পুনর্নির্বাচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম। এর কারণ আজ আমি বলতে চাইনে।"

কি সেই 'কারণ' ছিল কেউই জানে না। গান্ধীজীও কোনদিন তা খুলে বললেন না। ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া এ সম্পর্কে তাঁর

'কংগ্রেসের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন—"সুভাষের দ্বিতীয়বার সভাপতি হবার প্রশ্নকে গান্ধীজী এতখানি দোষের মনে করলেন কেন ? নির্বাচনের পরেও গান্ধীজীর মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে নি, তা খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করা হয়েছিল। * * * সুভাষ সম্বন্ধে গান্ধীজীর আচরণের আর কোন কথা ছিল কিনা, তাহা বলতে পারেন একমাত্র গান্ধীজীই।"

এই বিরোধ কি কেবল অহিংস পন্থার প্রশ্নে নিহিত ছিল ? সব দিক বিচার করে দেখলে কিন্তু তা মনে করা চলে না। তখন পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের অহিংস-পন্থায় অবিচলিত নিষ্ঠা রেখে কাজ করে এসেছেন। ভবিষ্যতে ভিন্ন পন্থা গ্রহণের কথাও তিনি প্রকাশ করেন নি। তাছাড়া, কংগ্রেস কর্তৃক অহিংস পন্থা গ্রহণ সম্পর্কে গান্ধীজী একবার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে তাঁর অভিমত স্পষ্ট করেই বলেছিলেন। সে অভিমত হল—"অহিংসা আমার নিকট ধর্ম, আমার প্রাণের তুল্য। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে কখনো কখনো বলা ছাড়া, আমি ভারতবর্ষকে ধর্ম হিসাবে অহিংস মন্ত্র গ্রহণ করতে বলিনি। একটি রাজনৈতিক কর্মপন্থারূপে অহিংসাকে আমি কংগ্রেসের সামনে রেখেছি, এই পন্থাকে পরিবর্তন, সংশোধন এমন কি অধিকতর উপযুক্ত পন্থা পেলে পরিত্যাগ করাও যেতে পারে।"

সেবাগ্রাম থেকে ফিরে এসে সুভাষচন্দ্র প্রবল জ্বরে শয্যাশায়ী হলেন। অন্যদিকে ২১শে ফেব্রুয়ারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বার জন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সর্দার প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, ডাঃ সীতারামিয়া, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, খান আবদুল গফ্ফর খান, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, এবং কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য কৃপালনী। প্রতিষ্ঠিত জাতীয় নেতৃবৃন্দের আচরণে বোঝা গেল গান্ধীজীর সহিত তাঁরাও নবনির্বাচিত সভাপতির সহিত অসহযোগ করতে কৃতসংকল্প।

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশনে

গুরুতর অসুস্থ সভাপতি সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে গান্ধীসমর্থক নেতারা সক্রিয় হলেন। মহাত্মা অধিবেশনে এলেন না। এই সময় তিনি দেশীয় রাজ্য রাজকোটের একটি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমরণ অনশন শুরু করলেন।

প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন সুভাষচন্দ্র অধিবেশন মঞ্চে উপস্থিত থাকলেও তিনি স্বয়ং তাঁর অভিভাষণ পাঠ করতে পারলেন না। সুভাষচন্দ্রের হয়ে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু সভাপতির অভিভাষণটি পাঠ করলেন। সভাপতি সুভাষচন্দ্র তাঁর অভিভাষণে বলেছিলেন—ছয় মাসের মধ্যে একটি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে চলেছে, কংগ্রেসের উচিত এখনই ব্রিটিশ সরকারকে একটি চরম পত্র দেওয়া। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবি মেনে না নিলে একটি বিকল্প সরকার গঠন করতে হবে এবং এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ব্রিটিশ শক্তির সহিত দেশে যে চূড়ান্ত সংগ্রাম ঘটবে, তার জন্য একলক্ষ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

সভাপতির প্রস্তাব বিবেচনা করার মতো মানসিকতা অধিবেশনে ছিল না। সেখানে শুধু একটি বিষয়ই নেতৃবৃন্দের মন অধিকার করে বসেছিল তা হল কিভাবে গান্ধী-নেতৃত্ব পুনরায় কংগ্রেসে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। তার জন্য দুর্নীতি, অনাচার, অপপ্রচার, প্রাদেশিকতা বিদ্বেষ প্রচার সব কৌশলই অবলম্বিত হল। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ বল্লভ পন্থ গান্ধীজীর প্রতি কংগ্রেসের আস্থাজ্ঞাপন প্রস্তাবে বললেন—কংগ্রেস এপর্যন্ত গান্ধীজীর নির্দেশক্রমে পরিচালিত হয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও তার ব্যতিক্রম হবে না। সুতরাং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের উপর গান্ধীজীর আস্থা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেজন্য সভাপতি যেন গান্ধীজীর অনুমোদনক্রমে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন করেন। প্রস্তাব প্রতিনিধিদের অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হল।

পন্থ-প্রস্তাব কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র বিরোধী এবং নির্বাচিত

সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের ন্যায় ছিল। সভাপতি নির্বাচনে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিষ্টগণ সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করলেও পন্থ-প্রস্তাব বিবেচনা কালে তাঁদের পূর্ব প্রদত্ত সমর্থন প্রত্যাহারের ফলেই পন্থ-প্রস্তাব গৃহীত হতে পেরেছিল। আপাত দৃষ্টিতে পন্থ-প্রস্তাব তেমন ক্ষতিকর ছিল না, কারণ কংগ্রেসে গান্ধীজীর সার্বভৌমত্বকে কে আর সম্পূর্ণ অস্বীকার করত।

সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন, পন্থ প্রস্তাব অনুসারে গান্ধীজীর অনুমোদনক্রমেই তিনি নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করবেন। ত্রিপুরী থেকে ফেরার পথে অসুস্থ সুভাষচন্দ্রকে ধানবাদ স্টেশানে নামিয়ে জামডোবায় তাঁর অগ্রজ শ্রীসুধীর বসুর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় কিছুটা সুস্থ হবার পর ২১শে এপ্রিল তিনি কলিকাতায় ফিরে এলেন।

গান্ধীজীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোয়ন সম্ভব হল না। গান্ধীজী তাঁর পুরানো কথা আঁকড়ে ধরে রইলেন—'তুমি কংগ্রেসের সভাপতি, তুমি তোমার মনোমত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচন কর।'

অন্যদিকে ঝুলতে লাগল সামনে পন্থ-প্রস্তাবের নির্দেশ—'গান্ধীজীর অনুমোদনক্রমে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়ন করতে হবে।'

ত্রিপুরী নাটকের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ত্রিপুরী অধিবেশনের নানাবিধ অনাচারের সংবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মর্মাহত হলেন। তিনি ১৯৩৯-এর ১৯শে মার্চ শান্তি-নিকেতন থেকে গান্ধীজীকে লিখলেন—

> প্রিয় মহাত্মাজী, বিগত কংগ্রেস অধিবেশনে অশোভন জেদের বশবর্তী হয়ে কিছু রূঢ় প্রকৃতির মানুষ বাংলাকে গভীরভাবে আঘাত দিয়েছে। আপনার করুণাভরা দুটি

হাতের স্পর্শে সত্বর এই ক্ষতের উপশম করুন এবং ক্ষত যাতে মারাত্মক না হয়ে উঠে তার প্রতিবিধান করুন।

রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তরে নয়াদিল্লী থেকে ২রা এপ্রিল মহাত্মা জানালেন—প্রিয় গুরুদেব, আপনার স্নেহপূর্ণ পত্র পেয়েছি। আমার নিকট যে সমস্যার কথা লিখেছেন তার সমাধান কঠিন। আমি সুভাষকে এ বিষয়ে যা কিছু বলবার বলেছি। অচলাবস্থা দূর করবার অন্য পথ দেখছি না।

তারপর, সংকটের সমাধান কল্পে কবিগুরু গান্ধীজীকে একটি তারবার্তাও পাঠালেন—

I earnestly appeal to you to arrange meeting immediately with Subhas and save situation from tragic disaster.

ফল কিছু হল না। গান্ধীজী সংকট সমাধানে একপদও অগ্রসর হলেন না। কংগ্রেসের প্রভাবশালী কোন নেতাও এ ব্যাপারে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করলেন না।

অচল অবস্থার প্রতিকারকল্পে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালের ২৮শে এপ্রিল কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা আহ্বান করলেন। ২৭শে এপ্রিল সোদপুর আশ্রমে অবস্থানরত গান্ধীজীর সহিত সুভাষচন্দ্র আর একদফা আলোচনা করলেন। আলোচনা ব্যর্থ হল। সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদ পরিত্যাগ করলেন। নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ।

রবীন্দ্রনাথ তখন পুরীতে। তিনি সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখলেন :

অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও তুমি যে ধৈর্য ও মর্যাদার পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে তোমার নেতৃত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উদ্রেক হইয়াছে। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বাংলাকে এখনও সম্পূর্ণরূপে ধীরতা ও ভদ্রতা-

বোধ অব্যাহত রাখিতে হইবে ; তাহা হইলেই আপাত-দৃষ্টিতে যাহা তোমার পরাজয় বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাই চিরন্তন জয়ে পরিণত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ সক্রিয় রাজনীতির সহিত কোনদিন নিজেকে যুক্ত করেন নি। কিন্তু যখনই জাতির আত্মসম্মান ও প্রাণশক্তির উপর আঘাত এসেছে এবং ন্যায়ের মর্যাদা লঙ্ঘিত হয়েছে, তখনই তিনি তাঁর নিভৃত তপোবন থেকে বেরিয়ে এসে দৃঢ়কণ্ঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সেই কারণেই তিনি সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন এবং সুভাষচন্দ্রের পরাজয়ের দুঃখের অংশভাগী হয়েছিলেন।

১৯৩৯ সালের ৩রা মে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সংগ্রামী চেতনা জাগিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী উপদল আগেও ছিল সুতরাং 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠনে কোন সাংগঠনিক অসুবিধা দেখা দিল না। 'ফরোয়ার্ড ব্লকে'র লক্ষ্য সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বললেন :

> The Forward Bloc came into existence to fulfil a historical necessity. It was desirable that the internal crisis in the Congress should come and should be transcended before the international crisis overtook us.
>
> [ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই ফরোয়ার্ড ব্লক গঠিত হয়েছে। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংকট সঙ্গত কারণেই ঘটেছে এবং আন্তর্জাতিক সংকট আমাদের উপর এসে পড়বার পূর্বে 'ফরোয়ার্ড ব্লক'কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।]

সুভাষচন্দ্র তখনও বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, সুতরাং বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের অধিকাংশ ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য হলেন। বিপ্লবী দলগুলিও ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দিল। সুভাষচন্দ্রের বিশ্বস্ত সহকর্মী শ্রীহেমন্তকুমার বসু ফরোয়ার্ড ব্লকের সাধারণ সম্পাদক

মনোনীত হলেন। বাংলায় ফরোয়ার্ড ব্লক অল্পদিনের মধ্যে শক্তিশালী হয়ে উঠল।

বাংলার বাইরেও বহু কংগ্রেস নেতা ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগদান করলেন। এদের মধ্যে এইচ. ভি. কামাথ, সর্দার শার্দুল সিং কবিশের, আর. এস. রুইকর প্রমুখ খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশে ফরোয়ার্ড ব্লকের শাখা স্থাপিত হল এবং তাদের কাজ জেলাগুলিতে ছড়িয়ে গেল।

জুনের প্রথম ভাগে ফরোয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিষ্ট পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, র‍্যাডিকেল ডেমোক্রাটিক পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং ভারত কিষাণ সভা একত্রে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে একটি বামপন্থী সমন্বয় কমিটি গঠন করল। বোম্বাই-এ নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক সম্মেলনে সমন্বয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত দলগুলির নেতৃবৃন্দ অংশ নিলেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন সম্পর্কে সকলে একমত হলেন। ঘনায়মান যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে মুক্তি সংগ্রাম যাতে জোরদার করা যায় তার উপযুক্ত প্রস্তুতির জন্য প্রস্তাব গৃহীত হল।

৪ঠা জুন গান্ধীজী ঘোষণা করলেন—অনির্দিষ্ট কালের জন্য কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ সংগ্রাম বন্ধ রাখা হল। এখন কোন প্রকার আন্দোলন করা উচিত হবে না।

কয়েকদিন পরে বোম্বাই-এ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হল যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমোদন ছাড়া কোন কংগ্রেস কর্মী সত্যাগ্রহ আন্দোলন করতে পারবে না।

এই নির্দেশের বিরুদ্ধে বামপন্থী সমন্বয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত কংগ্রেস কর্মিগণ ৯ই জুলাই সারাদেশে প্রতিবাদ দিবস পালনের আহ্বান জানালেন। কংগ্রেস সভাপতির সতর্কীকরণ সত্ত্বেও দেশময় প্রতিবাদ সভা, মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হল।

১৪ই আগস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে সুভাষচন্দ্রকে বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে বরখাস্ত এবং তিন বৎসরের জন্য তাঁকে নির্বাচিত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হওয়া নিষিদ্ধ করে আদেশ জারী করলেন।

সুভাষচন্দ্রের সামনে কংগ্রেসের দরজা বন্ধ হল বটে কিন্তু দেশের হৃদয় দুয়ার আরো বেশি করে খুলে গেল। কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করার পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যে একটি প্রশস্তি পত্র লেখেন। পত্রখানি অমূল্য জাতীয় সম্পদ। পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হল।

> সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি, বাংলা-দেশের হয়ে তোমাকে দেশ নায়কের পদে বরণ করি। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজ শাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলা দেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে, কর্মনীতিতে, শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে দাঁড়ে তালের মিল নেই। এই রকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।
>
> সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর হতে দেখেছি। সেই আলো আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা—তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা

আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতেই তোমাকে অভিভূত করে নি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোন পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানো নি। তোমার এই চরিত্র-শক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।

বাঙালি অদৃষ্ট-কর্তৃক অপমানিত হয়ে মরবে না এই আশাকে দেশে তুমি জাগিয়ে তোলো; সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙালি মারের উপর মাথা তুলবে। তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সংকটের প্রতিমুখে আশাকে অবিচলিত রাখার দুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে। সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় আশার পতাকা বাংলার জীবন-ক্ষেত্রে তুমি বহন করে আনবে সেই কামনায় আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে—অসন্দিগ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালি আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্য আসন প্রস্তুত। বাঙালির পরস্পর বিরোধের সমাধান হোক তোমার মধ্যে, আত্মসংশয়ের নিরসন হোক তোমার মধ্যে, হীনতা লজ্জা ও দীনতা ধিক্কৃত হোক তোমার আদর্শে—জয়ে পরাজয়ে আপন সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখার দ্বারা তোমার মর্যাদা সে রক্ষা করুক।

বাঙালির সম্মিলিত ইচ্ছা বরণ করুক তোমাকে নেতৃত্ব

পদে, সেই ইচ্ছা তোমাকে সৃষ্টি করে তুলুক তোমার মহৎ দায়িত্বে। সেই ইচ্ছাতে তোমার ব্যক্তিস্বরূপকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হোক সমগ্র দেশের আত্মস্বরূপ।

আমি আজ তোমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি।

মে, ১৯৩৯।

অক্রোধ উদ্‌বেগহীন সুভাষচন্দ্র তাঁর কাজ করে চললেন, কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাইরে ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মীরা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলেন, আসাম থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত দলের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হল।

১৯৩৯ সালের আগস্টে সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পিত মহাজাতি সদনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার এ ছিল প্রথম পদক্ষেপ। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে কবিকে বরণ করে সুভাষচন্দ্র তাঁর উদ্‌বোধনী ভাষণে বললেন :

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা এবং সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করে আসছেন, তাঁরা অনেকদিন থেকে একটা অভাব বোধ করে আসছেন, সে অভাব একটা গৃহের, যেখানে তাঁদের যাবতীয় সেবাকার্য আশ্রয় পেতে পারে এবং যেটা তাঁদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও আদর্শের একটা বাহ্য প্রতীক হতে পারে। ইতিপূর্বে আমাদের জাতীয় নিকেতন নির্মাণের চেষ্টা একাধিকবার করা হয়েছে, কিন্তু কৃতকার্য হয়নি। পরিশেষে আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা 'মহাজাতি সদনের' ভিত্তি স্থাপনা আজ করা হবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা আজ আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি এবং আপনার দ্বারা সেই বীজ আজ বপন করতে পারছি, যার ফলের দ্বারা আমরা একদিন ভবিষ্যৎ

ভারতের জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট ও সুসমৃদ্ধ করে তুলতে পারবো।

যে সমস্ত কল্যাণ-প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তির ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হবে—এই গৃহ তারই জীবনকেন্দ্র হয়ে 'মহাজাতি সদন' নাম সার্থক করে তুলুক—এই আশীর্বাদ আপনি করুন। এই আশীর্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রামপথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি।

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের পর রবীন্দ্রনাথ বললেন: এখান থেকে এই প্রার্থনামন্ত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হতে থাক্—

বাঙালির পণ বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

॥ ৭ ॥

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী ডানজিগ বন্দর পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় হলে জার্মানীর বন্দর-নগরী ডানজিগ পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পোল্যাণ্ড আপোসে ডানজিগ বন্দর জার্মানীকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় যুদ্ধ বাধল। পোল্যাণ্ডের সহিত ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা চুক্তি ছিল, সেই চুক্তির শর্তানুসারে ২রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স একযোগে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। অপর পক্ষে জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। সে কারণে জার্মান-রুশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন অবনতি ঘটল না।

দু একদিনের মধ্যে ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানীও যথারীতি যুদ্ধ ঘোষণা করল। জার্মানী তার যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে ব্রিটেনের অধীনতা পাশ থেকে ভারতবর্ষের মুক্তির কথাও যুক্ত করল। সুভাষচন্দ্র ছয়মাস পূর্বে যুদ্ধ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন তা আশ্চর্যজনক ভাবে মিলে গেল।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলির মতামত জিজ্ঞাসা না করে বড়লাট এক বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারী করে ভারতকে ব্রিটিশ পক্ষে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করলেন। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারত কোন অংশ নেবে না এমন একটি প্রস্তাব এক বৎসর পূর্বে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল, তাই কংগ্রেস বড়লাটের নিকট যুদ্ধের উদ্দেশ্য

জানতে চাইল। উত্তরে বড়লাট যা বললেন কংগ্রেসের নিকট তা সন্তোষজনক বিবেচিত হল না। বড়লাটের কার্যের প্রতিবাদে ভারতবর্ষের যে আটটি প্রদেশে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন ছিল, সেখানকার মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করল।

১৫ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্দায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক হল তাতে বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে সুভাষচন্দ্র যোগ দিলেন। বর্তমান যুদ্ধ ও জাতীয় কর্তব্য সম্বন্ধে বৈঠকে বিশদ আলোচনা হল। এ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের অভিমত চাওয়া হলে তিনি বললেন—যুদ্ধে ব্রিটেনের জয় ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূল হতে পারে না, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনই ভারতের স্বাধীনতা লাভের সহায়ক। এ সময় একটি সর্বাত্মক মুক্তি সংগ্রাম শুরু করা উচিত। সুভাষচন্দ্রের পরামর্শ বৈঠকের নিকট গ্রহণযোগ্য হল না। পক্ষান্তরে, যুদ্ধরত ব্রিটেনকে বিব্রত না করে তার প্রতি সহযোগিতা প্রদর্শনের অভিমত জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল। উক্ত প্রস্তাবে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করে কিছু প্রতিশ্রুতি আদায়ের কথাও বলা হল।

ব্রিটেন ও ফরাসী পোল্যাণ্ডের সাহায্যে অগ্রসর হবার পূর্বেই পোল্যাণ্ডের পতন ঘটল।

১৯৩৯-এর অক্টোবরে সুভাষচন্দ্র নাগপুরে সারা ভারত সাম্রাজ্য বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করলেন। সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিশেষ ভূমিকা নিলেন শ্রী এইচ. ভি. কামাথ। সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ও অপর মুক্তিসংগ্রামীদের ঐতিহাসিক কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানবার আহ্বান জানালেন।

১৯৪০ সালের ২০শে মার্চ রামগড়ে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। পূর্ব ঘোষিত নীতি অনুসারে অধিবেশনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ সরকারের সহিত সম্মানজনক মীমাংসার উদ্দেশ্যে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তই বহাল রইল।

একই সময়ে রামগড়ে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হল আপোস বিরোধী সম্মেলন। সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন বিহার প্রদেশ ফরোয়ার্ড ব্লক নেতৃবৃন্দ। বিহারের কৃষক আন্দোলনের নেতা স্বামী সহজানন্দের নেতৃত্বে লক্ষাধিক কৃষক এবং ক্ষেতমজুর সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। আপোস বিরোধী সম্মেলন প্রকৃত জাতীয় কংগ্রেসের রূপ গ্রহণ করেছিল। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ থেকে ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন এবং তাঁদের সম্মেলনে যোগদানের ফলে অধিবেশনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

'কংগ্রেসের ইতিহাস' গ্রন্থে ডাঃ সীতারামিয়া আপোস বিরোধী সম্মেলন সম্বন্ধে লিখেছেন, "সম্মেলনে বিরাট জনসমাগম হয়েছিল। সভাপতি (সুভাষ) তাঁর ভাষণদানকালে এক সময় বললেন, 'আসন্ন সংগ্রামে কে কে অংশ নিতে চান হাত তুলুন।' বিরাট জনতা সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে জানাল—তারা সবাই সংগ্রামে অংশ নিতে ইচ্ছুক।"

১৯৪০ সালের ৯ই এপ্রিল ডেনমার্ক প্রায় বিনা যুদ্ধেই জার্মান সৈন্য বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করল। জার্মানীর পরবর্তী লক্ষ্য হল নরওয়ে। ব্রিটিশ রণপোত বহর নরওয়ের সাহায্যে এগিয়ে গেল কিন্তু জার্মানীর বিমান আক্রমণের মুখে দাঁড়াতে পারল না। ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ 'হার্ডি' ও 'হান্টার' ঘায়েল হতেই, ইংলণ্ডের রণপোতগুলি যুদ্ধস্থল ত্যাগ করল। নরওয়ের রাজা হাকন অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে মন্ত্রিবর্গের সহিত ইংলণ্ডে পালিয়ে গেলেন। জার্মান সৈন্য বাহিনীর অগ্রগতি রোধ অসম্ভব বুঝে, নিশ্চিত ধ্বংস থেকে দেশকে রক্ষার উদ্দেশ্যে, নরওয়ে সৈন্যবাহিনীর প্রধান মেজর হেডকুন কুইসলিং জার্মানীর প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়ে, দেশের আভ্যন্তরীণ স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা করলেন। ব্রিটিশ স্বার্থে আমরণ যুদ্ধ না চালিয়ে জার্মানীর তাঁবেদারী মেনে নেওয়ায়, ব্রিটেন ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টিতে মেজর কুইসলিং হলেন বিশ্বাসঘাতক, আর বিপন্ন নরওয়েবাসীরা তাঁকে দেখল সংকট কালীন নেতারূপে।

১৯৪০ সালের জুনে নাগপুরে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের সম্মেলন হল। বামপন্থী সমন্বয় কমিটি থেকে এম. এন. রায় পরিচালিত র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল ও কমিউনিস্টগণ সরে পড়ায়, ফরোয়ার্ড ব্লক একক একটি দল হিসাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিল।

সম্মেলনে ইউরোপে দ্রুত যুদ্ধ বিস্তৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে অবিলম্বে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার এবং সেই সরকারের অধীনে একটি প্রতিরক্ষা ব্রিগেড গঠনের দাবি জানান হল। 'ফরোয়ার্ড ব্লক' ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিল, সেই সংগ্রামের ধ্বনি হল 'অল পাওয়ার টু ইণ্ডিয়ান পিপল'।

অপর একটি প্রস্তাবে বলা হল, ফরোয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসের ভিতরে থেকে কাজ করবে, তার লক্ষ্য হল জনগণ কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার এবং সমাজতান্ত্রিক পন্থায় দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন।

অল্প দিনের মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লকের কয়েক সহস্র কর্মী কারারুদ্ধ হলেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের উপর পুলিস কড়া নজর রাখল।

১৯৪০ সালের ১০ই মে জার্মানী একসঙ্গে বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও লাক্সেমবার্গ আক্রমণ করল এবং বিদ্যুৎগতিতে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের ভিতর দিয়ে ফ্রান্সে প্রবেশ করল। আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের সীমান্তে ব্রিটিশ ও ফরাসী সমরায়োজনের উপর আঘাত হানা। ফ্লাণ্ডার্সে অভিযাত্রী জার্মান সেনাবাহিনীর সহিত দু একটি ছোট খাটো যুদ্ধের পর ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে, কোন গতিকে ডানকার্ক ত্যাগ করে, ইংলণ্ডে ফিরে গেল। অবস্থা বুঝে, বৃথা সৈন্যক্ষয় এড়াবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের সৈন্যাধ্যক্ষ মার্শাল পেঁতা ফ্রান্সের উপর জার্মানীর সমরকালীন কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে, ১৯৪০ এর ২২শে মে জার্মানীর সহিত যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদন করলেন। ইংলণ্ডের সংকট গভীর হল।

কংগ্রেসের নীতির কিন্তু কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

মহাত্মা গান্ধী ১৯৪০ সালের ২০শে জানুয়ারী 'হরিজন' পত্রিকায় লিখলেন :

> I am not spoiling for a fight, I am trying to avoid it. Whatever may be true of the members of the working Committee, I wholly endorse Mr. Subhas Chandra Bose's charge that I am eager to have a compromise with Britain if it can be had with honour.

১৯৪০ এর ২৫শে মে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনে কলিকাতার হলওয়েল মনুমেন্ট অপসরণের প্রস্তাব গৃহীত হল। সরকার অবিলম্বে প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অচিরে আন্দোলন যে আরম্ভ হবে সে কথাও প্রস্তাবে বলা হল।

জুন মাসে সুভাষচন্দ্র ওয়ার্দায় গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করলেন। উভয় নেতার মধ্যে এই ছিল শেষ সাক্ষাৎকার। তাঁদের মধ্যে কি বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল তা অপ্রকাশিত রয়ে গেছে।

ওয়ার্দা থেকে ফিরে এসে ২৯শে জুন কলিকাতার এলবার্ট হলে এক জন সমাবেশে সুভাষচন্দ্র বললেন :

"হলওয়েল মনুমেন্ট জাতীয় পরাধীনতার অন্যতম চিহ্নস্বরূপ। বহু বৎসর যাবৎ এই অলীক কলঙ্ক-চিহ্ন বাংলার বুকে দাঁড়াইয়া আছে। * * * ৩রা জুলাই সিরাজদৌল্লার স্মৃতি দিবসের মধ্যে হলওয়েল মনুমেন্টটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া লইবার দাবি বাংলা সরকারের নিকট করা হইয়াছে। আমরা চাই জাতির মিথ্যা কলঙ্কস্বরূপ এই মনুমেন্টটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া লওয়া হউক।"

৩রা জুলাই থেকে মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন শুরু করা স্থির করে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হল।

সরকারের নিকট থেকে কংগ্রেসের প্রস্তাবমত প্রতিশ্রুতি ত দূরের কথা, কোনরূপ আলাপ-আলোচনার অভিপ্রায়ও প্রকাশ পেল না। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিসভার পদত্যাগে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও দেখা গেল না। ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যরক্ষায় নানা রণাঙ্গনে নিযুক্ত রইল এবং ভারতের অর্থ, খাদ্যসামগ্রী, শিল্প পণ্য ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম অবাধে ইংলণ্ডের সাহায্যে ভারত থেকে চালান হতে থাকল।

ব্রিটেনের সহিত সহযোগিতার কথা পুনরুল্লেখ করে মহাত্মা বললেন :

> মানবিক দিক থেকে এ যুদ্ধে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দিকে। আমি বড়লাট লর্ড লিনলিথগোকে বলেছি, ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট ভবন কিংবা ওয়েস্ট মিনিস্টার 'এ্যাবে' ধ্বংস হয়ে যাবে এ দৃশ্য আমার পক্ষে সহ্য করা সত্যিই অসম্ভব। সে কারণেই ঠিক এই মুহূর্তেই আমি ভারতের স্বাধীনতার কথা ভাবছি না। ইংলণ্ড বা ফ্রান্স যদি তাদের স্বাধীনতা হারায় তাহলে কি হবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে ?

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বললেন—ব্রিটেন এখন মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। এখন যদি আমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করি তাহলে সমগ্র বিশ্ববাসী আমাদের নিন্দা করবে।

ভিন্ন অভিমত দিলেন কেবল সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র বললেন : "ইংলণ্ডের বিপদ মানেই ভারতের সুযোগ। আমরা এ সুযোগকে অবহেলা করতে পারি না। সেটা হবে আত্মহত্যার নামান্তর।"

সুভাষচন্দ্রের অভিমত চিরাচরিত রাষ্ট্রনীতিসম্মত এবং তার যৌক্তিকতা অভ্রান্ত বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করলেও, দেশবাসী কংগ্রেসের নির্দেশের প্রতীক্ষায় রইল। তাছাড়া, ফরোয়ার্ড ব্লক

কংগ্রেসী পন্থায় সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে কারাবরণ ব্যতীত নতুন কোন সংগ্রামী কৌশলও দেশ সেবকদের সামনে রাখতে পারল না। ফলে ফরোয়ার্ড ব্লকের আন্দোলন তেমন তীব্র বা ব্যাপক আকার ধারণ করল না।

হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলনে নূতনত্ব থাকলেও তা ছিল একান্তভাবে আঞ্চলিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্বহীন। ইতিহাস-অবখ্যাত হলওয়েল মনুমেণ্টের প্রয়োজন ব্রিটিশের কাছে বহুদিন পূর্বেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ৩রা জুলাই ছিল আন্দোলন আরম্ভের দিন, ২রা জুলাই ভারতরক্ষা বিধানে পুলিস সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করল।

হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলন নির্দিষ্ট দিনে অবশ্য শুরু হল এবং ছড়িয়ে পড়ল কলিকাতার হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে। কালবিলম্ব না করে বাংলা সরকার মনুমেণ্ট অপসারণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন এবং আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত বন্দীদের মুক্তির আদেশ দিলেন। আন্দোলনের সফল সমাপ্তি ঘটল। *

সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সী জেলে আটক থাকা কালে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হলেন। তখন তিনি অসুস্থ। নিজের অসুস্থতা এবং কেন্দ্রীয় আইন সভার অধিবেশনে যোগদানের অভিপ্রায় উল্লেখ করে, ৩০শে অক্টোবর সরকারকে তাঁর মুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবার জন্য সুভাষচন্দ্র একটি পত্র দিলেন।

এই সময় ভারতের বাইরে গিয়ে ব্রিটেনের শত্রুপক্ষের সাহায্যে একটি সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম গঠনের চিন্তা তাঁর মনে স্থান নিয়েছিল। দেশের অভ্যন্তরে সর্বাত্মক সংগ্রাম রচনার প্রয়াস কংগ্রেস নেতৃবর্গের বিরোধিতার ফলে ব্যাহত হওয়ায়, এই দুঃসাহসিক পরিকল্পনা সুভাষচন্দ্রের নিকট একমাত্র উপযুক্ত বিকল্প পন্থা বলে বিবেচিত হল। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করতে কৃতসংকল্প হলেন।

৩০শে অক্টোবর তারিখের পত্রের কোন জবাব না পেয়ে, সুভাষচন্দ্র ২৬শে নভেম্বর বাংলার গভর্নর, মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিকট তাঁকে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারারুদ্ধ করার প্রতিবাদে, ২৯শে নভেম্বর থেকে আমৃত্যু অনশনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে, এক দীর্ঘ পত্র লিখলেন।

পত্রখানির আশু উদ্দেশ্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে কারা-মুক্তি হলেও, আমৃত্যু অনশনের সিদ্ধান্তের পিছনে প্রচণ্ডতম ঝুঁকি ছিল। জীবন যাঁদের আদর্শের জন্য উৎসর্গীকৃত, তাঁদের পক্ষেই শুধু এমন দুঃসাহসিক অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া সম্ভবপর। পত্রে সুভাষচন্দ্র ন্যায় ও সত্যের যে মহত্তম আবেদনটি তুলে ধরেছেন তা তাঁর জীবনোপলব্ধির অমৃতধারায় প্রাণবন্ত।

পত্রখানি একটি ঐতিহাসিক দলিল, তাই পত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত হল।

> গত ৩০শে অক্টোবর, ১৯৪০, আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে একখানা চিঠি দিয়েছি। (মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকেও ঐ চিঠির নকল পাঠান হয়েছে।) ঐ একই দিনে ও গত ১৪ই নভেম্বর আমি প্রেসিডেন্সী জেলের আধিকারিককেও দুখানা কনফিডেনসিয়াল পত্র দিয়েছি। আমার অনুরোধ মতো সে চিঠিও বাংলা সরকারের নিকট পাঠান হয়েছে। বর্তমান চিঠিতে আমার নিজের সম্পর্কে যা বলার আছে তার পুনরুক্তি করব এবং আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে কেন আজ বাধ্য হলাম, তাও লিখিত ভাবে জানাব।
>
> আপনাদের দ্বারা আমার প্রতি অবিচারের কিছুমাত্র প্রতিকার হবে এমন দুরাশা আমার নেই। সেইজন্য আমি আপনাদের নিকট মাত্র দুটো অনুরোধ করব। দ্বিতীয় অনুরোধ থাকবে আমার চিঠির শেষের দিকে। আমার লেখা আজকার চিঠিখানা সরকারী রেকর্ডরুমে সযত্নে রক্ষা করার ব্যবস্থা যেন হয় এটাই আমার প্রথম অনুরোধ। ভবিষ্যতে

আপনাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যারা আসবেন আমার সেই সব স্বদেশবাসী যাতে এই চিঠি দেখার সুযোগ পান তার জন্যই এই অনুরোধ। তাছাড়া এতে আমার স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটা আবেদন রয়েছে এবং সে কারণে এটা আমার রাজনৈতিক জীবনের ইচ্ছাপত্র। (Political Testament).

কোন রকমের যুক্তি বা কারণ না দেখিয়েই উনিশ শো চল্লিশের দোসরা জুলাই ভারত রক্ষা বিধানের ১২৯ ধারায় আমাকে বাংলা সরকার গ্রেপ্তার করেন। পরবর্তীকালে সরকারী ব্যাখ্যা সর্ব প্রথম শোনা যায় হাউস অব কমন্সের সভায় ভারত সচিব মিঃ এমেরির মুখে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে, কলিকাতার হলওয়েল মনুমেণ্ট বিলোপ করার আন্দোলন সম্পর্কেই আমাকে ধরা হয়েছে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও কার্যতঃ বঙ্গীয় বিধান সভায় ঐ উক্তির অনুমোদন করেছেন। তিনি বলেছেন যে হলওয়েল মনুমেণ্ট সত্যাগ্রহের জন্যই আমাকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না। সরকার মনুমেণ্ট অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এই আন্দোলন উপলক্ষে বিনা-বিচারে আটক সমস্ত বন্দীকেই মুক্তি দেওয়া হয়। কেবলমাত্র শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী এম. এল. এ. এবং আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে এই বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারত রক্ষা বিধানের ১২৯ ধারা অনুযায়ী আমাকে সাময়িকভাবে আটক রাখবার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তার পরিবর্তে ২৬ ধারা অনুযায়ী আমাকে স্থায়ীভাবে আটক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভারতরক্ষা আইনের ৩৮ ধারা অনুসারে আমার বিরুদ্ধে দুজন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলার কারণ হিসাবে দেখান

হয়েছে আমার তিনটে বক্তৃতা ও আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক ফরোয়ার্ড ব্লক পত্রিকায় লিখিত আমার প্রবন্ধ। দুটো বক্তৃতা আমি ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দিয়েছিলাম। তৃতীয় বক্তৃতাটা দিই এপ্রিলের গোড়ার দিকে। আগস্ট মাসের শেষ দিকে ভারতরক্ষা আইনের অন্য একটি ধারা বলে আমাকে সরকার স্থায়ীভাবে আটকের ব্যবস্থা করলেন এবং ঐ আইনের অন্য একটি ধারা বলে বিচার বিভাগীয় ট্রাইবুনালে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে এক অভিনব এবং অভূতপূর্ব পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন। শাসন বিভাগীয় হুকুম এবং বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থার এমন সম্মেলন এর আগে আমি দেখিনি। ঐ নীতি সুস্পষ্টভাবে বে-আইনী, অন্যায় এবং সোজা কথায় প্রতিহিংসা পরায়ণ।

এটা কারো দৃষ্টি এড়াবে না যে তথাকথিত অপরাধ সংঘটিত হবার অনেক পরে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। এটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় ঐ প্রবন্ধ প্রচারের জন্য পত্রিকাটির পাঁচশ টাকার জামানত বাজেয়াপ্ত করে শাস্তি স্বরূপ আরো দুহাজার টাকা জামানত জমা দিতে বাধ্য করা হয়েছে। অধিকন্তু পত্রিকাটির উপর এই আক্রমণ ঘটেছিল অত্যন্ত অতর্কিতভাবে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পত্রিকাটিকে আগে থাকতে সতর্ক ও করা হয়নি।

সরকারী আচরণের মুখোস আরো নগ্নভাবে খুলে পড়ে যখন দুজন বিচারকের কাছে আমার জামিনের জন্য আবেদন করা হয়। সরকারী মুখপাত্র দুটো আবেদনেরই তীব্র বিরোধিতা করেন, শেষোক্ত ক্ষেত্রে বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ওয়ালি-উল-ইসলাম আমার আবেদন মঞ্জুর করে মন্তব্য করতে বাধ্য হন যে, সরকার যদি ভারতরক্ষা বিধানের ২৬ ধারা

অনুযায়ী বিনাবিচারে আটক আদেশ প্রত্যাহার না করেন, তাহলে তাঁর এই আদেশ নিষ্ফল হবেই। এ থেকে একটা কথা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সরকার এক-দিকে বিচার বিভাগীয় মতামতের উপর বাধা নিষেধ আরোপ করেছেন, অন্য দিকে শাসন বিভাগীয় আইন প্রয়োগও অসম্ভব করে তুলেছেন। প্রাদেশিক সরকারের কার্যাবলী আরো আপত্তিজনক হয়ে উঠেছে এই কারণে যে তারা এসব ক্ষেত্রে ভারত সরকারের আদেশকে আদৌ আমল দিতে চান না। দুজন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে একই সময়ে আমার বিচারের ব্যবস্থা করে সরকার বিষয়টি আরো বেশ জটিল করে তুলেছেন। আমার একাধিক বক্তৃতার জন্য মামলা করাই যদি সরকারের উদ্দেশ্য ছিল তাহলে দুজন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তা না করলেই চলত। কারণ, গত এক বছরে কলিকাতাতেই আমি অনেক বক্তৃতা দিয়েছি। সাধারণ মানুষ তাই মনে করে যে সরকার আমাকে শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর এবং সেই কারণে একটা মামলা ফেঁসে গেলেও আর একটায় যাতে আমাকে সাজা দেওয়া যায় তার জন্যই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

যে কোন পক্ষপাতহীন মানুষের কাছে সরকারী আচরণ একান্ত হীন ষড়যন্ত্রমূলক বলে মনে হবেই। বিশেষ করে এটা আরো এই কারণে যে, তথাকথিত সরকার-বিরোধী অনাচার অনুষ্ঠিত হবার অনেক পরে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদি সত্যিই আমার আচরণ আইন-বিরোধী হয়ে থাকে, তাহলে সরকার সে সময়, যখন তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন তার প্রতিবিধান করলেন না কেন?

*　　*　　*

আমার এই বন্দী জীবনের জন্য ভারত সরকার দায়ী, বাংলা সরকার নন, এমন একটা বিতর্কমূলক কথা উঠলেও উঠতে পারে। এর জবাবে আমি এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইন সভায় আমার সম্বন্ধে যে মুলতুবী প্রস্তাব পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র উত্থাপন করেছিলেন তার জবাবে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, যেহেতু বাংলা সরকার আমাকে কারারুদ্ধ করেছেন সেই হেতু কেন্দ্রীয় আইন সভায় আদৌ এ প্রশ্ন উঠতে পারে না। আমার মনে হয় বাংলা সরকারের মন্ত্রীও এই ধরনের স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

সেই সঙ্গে আমরা একথাও ভুলে যেতে পারি না যে বর্তমানে আমরা 'জনপ্রিয়' মন্ত্রিসভার সদাশ্রয়ে বাস করছি।

কেন্দ্রীয় আইন সভায় আমার সাম্প্রতিক নির্বাচন আর একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। অধিবেশন চলাকালীন সদস্যরা—কেউ যদি বন্দীও থেকে থাকে—অধিবেশনে যোগ দিতে পারে কিনা এ প্রশ্নেরও মীমাংসা হওয়া দরকার। স্পষ্ট করে বিধিবদ্ধ থাক আর না থাক, প্রতিটি শাসনতন্ত্রে এটা একটা মৌল অধিকার এবং এই অধিকার অর্জন করা হয়েছে দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে। এই সেদিন বার্মা সরকার একজন দণ্ডিত আসামীকে তাদের আইন সভায় যোগ দেবার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু দণ্ডিত না হওয়া সত্ত্বেও আমাকে আমাদের 'জনপ্রিয়' মন্ত্রিমণ্ডলী সে অধিকার দিতে নারাজ।

* * *

আমার বন্দীজীবন সম্পর্কে বিচার করতে হলে দুটি ব্যাপক প্রশ্ন আলোচনা করতে হবে। প্রথমতঃ ভারত রক্ষা বিধান ন্যায়ানুমোদিত ও জনমত গ্রাহ্য কিনা; দ্বিতীয়তঃ,

আইনের সিদ্ধান্ত আমার সম্পর্কে যথাযথ প্রযুক্ত হয়েছে কিনা। দুটো প্রশ্নের উত্তরই নেতিবাচক।

ভারতরক্ষা বিধানের পিছনে কোন নৈতিক সমর্থন নেই। কেন না ঐ বিধানের দ্বারা জনসাধারণের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। তদুপরি এই বিধান রচিত ও প্রবর্তিত হয়েছিল যুদ্ধের প্রয়োজনে। একথা সর্বজন বিদিত যে ভারতীয় জনগণের কিংবা ভারতীয় আইন পরিষদের অনুমোদন ছাড়াই ভারতবর্ষকে এই যুদ্ধে নামানো এবং যুদ্ধরত দেশগুলির সামিল ঘোষণা করা হয়েছিল। অহরহ বলা হয় যে ব্রিটেন গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পক্ষে সংগ্রামে রত হয়েছে। এই বিধান সেই সোচ্চার ঘোষণার পরিপন্থী। শেষ কথা, কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস দল ভারত-রক্ষা আইন বা বিধি পাশ করিয়ে নেবার সময় কোনটারই সমর্থক ছিল না। এই সব যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই আইন বা বিধি ভারত-দমন-বিধান অথবা অনাচার রক্ষা আইন নামে অভিহিত করাই কি যুক্তিসঙ্গত ও অর্থপূর্ণ বলে মনে হবে না?

বঙ্গীয় সরকারপক্ষ থেকে যুক্তি দেখান যেতে পারে যে যেহেতু ভারতরক্ষা আইন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল সেই হেতু প্রাদেশিক সরকার এর বিধি অনুযায়ী চলতে বাধ্য। বিধিগুলি যে ভাবেই বা যার দ্বারাই চালু হয়ে থাক না কেন, এর আগে অনেক যুক্তি দিয়ে আমি দেখিয়েছি যে আমার বেলায় এই বিধির যথাযথ প্রয়োগ হয়নি। অন্যায় ও অবিচার সুপ্রকট হয়ে উঠেছে। একটি মাত্র কারণ আমি এই বিস্ময়কর আচরণের পেছনে দেখতে পাই—তা হল আমার প্রতি সরকারের প্রত্যক্ষ প্রতিহিংসা। কারণ? তা আমার অজ্ঞাত।

আমার বিবেকের দুয়ারে আমি আজ বার বার করাঘাত শুনতে পাচ্ছি। জীবনে এই সংকট মুহূর্তে আমাকে পথ খুঁজে বের করতেই হবে। পারিপার্শ্বিকতার এই ঔদ্ধত্য কি মুখ বুজে স্বীকার করে নেব? অথবা এই ন্যায়নীতি বিগর্হিত অবিচারের বিরুদ্ধে জানাব আমার প্রতিবাদ? বিশেষ এবং একাগ্র চিন্তার পর আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছেও গেছি। এদের ঔদ্ধত্যের কাছে মাথা নত করা গুরুতর অপরাধ। কাজেই প্রতিবাদ আমাকে করতেই হবে।

আমি জানি এই মুহূর্তেই কোন প্রত্যক্ষ ফল ফলবে না কিন্তু কোন আত্মবলিদান ও দুঃখবরণ বৃথাও যায় না। সর্বদেশে আর সর্বকালে একমাত্র দুঃখবরণ আর আত্মাহুতির ভেতর দিয়েই আদর্শ সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে। এমনি করেই মৃত্যুর বুকের ওপর ফুটে চলে নবজীবনের নবতম ছন্দ। মৃত্যুবেদী হয়ে ওঠে নবসৃষ্টির প্রসূতি। আদর্শ, ভাবধারা আর স্বপ্ন যুগ থেকে যুগান্তরে রূপায়িত হয়ে ওঠে। আহুতি আর নির্যাতনকে সাক্ষী না করে কোন্ আদর্শই বা সার্থকতার সন্ধান পেল?

বৃহৎ আদর্শকে আশ্রয় করে বাঁচা আর মরা—জীবনে এর চাইতে বড় পাওয়া আর কি আছে? জীবন কোষের সমিধ দিয়ে অনির্বাণ করে রাখতে হবে প্রাণযজ্ঞের হোমাগ্নি। অসমাপ্ত কর্মযোগ পূর্ণতা পাবে পরবর্তী জীবনে। মৃত্যুর বিনিময়ে যে জীবন উঠবে ফুটে, তার ধ্রুববাণী পাহাড় ডিঙিয়ে, উপত্যকার উপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়বে তার দেশজননীর শ্যামল বুকে। দিগ্‌বিদিকে। সাগর ডিঙিয়ে সুদূর ভিন্ দেশের তটভূমি শুনবে সেই অমর বাণী। আদর্শের বেদীমূলে এমন মহান আত্মোৎসর্গের মধ্যেই না লুকিয়ে থাকে জীবনের মহত্তম অবলুপ্তি।

কে বলে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে সর্বহারা হতে হয়? মাটির পৃথিবীর কোলে টলে পড়েও আর জীবন কি ফুটে উঠবে না শতদল পদ্মের মতো—যার মর্মকোষে ভরা থাকে অমৃতের ঝর্ণাধারা?

এই অবিনশ্বরতাই আত্মার প্রকৃত রূপ। ব্যক্তির মৃত্যুর বুকে জাতির জীবন ফুটে উঠুক। তাই তো এমন করে আজ মৃত্যু আমার কাম্য ও প্রিয় হয়ে উঠেছে। আমার জীবনের বিনিময়ে আমার স্বদেশ, আমার ভারতবর্ষ লাভ করবে অবিনশ্বর জীবন, পাবে স্বাধীনতা, পাবে অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকার।

এইবার আমার দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলব: এ কথাটা ভুলো না যে দাসত্বের চাইতে বড় অভিশাপ আর নেই। ভুলে যেও না যে অবিচার আর দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করবার চাইতে বড় অপরাধ আর নেই। মনে রেখো সেই শাশ্বত নীতি: জীবনকে পরিপূর্ণ করে পেতে হলে জীবনের বিনিময়েই তা পেতে হবে। আর মনে রেখো, সর্বোচ্চ ক্ষয় ও ক্ষতি স্বীকার করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে অবিরাম।

বর্তমান সরকারকে বলে যেতে চাই—সাম্প্রদায়িকতা আর অবিচারের পথে আপনাদের উন্মাদ অভিযান সংহত করুন। আপনাদের তৈরি মৃত্যুবাণে একদিন আপনাদের প্রাণ সংশয় হবে। বাংলার বুকে আর একটা সিন্ধু সৃষ্টি করবেন না।

আমার বলা শেষ। আমার দ্বিতীয় ও শেষ অনুরোধ আপনাদের কাছে, আমার অনশন নিয়ে কোন প্রকার বল প্রয়োগ যেন না করা হয়। আমার শেষ সময় ঘনিয়ে আসুক শান্তির কোলে, এইটুকুই আপনাদের কাছে কামনা রইল।

টেরেন্স ম্যাকসুইনি, যতীন দাস, মহাত্মা গান্ধী এবং ১৯২৬ সালে আমাদের ক্ষেত্রেও সরকার অনশন সম্পর্কে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমি আশা করব, এবারও অনুরূপ সিদ্ধান্তই নেওয়া হবে। আমাকে গায়ের জোরে খাওয়াবার চেষ্টা করলে আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তা প্রতিরোধ করব। এবং তার পরিণাম হবে আরও ভয়াবহ ও বিপর্যয়কর।

আমি ১৯৪০ এর উনত্রিশে নভেম্বর থেকে অনশন শুরু করব।

পুনশ্চঃ আগের অনশনগুলির ন্যায় আমি অনশনকালে কেবল লবণ জল গ্রহণ করব। কিন্তু প্রয়োজন বোধ করলে তাও পরিত্যাগ করব।

২৯শে নভেম্বর থেকে সুভাষচন্দ্র অনশন শুরু করলেন। অনশনের সংবাদ বাইরে প্রকাশ হতে জনসাধারণের মধ্যে উৎকণ্ঠা দেখা দিল। কয়েকদিন অনশনের পর সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে লাগল। সংবাদপত্র ও সভায় বিক্ষুব্ধ জনমত প্রতিফলিত হল। অনশন যেমন সংকটের দিকে এগিয়ে চলল, সুভাষচন্দ্রের মুক্তির দাবিও সর্বত্র প্রবল হয়ে উঠল।

৫ই ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র তাঁর ২৬ নভেম্বর তারিখের পত্রে লিখিত অনুরোধ দুটির পুনরুল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিকট একখানা সংক্ষিপ্ত পত্র দিলেন। সেই পত্রে তিনি লিখলেন :

মানুষ শুধু খেয়ে থাকার জন্য জীবন ধারণ করে না, জীবনের জন্য তার প্রয়োজন নৈতিক ও আত্মিক উপজীব্য। আমাকে যখন তা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তখন শুধু আপনাদের অভিসন্ধির শিকার হয়ে আমি বেঁচে থাকব, তা হতে পারে না।

সুভাষচন্দ্রের আমৃত্যু অনশন সংকল্প এবং অনশনজনিত স্বাস্থ্যের

অবনতি সরকারকে বিমূঢ় করল। অনশনকে কেন্দ্র করে যুদ্ধজনিত সংকটকালে ভারতবর্ষে একটা বড় রকমের গোলযোগ বেধে যায় সরকারের নিকট তা একান্তভাবে অনভিপ্রেত ছিল। অনশনের সাত দিন পরে সরকার সুভাষচন্দ্রের মুক্তির আদেশ দিলেন।

জেলগেট থেকে একখানা অ্যামবুলেন্স গাড়ীতে তাঁকে তাঁর এলগিন রোডের বাড়ীতে আনা হল। গোয়েন্দা পুলিশ দল সর্বক্ষণ তাঁর গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখল। কার্যতঃ সুভাষচন্দ্র গৃহবন্দী হলেন।

অনশন জনিত দুর্বলতা হ্রাস পাবার পর, সুভাষচন্দ্র স্বগৃহেই ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকলেন। সভার কাজ শেষ হলে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা মিয়া মহম্মদ আকবর শাহের সহিত সুভাষচন্দ্রের পেশোয়ার হয়ে ভারতের বাইরে যাবার পরিকল্পনা নিয়ে গোপন আলোচনা হল। আকবর শাহ তাঁকে সীমান্ত পার করে দেবার দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হলেন।

পেশোয়ারে ফিরে মহম্মদ শাহ দেখা করলেন ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মী এবং পাঞ্জাব কীর্তি কিষাণ পার্টির সভ্য শ্রীভগৎরাম তলোয়ারের সঙ্গে। ভগৎরাম শহীদ হরি কিষেণ তলোয়ারের ভ্রাতা, যিনি ১৯৩০ সালে পাঞ্জাবের লাটসাহেবকে গুলী করার অভিযোগে দণ্ডিত হয়ে ফাঁসীতে প্রাণ দেন। ভগৎরাম সীমান্তের পথঘাট জানতেন, তিনি সানন্দে আকবর শাহের প্রস্তাব মতো সুভাষচন্দ্রকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে কাবুলে পৌঁছে দিতে স্বীকৃত হলেন। মহম্মদ শাহ কলিকাতায় এসে সুভাষচন্দ্রকে সবিশেষ সংবাদ জানালেন।

শুরু হল প্রস্তুতি পর্ব; সুভাষচন্দ্র নিজের ঘরে আত্মস্থ হলেন, ঘরের দ্বার বন্ধ হল, তাঁর মুখ দাড়ি গোঁফে ভরে উঠল। ব্যাঘ্রচর্মের আসনে বসে তিনি প্রায় সময়ই ধ্যান মগ্ন থাকেন। বাইরের লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ। ঠাকুর পর্যন্ত ঘরে ঢুকতে পারে

না, দরজার সামনে খাবার রেখে চলে যায়। বাড়ীর লোকের ধারণা হল, সুভাষচন্দ্র আবার হয়ত সন্ন্যাস-জীবনে চলে যাবেন। সংবাদ-পত্রে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সেই ধারণার কথাই বলা হতে লাগল।

সুভাষচন্দ্রের ঘরে প্রবেশ-অধিকার ছিল একমাত্র শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর তৃতীয় পুত্র ডাঃ শিশির কুমার বসুর। তিনি সংসার বিরাগী অসুস্থ খুল্লতাতের চিকিৎসক এবং তত্ত্বাবধায়ক। মাঝে মাঝে ভাই-এর খোঁজ খবর নিতে রাত্রিতে আসতেন শ্রীশরৎচন্দ্র বসু। এই দুই সুভাষ-অনুব্রতী ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি বাইরের ব্যবস্থার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সংযোগ রক্ষা করে চললেন। এই ভাবে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল।

॥ ৮ ॥

১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারী রাত্রি ৯টার পর সুভাষচন্দ্র নিদ্রিতা জননীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে, মুসলমান মৌলভীর বেশে বাড়ীর গেটে অপেক্ষমান মোটরে এসে বসলেন। গাড়ী তীব্র বেগে ছুটে গেল। চালক ডাঃ শিশির কুমার বসু। হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে গাড়ী জি. টি রোড ধরে এগিয়ে চলল। ভোরের দিকে গাড়ী এসে থামল আসানসোল থেকে কিছু দূরে বাবারি গ্রামে। সেখানে থাকতেন শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ডঃ অশোক বসু। গাড়ী থেকে নেমে ডাঃ শিশির বসু এবং ইনসিওরেন্স কোম্পানীর অর্গানাইজার মৌলভী জিয়াউদ্দিনের ছদ্মবেশে সুভাষচন্দ্র ডঃ অশোক বসুর বাংলোতে উঠলেন। বাংলোর গেস্ট রুমে তিনি নিভৃতে দিনটা কাটালেন, একমাত্র অশোক বসু ছাড়া বাড়ীর কেউই তাঁর পরিচয় জানল না।

সন্ধ্যায় বাবারি থেকে সুভাষচন্দ্র এলেন গোমো স্টেশানে মোটর গাড়ীতে এবং সেখান থেকে হাওড়া-কালকা মেলের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় চেপে পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করলেন।

পরদিন ট্রেনে সুভাষচন্দ্রের সহযাত্রী ছিলেন এক শিখ ভদ্রলোক। উভয়ের মধ্যে কিছু কথাবার্তা হল। সুভাষচন্দ্র নিজেকে লক্ষ্ণৌবাসী ইনসিওরেন্স কর্মী মৌলভী জিয়াউদ্দিন বলে পরিচয় দিলেন। সুভাষ চন্দ্রের মুসলমানী বেশ এবং নির্ভুল উর্দুতে সহযাত্রীর মনে কোন সন্দেহ জাগল না।

ট্রেন যথাসময়ে পেশোয়ার পৌঁছল। সুভাষচন্দ্রের জন্য স্টেশানে মোটর রাখা হয়েছিল। তিনি নিরাপদে নির্দিষ্ট আশ্রয় স্থলে চলে গেলেন। দুদিন তাঁকে পেশোয়ারে কাটাতে হল। যথা সময়ে ভগৎরাম তলোয়ার এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তখন পাঠান রহমত খাঁ সেজেছেন। সুভাষচন্দ্রকেও পাঠানের পোশাক পরতে দেওয়া হল।

তারপর সুভাষচন্দ্র ও ভগৎরাম পাঠানের বেশে আকবর শাহের সহযোগী আবাদ খাঁর সঙ্গে পেশোয়ার থেকে মোটরে সীমান্ত অভি-মুখে যাত্রা করলেন। পেশোয়ার ছেড়ে এগার মাইল মোটর ভ্রমণের পর, খাজুরি ময়দানে গাড়ী থামল। মোটর পথের এখানেই শেষ। আবাদ খাঁ গাড়ী নিয়ে ফিরে গেলেন। রহমৎ খাঁ এবং জিয়াউদ্দিন এবার চললেন পায়ে হেঁটে। তাঁদের সঙ্গে দেওয়া হল দুজন সশস্ত্র পাঠান দেহরক্ষী।

আকবর শাহ রইলেন নেপথ্যে। তাঁর নিখুঁত ব্যবস্থায় সব কাজ সুন্দর ভাবে নিষ্পন্ন হল।

সারা দিন পথ চলার পর সন্ধ্যাবেলা যাত্রীদল ভারতবর্ষের সীমা পার হয়ে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে পৌঁছলেন। রাত্রিটা কাটালেন সবাই আড্ডা শরীফ দরগায়। দরগায় একজন পীর বাস করতেন। তিনি যাত্রীদের আশ্রয় ও আহারের ব্যবস্থা করলেন। গার্হী থেকে যে দুজন সশস্ত্র পাঠান দেহরক্ষীকে দেওয়া হয়েছিল এখান থেকে তাঁরা বিদায় নিলেন।

পরদিন সকালে আবার যাত্রা শুরু হল। এবার সুভাষচন্দ্র ও ভগৎরামের সঙ্গে দেওয়া হল তিনজন সশস্ত্র আফ্রিদি রক্ষী। পাহাড়ী দুর্গম পথ। শীতের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। কলিকাতার মানুষ সুভাষচন্দ্রের পথ চলতে খুবই কষ্ট হল। রাত্রি নটার সময় তাঁরা লালপুরায় পৌঁছলেন, আতিথ্য গ্রহণ করলেন লালপুরার খানের। আফগান সরকারী মহলে খান একজন নামকরা লোক, বস্তুতঃ

তিনিই সেখানকার শাসনকর্তা। লালপুরার খান সুভাষচন্দ্র ও ভগৎরামের জন্য একখানা পরিচয় পত্র দিলেন। পরিচয় পত্রে লেখা হল —রহমত খাঁ ও জিয়াউদ্দিন লালপুরা অঞ্চলের অধিবাসী, তাঁরা সাখি সাহেবের দরগায় যাচ্ছেন। আমি নিজে তাঁদের আচরণের জন্য জামিন থেকে এই পরিচয় পত্র লিখে দিলাম। কেউ যেন তাঁদের হয়রান না করে।

আগে থেকে এসব ব্যবস্থা ঠিক করে রাখা হয়েছিল। এই পরিচয় পত্রে ভাল কাজ হয়েছিল।

লালপুরা ছাড়বার পর কয়েক মাইল হেঁটে সুভাষচন্দ্র ও ভগৎরাম কাবুল নদের তীরে পেঁীছলেন। নদী পারের জন্য নৌকা ছিল না। ভিস্তিওয়ালার অনেকগুলি চামড়ার থলে দড়ি দিয়ে একসঙ্গে বেঁধে ভেলার মতো তৈরী একটা নৌ-যানে তাঁরা নদী পার হলেন। নদীর অপর পার থেকে বন্দুকধারী চলনদাররা ফিরে গেলেন।

পেশোয়ার থেকে ৫০ মাইল দূরে ডাকার চেকপোস্টে ভারতবর্ষ থেকে কাবুল যাত্রীদের ছাড়পত্র পরীক্ষা করা হত। যাত্রীদের জিনিসপত্রও তল্লাসী হত। ডাকার ছাড়াও এই পথে আরো তিন জায়গায় চেকপোস্ট ছিল। তাই প্রচলিত সড়ক ছেড়ে সুভাষচন্দ্র ও ভগৎরামকে দুর্গম ঘোরা পথে চলতে হয়েছিল এবং তার জন্য তিনদিন সময় বেশি লাগল।

এবার লরীতে বোঝাই মালের উপর বসে দুই মুসাফির রওনা হলেন কাবুলের উদ্দেশ্যে। হিমশীতল রাত্রি, অবিশ্রান্ত বরফ পড়ছে, লরী ছুটেছে উন্মুক্ত মাঠের মাঝ দিয়ে। আত্মরক্ষার মতো গরম বস্ত্র নেই কারও। দুর্গতির এক শেষ! পরদিন সকালে বাদঘাট পৌছলেন দুজন। বাদঘাটের চেকপোস্টে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। রহমত খাঁ বললেন, সঙ্গী তাঁর চাচা, তিনি বোবা ও কালা। মানতের জন্য তিনি তাঁকে সাখি সাহেবের দরগায় নিয়ে যাচ্ছেন। তারপর লালপুরা খানের পরিচয় পত্রটি দেখান হল। চেকপোস্টের কর্তা আর

কোন কথা বললেন না। ভগৎরাম পুস্তভাষা কিছুটা জানতেন, তাই দিয়েই কোনমতে কাজ সারলেন।

চা পান করে আবার লরীতে উঠে বসলেন দুজন এবং বিকাল পাঁচটায় কাবুলে পৌঁছলেন।

সীমান্ত অতিক্রম করার পর সুভাষচন্দ্রের নিরাপদ যাত্রার সংবাদ পেশোয়ারে আকবর শাহের নিকট পৌঁছে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে সে সংবাদ কলিকাতায় যথা নির্দিষ্ট স্থানে প্রেরিত হয়েছিল। ২৭ শে জানুয়ারী ধার্য ছিল সুভাষচন্দ্রের আদালতে হাজিরা দেবার দিন। ২৬শে জানুয়ারী বিকালে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু এলগিন রোডের বাড়ী থেকে টেলিফোনে খবর পেলেন যে সুভাষচন্দ্র তাঁর ঘর থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনুসন্ধান চলল কলিকাতার আত্মীয় বন্ধুমহলে, তার বার্তা পাঠান হল পণ্ডিচেরী, হৃষীকেশ, কাশী, বৃন্দাবনের নানা আশ্রমে। কোন স্থান থেকেই নিরুদ্দিষ্ট সুভাষচন্দ্রের কোন সংবাদ মিলল না।

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের খবর পেয়ে পুলিশের বড় কর্তারা এলগিন রোডের বাড়ীতে ছুটে এলেন, বাড়ী ঘরে তল্লাসী চালালেন, বাড়ীর লোকদের নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন কিন্তু সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশের কোন সূত্র খুঁজে পেলেন না। শরৎচন্দ্রের উডবার্ণ পার্কের বাড়ীতেও পুলিশ অনুসন্ধান করল, শ্রীযুক্ত বসুকে পুলিশ অনেক ভাবে জেরা করল কিন্তু ফল কিছুই হল না।

সংবাদপত্রে বড় হরফে সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশের খবর প্রকাশিত হল এবং তাতে আভাস দেওয়া হল সুভাষচন্দ্র খুব সম্ভব সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করে হিমালয়ের কোন নির্জন স্থানে ধ্যান মগ্ন হয়েছেন।

গান্ধীজী এবং রবীন্দ্রনাথ তারবার্তায় সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের সংবাদে তাঁদের উদ্‌বেগের কথা জানিয়ে, বিস্তৃত খবর জানাতে বললেন।

পাঞ্জাব থেকে সর্দার শার্দুল সিং কবিশের সংবাদ পত্রে বিবৃতি দিলেন: "আমার স্থির বিশ্বাস সুভাষবাবু কোন উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে গৃহত্যাগ করেছেন। কিছুদিন আগে আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তিনি তখন আমাকে এই ধরনের একটা আভাস দিয়েছিলেন।"

২৭শে জানুয়ারী অ্যাডভোকেট শ্রীসন্তোষকুমার বসু সুভাষচন্দ্রের পক্ষে আদালতে উপস্থিত হয়ে বিচারককে জানালেন যে তাঁর মক্কেল গৃহ থেকে নিখোঁজ। তাঁর অনুসন্ধান করা হচ্ছে, আশা করা যায় অভিযুক্ত শীঘ্রই আদালতে উপস্থিত হবেন।

সরকার সুভাষচন্দ্রের অনুসন্ধানে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। দেশের সকল নৌ ও বিমান বন্দর এবং সীমান্ত ঘাঁটিগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হল। দেশের ভিতরে সর্বত্র গোয়েন্দা পুলিশ কড়া নজর রাখল।

ছদ্ম পরিচয়ে কাবুলে অবস্থান সুভাষচন্দ্রের পক্ষে বিপদপূর্ণ ছিল। তাঁর নিরুদ্দেশের সংবাদ ভারতবর্ষের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সীমান্তবর্তী দেশগুলিতে ব্রিটিশ গোয়েন্দা চক্র সবিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছিল।

কাবুলে সুভাষচন্দ্র ও ভগৎরাম প্রথমে উঠেছিলেন একটি ছোট সরাইখানায়। তারপর তাঁরা আশ্রয় নিলেন ভগৎরামের পরিচিত কাবুল প্রবাসী রেডিও ব্যবসায়ী শ্রীউত্তম চাঁদ মালহোত্রার গৃহে। পেশোয়ারের বন্ধুবর্গ সুভাষচন্দ্রের সীমান্ত অতিক্রম করে কাবুলে যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারলেও, কাবুল থেকে মস্কো বা বার্লিনে যাবার কোন ব্যবস্থা এত অল্প সময়ের মধ্যে করে উঠতে পারেন নি। তাই সে ব্যবস্থা তাঁকেই করতে হল। অকুতোভয় বিপ্লবী ভগৎরাম এবং হঠাৎ পাওয়া বন্ধু উত্তম চাঁদের সাহায্যে সুভাষচন্দ্র কাবুলের ইতালীয় দূতাবাসের সহিত সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হলেন। ইতালীয় রাষ্ট্রদূত রোমস্থ পররাষ্ট্র দপ্তরের অনুমোদন গ্রহণ করে সুভাষচন্দ্রকে মস্কো, রোম অথবা বার্লিনে পৌঁছে দিতে সম্মত হলেন।

ইতালীয় দূতাবাস থেকে সুভাষচন্দ্রকে সিনর অরল্যাণ্ডো ম্যাজিট্টে নামে একটি ইতালীয় ডিপ্লোম্যাটিক পাশপোর্ট দেওয়া হল। রোম ও বার্লিন কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রের নির্বিঘ্ন ভ্রমণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে দূতাবাসকে নির্দেশ দিলেন। ১৯৪১ সালের ১৮ই মার্চ সুভাষচন্দ্র কাবুল থেকে মোটরে আফগান-রুশ সীমান্তে এলেন এবং সেখান থেকে ট্রেনে মস্কো। তাঁর সঙ্গী ছিলেন তুজন জার্মান এবং একজন ইতালীয় অভিজ্ঞ কূটনীতিক।

সোভিয়েত রাশিয়া এবং জার্মানীর মধ্যে এই সময় অনাক্রমণ চুক্তি বলবৎ থাকলেও ইউরোপে জার্মানীর দ্রুত প্রতিপত্তি বিস্তার রাশিয়ার উদ্‌বেগের কারণ হয়েছিল এবং উভয় রাষ্ট্রই ভিতরে ভিতরে পরস্পরের প্রতি গভীর সন্দেহ পোষণ করছিল। অন্যদিকে মস্কোর ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস রাশিয়ার সন্দেহে নানাভাবে ইন্ধন জুগিয়ে, জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়াকে যুদ্ধে নামাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে সোভিয়েত সরকারের সক্রিয় সাহায্য লাভের আশা ছিল না বললেই হয়। রাশিয়ার পক্ষেও ইংরাজের পয়লা নম্বর শত্রু সুভাষচন্দ্রকে আশ্রয় দান বাঞ্ছিত ছিল না। রুশ সরকারের মতিগতি উপলব্ধি করে সুভাষচন্দ্র ২৮শে মার্চ মস্কো থেকে বিমানে বার্লিন রওনা হলেন। প্রস্তাবিত ব্রিটিশ-রুশ মৈত্রী চুক্তির আলোচনা তখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল।

১৯৪১ সালের মে মাসে কাবুলে ধরা পড়লেন শ্রীউত্তম চাঁদ মালহোত্রা। তাঁকে ভারতে এনে কারারুদ্ধ করা হল। তাঁর কাবুলের বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল। শ্রীভগৎরাম তলোয়ার পেশোয়ারে ফিরে আত্মগোপন করলেন। ডাঃ শিশির বসু এবং শ্রীসুরেশচন্দ্র বসুর তুই পুত্র শ্রীঅরবিন্দ বসু ও শ্রীদ্বিজেন বসুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল।

বার্লিনে পৌঁছে সুভাষচন্দ্র জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগের সহিত কথা-

বার্তা শুরু করলেন। বার্লিনে তাঁর থাকবার ভাল ব্যবস্থা হল। ১৯৪১-এর ৯ই এপ্রিল তিনি জার্মানীর হাতে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্য ও সেনানীদের দ্বারা একটি মুক্তিবাহিনী গঠনের অনুমতি, একটি নিজস্ব বেতার কেন্দ্র ও সচিবালয় স্থাপন, ইউরোপে একটি অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা এবং এই সকল কাজে যে অর্থের প্রয়োজন হবে তা ঋণ হিসাবে প্রদানের জন্য একটি লিখিত প্রস্তাব জার্মান সরকারকে দিলেন। জার্মান সরকার প্রস্তাবটি বিবেচনাধীন রাখলেন।

সুভাষচন্দ্র জার্মানীর রাষ্ট্রনায়ক হের হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করলেন। একটি অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠন ছাড়া প্রস্তাবের অপর অনুরোধগুলি পূরণ করতে জার্মান সরকার সম্মত হলেন।

বিদেশী শাসনের উচ্ছেদকল্পে, শাসকের শত্রুপক্ষের সাহায্য গ্রহণ একটি ঐতিহাসিক পন্থা। বস্তুতঃ সফল মুক্তি সংগ্রামের এমন দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দেখা যায়, যেখানে ঐ ধরনের সাহায্য লওয়া হয়নি। অবশ্য এরূপ সাহায্যের সুযোগ সব সময় মিলে না, কিন্তু সুযোগ এলে তার সদ্ব্যবহার না করা অমার্জনীয় জাতীয় কর্তব্যচ্যুতি বলে মনে করা যায়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভ ফরাসী সাহায্য ছাড়া সম্ভব হত কি না বলা শক্ত। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ডি. এম. কেটেলবি History of Modern times গ্রন্থে লিখেছেন—

"Thus in 1776 thirteen colonies of America proudly proclaimed their independence. By 1783, it was achieved and recognized, won by the dogged persistence of a minority and the Fabian tactics of a potent general, by reason of remoteness and inefficiency of the mother country and with the help of an

ally, France, who gained thereby her revenge for the loss of Canada in 1763."

মার্কিন ঐতিহাসিক এইচ. জে. ওয়েলসও ফরাসীদের এই সাহায্যের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন :

"The French sent General Lafayette to the states to assist them with his advice and their fleet did much to minimize the advantage of the British at sea. General Cornwallis was caught in the yorktown peninsula in Virginia in 1781, and capitulated with his army. The British Government, now heavily engaged with France and Spain in Europe, was at the end of its resources."

—Outline of History.

ফরাসী নৌবহর আমেরিকার বন্দরগুলির প্রবেশ মুখে সৈন্য ও অস্ত্রসম্ভার বোঝাই ব্রিটিশ জাহাজগুলির গতিরোধ না করলে আমেরিকার মুক্তি যোদ্ধাদের নিকট হয়ত ব্রিটিশ সেনাপতির এত শীঘ্র পরাজয় স্বীকার করতে হত না। ইংলণ্ড তখন ফ্রান্স ও স্পেনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং তার রসদেও টান পড়েছিল। শত্রুপক্ষের বিপর্যয় স্বপক্ষের সুযোগ—এই চিরন্তন রণনীতি কোন্ বিচক্ষণ নেতা হেলায় হারাতে চায় ?

এমন কি রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে, বোলশেভিক বিপ্লবের নায়ক মহান লেনিন পর্যন্ত প্রয়োজনে রাশিয়ার সহিত যুদ্ধরত জার্মানীর সাহায্য গ্রহণে দ্বিধাবোধ করেন নি !

"Lenin had been living in Exile in Switzerland, but was given special permit by the Germans to return to Russia through Germany."

—History of Modern Times by D. M. Ketelbey.



ভারতবাসীর উদ্দেশে সুভাষচন্দ্র বসুর বেতারভাষণ

শুধু স্পেশাল পারমিটই নয়, বোলশেভিক নায়কের সঙ্গে জার্মানী ট্রেনভর্তি বোলশেভিক প্রচার পত্র এবং কয়েক লক্ষ রুবলও সেদিন দিয়েছিল। লেনিন যথা সময়ে রাশিয়ায় পৌঁছে বিপ্লবীদের নেতৃত্ব না নিলে, রুশবিপ্লবের কি পরিণাম হত তা কে বলতে পারে !

সুভাষচন্দ্র চিরাচরিত ঐতিহাসিক পন্থাই গ্রহণ করলেন, বিশ্বযুদ্ধের সুযোগকে তিনি কোনমতে হাতছাড়া করতে চাইলেন না।

১৯৪১ সালের ২২ শে জুন রাশিয়া এবং জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। তার কিছুদিন আগে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে আজাদ হিন্দ সংঘ এবং আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। বার্লিনে তাঁর একটি সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউরোপ-প্রবাসী কিছু ভারতীয় ছাত্র ও যুবক সেখানে সমবেত হয়েছেন।

১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে, কলিকাতার বাসগৃহ থেকে অন্তর্ধানের দশমাস পরে, বার্লিনের আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র থেকে সুভাষচন্দ্র ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে প্রথম ভাষণ দিলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর দেশ শুনতে পেল সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর। সুভাষচন্দ্র বললেন :

> আজাদ হিন্দ রেডিও, বার্লিন। আমি সুভাষ বলছি। বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্যে মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার নজির ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। ইংলণ্ড যদি আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আমেরিকার দুয়ারে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ধর্ণা দিতে পারে, ভারতবর্ষ কেন তবে ভিন্ন রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে প্রয়াসী হবে না ?

ভাষণ শেষে ধ্বনিত হল 'জয়হিন্দ্'।

আলোড়ন বহে গেল সারা ভারতবর্ষে। অগণিত শ্রোতার মন থেকে দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়ের অন্ধকার কেটে গেল। ব্রিটিশ সরকারের

শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে সুভাষচন্দ্র তাহলে সুদূর জার্মানীতে উপস্থিত হয়েছেন! এ যে অসম্ভব ব্যাপার! আশায় ভরে উঠল ভারতবাসীর অন্তর।

সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজাদ হিন্দ সংঘে যোগ দিলেন তরুণ ছাত্র আবিদ হাসান, নাম্বিয়ার, শর্মা, সুলতান, ডঃ মল্লিক, গানপুলে, গিরিজা মুখার্জি, কুসুম পাল প্রমুখ প্রবাসী ভারতীয় সুধীবৃন্দ। বন্দী ভারতীয় সৈন্য ও সেনানীদের নিয়ে আরম্ভ হল আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার কাজ। ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে ছিল বংশ পরম্পরাগত ব্রিটিশ আনুগত্যের ছাপ, রাজনৈতিক চেতনা ছিল সীমিত। দেশের স্বাধীনতার জন্য দুঃখবরণ ও আত্ম বলিদানের কথা ছিল তাদের ধারণা বহির্ভূত। সুতরাং সৈন্য সংগ্রহের কাজটা বেশ শক্ত ছিল। একমাত্র সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব প্রভাবে বন্দীদের মনের পরিবর্তন ঘটল এবং দলে দলে তাঁরা এসে দাঁড়ালেন সুভাষচন্দ্রের পাশে। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ক্রীশ্চান বিভেদ যেন যাদুদণ্ড স্পর্শে নিমেষে নিশ্চিহ্ন হল। হাজার হাজার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ধ্বনিত হল আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ, নেতাজী জিন্দাবাদ, জয়হিন্দ্।

সুভাষচন্দ্র হলেন নেতাজী, সবার প্রিয় নেতাজী।

বার্লিনের তিয়রগার্টে খোলা হল আজাদ হিন্দ সংঘের সদর দপ্তর, বার্লিনের কেন্দ্র স্থলে ৬নং সোফিয়েন ট্রসে অবস্থিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ভবন হল নেতাজীর বাসস্থল। আবশ্যক অর্থ জার্মান সরকারের নিকট থেকে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করা হল।

আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র থেকে ইংরাজী ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় নিয়মিত প্রচার অভিযান শুরু হল। জার্মান সমর বিভাগের দক্ষ অফিসরের দ্বারা ফৌজের শিক্ষাদান চলল। সৈন্য শিবিরে উড়ল ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা।

১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র তাঁর বেতার ভাষণে বললেন:

এতকাল আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য শোনাবার সুযোগ ছিল না। শত্রুপক্ষ যে অপবাদই দিক, আমি জানি, আপনারা তা বিশ্বাস করেন না। আমি আমার কাজ করে যাব, কে কি বলে না বলে, তাতে আমার কিছু আসে যায় না।

নিজের সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য ব্রিটেন যদি রাশিয়া এবং আমেরিকার দ্বারস্থ হতে লজ্জা না পায় তাহলে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অন্য কোন জাতির সাহায্য প্রার্থী হওয়া অন্যায়ও নয়, অপরাধও হতে পারে না।

আপনারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে প্রস্তুত থাকুন। যে সুযোগ আসছে, তাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে অবিলম্বে সবাই সংঘ-বদ্ধ হোন। ঐক্য ও একাগ্রতা।. জয়হিন্দ্।

॥ ৯ ॥

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মানী, ইতালী এবং জাপানের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। ত্রিশক্তি জোটের সদস্য হলেও জাপান যুদ্ধ থেকে দূরে ছিল। কয়েক বছর ধরে চীনের বিরুদ্ধে এক অঘোষিত সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকায়, জাপানের পক্ষে আর একটি বড় রকমের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাটা ছিল বিতর্ক-মূলক। কিন্তু সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটল ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর, যখন বিশ্ববাসী শুনল, জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং তড়িৎগতি আক্রমণে হাওয়াই দ্বীপের পার্ল হারবারে অবস্থিত মার্কিন নৌ-বহরের গুরুতর ক্ষতি-সাধন করেছে।

বিগত অর্দ্ধশতাব্দী কাল জাপান ব্রিটেনের মিত্ররাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে এসেছে। পূর্ব গোলার্দ্ধে রাশিয়া ও আমেরিকার প্রতিপত্তি বিস্তারের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টির প্রয়োজনে ব্রিটেনও জাপানের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। যুদ্ধ পরিস্থিতি সেই রাজনৈতিক সম্পর্কে ছেদ ঘটাল। শিল্পোন্নত এবং উচ্চ সামরিক শক্তি সম্পন্ন জাপান চাইত পূর্ব এশিয়া ও চীন থেকে মার্কিন এবং পশ্চিম রাষ্ট্র গুলির ঔপনিবেশিক অধিকার বিলোপ করে, তার স্থলে, স্বীয় সার্বভৌমত্ব স্থাপন। আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির দারুণ সংকট জাপান তার সেই অভীষ্ট পূরণের মহাসুযোগ বলে গ্রহণ করল।

পার্ল হারবার বিপর্যয় অন্যদিকে আমেরিকাবাসীকে রোষ ক্ষুব্ধ করল, যুক্তরাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গে জাপান, জার্মানী ও ইতালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। বিরাট এক সুপ্ত শক্তি জেগে উঠল যা সমগ্র যুদ্ধ-পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটাল। প্রত্যুত্তর দিতে হল জার্মানীকে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ডাচ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যাণ্ড ত্রিশক্তি জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ১৯৪০ সালে ব্রিটেন যে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়েছিল তা থেকে সে উদ্ধার পেল। তবে পরিস্থিতি অনুকুল হতে সময়ের প্রয়োজন ছিল।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে জাপান সমগ্র পূর্ব এশিয়ার ব্রিটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও মার্কিন অধিকারভুক্ত দেশগুলি অধিকার করে ফেলল। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের পতন হল। জাপানের হাতে বন্দী হল ৭০ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য, তাদের মধ্যে ৪৫ হাজার ছিল ভারতীয় সৈন্য, বাদবাকী ইংরাজ ও অস্ট্রেলীয়। বহু অস্ত্রশস্ত্র ও মজুদ খাদ্যও জাপানের হাতে পড়ল। ওলন্দাজ অধিকারভুক্ত পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ যার বর্তমান নাম ইন্দোনেশিয়া জাপানের অধিকারে গেল। বার্মাতেও ব্রিটিশ বাহিনী পরাজয় এড়াতে পারল না, ৮ই মার্চ বার্মার রাজধানী রেঙ্গুন হাতছাড়া হল, বন্দী হল বেশ কয়েক হাজার ব্রিটিশ সৈন্য যাদের অধিকাংশই ছিল ভারতীয়। ১১ই মে বার্মার ইংরাজ গভর্নর ভারতে চলে এলেন, বার্মার উপর জাপ-অধিকার বিস্তৃত হল। জাপানের সৈন্য বাহিনী ভারতের পূর্ব দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়াল।

জাপানের বিস্ময়কর সামরিক জয়ের কারণ ছিল তার উন্নত বিমান শক্তি, রণকৌশল এবং জাপ সৈন্যদের কষ্টসহন ক্ষমতা। তা ছাড়া জাপানের সহায় হয়েছিল স্থানীয় অধিবাসীদের সাম্রাজ্য বিরোধী মনোভাব। জাপান তার যুদ্ধের উদ্দেশ্য ঘোষণায় বলেছিল 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য।' অনেক ক্ষেত্রে সেই কারণে অভি-

যাত্রী জাপ বাহিনীকে স্থানীয় নরনারী মুক্তিদাতারূপে স্বাগত জানিয়ে ছিল। জাপানও অধিকৃত দেশগুলিতে অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠনে আগ্রহী হওয়ায়, পূর্ব-এশিয়া বাসীদের দৃষ্টিতে জাপানের ভাব-মূর্তি অম্লান ছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল ত্রিশ লক্ষের মতো। চাকুরী, ব্যবসা, কৃষি ও রবার বাগিচার কাজ ছিল তাদের উপজীবিকা। বহুকাল এ অঞ্চলের বাসিন্দা হলেও স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত তাদের সংমিশ্রন ঘটে নি। এই সকল ভারতীয় বংশোদ্ভবগণ নিজস্ব ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতেন। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলে তাঁরা তাঁদের পেশাগত স্বার্থ ও ধনপ্রাণ রক্ষার প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ হতে অভিলাষী হলেন।

এই সময় মালয়ে জ্ঞানী প্রীতম সিং নামে একজন সাধুব্যক্তি বাস করতেন। মালয়ের বন্দী শিবির থেকে যুদ্ধবন্দী ক্যাপ্টেন মোহন সিং মাঝে মাঝে সাধুর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে জ্ঞানী প্রীতম সিং ক্যাপ্টেন মোহন সিংকে বন্দী ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য একটি মুক্তি ফৌজ গঠনের পরামর্শ দিলেন। সাধুর প্রস্তাব মোহন সিং-এর হৃদয় স্পর্শ করল। তিনি মুক্তিফৌজ গঠনে কৃতযত্ন হলেন।

মোহন সিং-এর প্রস্তাব জাপ-সরকার অনুমোদন করলেন এবং বন্দী ভারতীয় সৈনিকদের ভার ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর উপর ছেড়ে দেবার জন্য মেজর ফুজিয়ারাকে নির্দেশ দিলেন। স্থির হল মুক্তি ফৌজ জাপ-সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একত্রে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটাবে। মোহন সিং তখন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর আহ্বানে বন্দীদের অনেকে প্রস্তাবিত মুক্তি ফৌজে যোগ দিলেন, আবার অনেকে যোগদানে অস্বীকার করলেন।

ভারতের এককালের বিপ্লবী নায়ক শ্রীরাসবিহারী বসু জাপানে

প্রবাস জীবন অতিবাহিত করছিলেন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-বাসী ভারতীয়দের ইচ্ছা এবং মোহন সিং-এর মুক্তি ফৌজ গঠনের প্রয়াসকে সুসংহত করে যুদ্ধকালীন সুযোগে মুক্তিসংগ্রাম রচনায় উদ্যোগী হলেন।

দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ এবং ১৯১৫ সালের বিখ্যাত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে শ্রীরাসবিহারী বসুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হলে, তিনি ছদ্মবেশে ভারত-বর্ষ ত্যাগ করে জাপানে চলে যান এবং জাপানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে টোকিও শহরে বাস করেন।

১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ শ্রীরাসবিহারী বসু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম গঠন কল্পে টোকিও শহরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়দের এক সম্মেলন আহ্বান করলেন। সম্মেলনে ক্যাপ্টেন মোহন সিং উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং পূর্ব এশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতিনিধিদের নিয়ে অস্থায়ী ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। সম্মেলনে আরও স্থির হল, জুন মাসে ব্যাংককে এ সম্বন্ধে অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের ভার ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর উপরে ন্যস্ত হল। সম্মেলন থেকে ফিরে মোহন সিং বন্দী ভারতীয় বাহিনীর অফিসারদের এক সভা ডাকলেন। অফিসারগণ আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন সম্পর্কে একমত হতে পারলেন না।

টোকিও সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৭২ সালের ১৫ই থেকে ২৩শে জুন, নয়দিন ব্যাপী দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ব্যাংককের শিলা প্যাকর্ন হলে। সম্মেলনের উদ্‌বোধন করলেন থাইল্যাণ্ডের সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীবিচিত্র বদকর্ণ। বার্মা, মালয়, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন, জাপান, চীন, বোর্নিও, জাভা, সুমাত্রা, হংকং

এবং আন্দামান থেকে প্রবাসী ভারতীয়দের শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিলেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জাপান, জার্মানী ও ইতালীর রাষ্ট্রদূতগণ। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী পাঠিয়েছিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারল তোজো, থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল পিবুল সংগ্রাম এবং জার্মানী থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং কিছু সংখ্যক বন্দী ভারতীয় সামরিক অফিসার সম্মেলনে ব্রিটিশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রত্যাহার এবং সর্বান্তঃকরণে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন।

পূর্ব এশিয়া থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স লীগকে স্বীকৃতি দান এবং ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর অধিনায়কত্বে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্য ও প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ দ্বারা একটি সশস্ত্র সেনাদল গঠনের সিদ্ধান্ত সম্মেলনে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে গৃহীত হল।

ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের কাজ পরিচালনার জন্য শ্রীরাস-বিহারী বসুকে সভাপতি, শ্রীএন রাঘবন, শ্রী কে. পি. কে মেনন, লেঃ কর্ণেল গিলানী ও ক্যাপ্টেন মোহন সিং-কে সদস্য করে একটি কাউনসিল অব অ্যাকশন গঠিত হল।

অপর একটি প্রস্তাবে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে পূর্ব এশিয়ায় এসে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান হল এবং নেতাজী যাতে সত্বর জার্মানী হতে পূর্ব এশিয়ায় আসতে পারেন তার ব্যবস্থা করার জন্য জাপ-সরকারকে অনুরোধ করা হল।

এই ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠান বিপ্লবী নায়ক শ্রীরাসবিহারী বসুর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর স্মরণীয় অবদানরূপে চিরদিন চিহ্নিত থাকবে।

বিপুল উৎসাহ নিয়ে কাজ আরম্ভ হলেও মাস কয়েকের মধ্যে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল, যার ফলে ক্যাপ্টেন মোহন সিং কারারুদ্ধ হলেন এবং কাউনসিল অব অ্যাকশনের অপর দুজন সদস্য পদত্যাগ করলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হল।

ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের অন্তর্গত আজাদ হিন্দ দলের সম্পাদক শ্রী এন. সেনগুপ্ত 'Netaji in East Asia' প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করেছেন। প্রবন্ধটি শ্রীরাম শর্মা সম্পাদিত 'Netaji His life and Work' গ্রন্থের অংশবিশেষ। প্রবন্ধ থেকে সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হল।

> After the Tokyo and Bankok Conferences held in 1942, the work of the organisation of the Indian Independence League and of the Indian National Army went on in earnest all over East Asia with the main object of attaining independence of India.
>
> But before much headway could be made, the organisation experienced a great setback towards the end of the year and a sense of frustration began to creep in. The colossal task became increasingly too baffling for the regional leadership. There was no question about the burning patriotism and sincerety of purpose of the historic personage, Shri Rash Behari Bose, whose monumental efforts, despite poor health and advanced age, could not but compel our admiration and respect. Having

been in exile from India for such a length of time, he was naturally out of touch with the country and failed to appreciate the psychology of the present generation. This stood in the way of his becoming an effective leader in that crisis of Asian history. As soon as he realised this, Shri Rash Behari Bose, however, arranged to transfer the leadership to the younger and more capable hands of an all India figure like Netaji Subhas Chandra Bose who was then in Berlin.

জাপান কর্তৃক সম্ভাব্য ভারত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের সহিত বিরোধ মীমাংসার প্রয়োজন অনুভব করলেন। সামরিক প্রস্তুতি গণ-সহযোগিতা ছাড়া যে খুব কার্যকর হয় না এ সত্য তারা পূর্ব এশিয়ার বিপর্যয়ে ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। আর দেশে কংগ্রেসই ছিল একমাত্র রাজনৈতিক দল যার পক্ষে আবশ্যক গণ প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব ছিল। তা ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের মত পরিবর্তনের পিছনে ছিল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং জাতীয়তাবাদী চীনের নেতা চিয়াং কাইশেকের পরামর্শের প্রভাব।

ভারতের নেতৃবৃন্দের সহিত আপোস-আলোচনার উদ্দেশ্যে ১৯৪২ সালের মার্চে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস নয়া দিল্লী এলেন। ক্রীপস সাহেব কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহিত কথাবার্তা শুরু করলেন। কংগ্রেস নেতাদের সহিত ক্রীপসের আলোচনা চলাকালে বার্লিন বেতার কেন্দ্র থেকে নেতাজী দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন :

আমার ভাই বোনেরা, ব্রিটিশ মিশন আপনারা

প্রত্যাখ্যান করুন। ভারত সম্বন্ধে তাদের সদিচ্ছা প্রমাণ করবার জন্য ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে আমরা অবিরাম আবেদন জানিয়ে এসেছি। কিন্তু লাভ কিছুই হয় নি। বিশ্বাসহীন মিথ্যা এবং চাতুর্য ছাড়া আর কিছুই আমরা পাই নি আমাদের আবেদনের উত্তরে।

আজ ব্রিটিশ প্রচারক দল ভারতবাসীকে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে শত্রুর আসন্ন আক্রমণ আশঙ্কায় ভারতবর্ষ বিপন্ন। তার জন্যই ভারতবাসীকে এখন অপরিমিত রক্ত, শ্রম ও অশ্রু দিতে বলা হয়েছে।

কিন্তু আমি বলছি যে, ভারত-সীমান্তের বাইরে আমাদের কোন সত্যিকারের শত্রু নেই। আসল শত্রু আমাদের ঘরেই।

জার্মানী, জাপান বা ইতালী—ভারতের বিপদের কারণ হবে এর চাইতে বড় মিথ্যে আর কিছুই নেই। আমি তাদের যতটুকু চিনি তাতে আমি জোরের সঙ্গে একথা বলতে পারি যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ছাড়া আমাদের সম্বন্ধে আর কোন ধারণাই ওরা পোষণ করে না।

আজ আমাদের আনন্দের দিন যে, ত্রি-শক্তির প্রচণ্ড আঘাতে আমাদের চিরকালের শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। আজ আমাদের আনন্দের দিন যে সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্তম্ভ চোখের সামনে খসে ধ্বসে পড়ছে।

আজ আনন্দের দিন, কারণ আজ নতুন দিনের শুরু—যে-দিন শৌর্য ও বীর্য দিয়ে অর্জিত হবে ভারতের স্বাধীনতা। ভারতের ন্যায্য অধিকার। ভারতের সুখ ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি। জয় হিন্দ্।

ক্রীপস মিশন গান্ধীজীর অনমনীয় মনোভাবের ফলে ব্যর্থ হল। গান্ধীজী বললেন, শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে, তা হলেই যুদ্ধ

প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের আত্মনিয়োগ সম্ভবপর। অপর পক্ষে ক্রীপস বললেন, তোমাদের দাবি ব্রিটিশ সরকার মেনে নিচ্ছে। তবে ক্ষমতা হস্তান্তরটা হবে যুদ্ধ জয়ের পরে, কারণ ভারতবর্ষ এখন গুরুতর বিপদের মুখে, এ সময়ে শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করবে।

ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, গান্ধীজী প্রস্তাবকে তাঁর বিশেষ বাচন ভঙ্গিতে বললেন – "A post-dated cheque on a crashing bank."

ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা, ভারতের শাসন ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে ছেড়ে দেবার পর, তার যুদ্ধায়োজনের কি সার্থকতা থাকতে পারে। কাজেই ক্রীপসের পক্ষে গান্ধীজীর প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। গান্ধীজীও যুদ্ধ পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিতে তখন কৃতসংকল্প। তাঁর কথায় সুভাষ চন্দ্রের কথার প্রতিধ্বনি।

ক্রীপস দৌত্য নিষ্ফল হবার পর নেতাজী বার্লিনের আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র থেকে স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে বললেন :

> প্রিয় ভাই বোনেরা, ক্রীপস প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।
>
> এখনো আমাদের দেশের কোন কোন লোক আছেন, যাঁরা নিজেদের কংগ্রেসী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, অথচ বিনাশর্তে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলতে তাঁদের এতটুকু বাধে না।
>
> এই সমস্ত ব্যক্তিদের স্মৃতিশক্তি কি এতই কম যে, কংগ্রেসের আদর্শের কথা তাঁরা ভুলে গেছেন ?
>
> কি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত হরিপুরা কংগ্রেসে ? যুদ্ধে অসহযোগিতার প্রস্তাবই কি

সেদিন গৃহীত হয় নি? এমন কথাও কি বলা হয় নি যে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়াতে চাইলে আমরা সব শক্তি দিয়ে তাকে প্রতিরোধ করব?

এম. এন. রায়ের মতো খ্যাতিমান নেতা যুদ্ধে সহযোগিতার কথা বলেছিলেন বলে ইতিপূর্বে তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ যাঁরা কংগ্রেসের নীতি অমান্য করে সহযোগিতার কথা বলছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তা নিশ্চয়ই আমরা জানতে চাইব।

ভারতের সব চাইতে বড় শক্তি—যুব সম্প্রদায়। তাদের এখন একমাত্র কর্তব্য, বর্তমানের এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নেওয়া, যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ওপর নতুন এক স্বাধীন ভারত গড়ে উঠতে পারে। * * *

আমি অক্ষশক্তির সমর্থক নই। তাদের সমর্থন করা আমার পেশা নয়। আজকের দিনে যে-কোন চিন্তাশীল মানুষের কাছে একথা স্পষ্ট যে, ভারতবর্ষের সত্যিকার শত্রু শুধু একটিই। সে শত্রু হল—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ।

দুটি মাত্র পথ আমাদের সামনে খোলা রয়েছে। হয় স্বাধীনতা, নয় চির দাসত্ব। এর একটা আমাদের বেছে নিতেই হবে। জয় হিন্দ্।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মতে ব্রিটিশের যুদ্ধ ছিল প্রথমে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। ১৯৪১ সালে ব্রিটেনের সহিত রাশিয়ার মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন এবং ব্রিটিশ পক্ষে রাশিয়ার যুদ্ধে যোগদানের পর, কমিউনিস্ট পার্টির মত পরিবর্তিত হল। যেহেতু জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ছিল জনগণের যুদ্ধ, সেই হেতু রাশিয়ার মিত্র ব্রিটিশের যুদ্ধও জনযুদ্ধ বলে অভিহিত হল। কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সহযোগিতা এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিকেও সমর্থন

করলেন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অভিমত অনুযায়ী হয়ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর নীতি স্থির করলেন।

১৯৪২ সালের ৫ই জুলাই ওয়ার্দায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সরকারের নীরব উপেক্ষার প্রতিকারকল্পে একটি আন্দোলন আরম্ভের বিষয় আলোচনা কালে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বললেন, সম্ভাব্য জাপ-আক্রমণের মুখে কংগ্রেসের সংগ্রাম শুরু করা সঙ্গত হবে না। এই সংগ্রাম কার্যতঃ ত্রি-শক্তি জোটের অনুকূলে যাবে এবং জাপান সেই সুযোগে ভারত আক্রমণ করতে পারে।

মহাত্মা গান্ধী পণ্ডিত নেহেরুর যুক্তির উত্তরে বললেন, জাপান যে ভারত আক্রমণ করবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। জাপান আমাদের শত্রু নয়, ব্রিটিশের শত্রু। জাপানীরা যদি ভারতে প্রবেশ করে তবে তা করবে ব্রিটিশের জন্য, আমাদের জন্য নয়।

গান্ধীজী তাঁর অভিমত একটি পত্রে বিবৃত করে সহকর্মীদের জানালেন। পত্রে তিনি লিখলেন—

> তোমরা আমার সঙ্গে না এলে আমাকে একলাই চলতে হবে। যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আমাকে বাধা দেয়, এমন কি সারা ভারতবর্ষ যদি আমি ভুল করছি বলে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে, তথাপি আমি এগিয়ে যাব, এগিয়ে যাব শুধু ভারতের জন্য নয়, বিশ্ব কল্যাণের উদ্দেশ্যে।
>
> আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আর প্রতীক্ষা করতে পারি নে। মিঃ জিন্নার মত পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে থাকাও আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি যদি আরো কালক্ষেপ করি, ঈশ্বরের নিকট আমি শাস্তিভাগী হব। এই সংগ্রাম হবে আমার জীবনের শেষ সংগ্রাম।

গান্ধীজীর উক্তির জবাবে ভারত সচিব মিঃ এমেরি বললেন, মিঃ গান্ধীর সংকল্পিত আন্দোলন অতিশয় অবিবেচনা প্রসূত। ভারত সরকার কঠোর হস্তে আন্দোলন দমন করবে।

গান্ধীজী দৃঢ়তার সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্যে পুনরায় বললেন, ভারতবর্ষে যে যুদ্ধায়োজন চলছে তা নিছক সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে। এই কারণে সমরোদ্যোগের পিছনে আমার নৈতিক সমর্থন নেই। ভারতে ব্রিটেনের উপস্থিতিই জাপানকে ভারত আক্রমণে প্ররোচিত করছে। ইংরাজ ভারত ছেড়ে চলে গেলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ তাদের নিজেদের স্বার্থে দেশের শাসন সম্পর্কে একটা মীমাংসায় যে পৌঁছাতে পারবে সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।

গান্ধীজীর মত পরিবর্তনে কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই বিস্ময় বোধ করলেন। তাঁদের মনে এ চিন্তাও উদিত হল—গান্ধীজী কি সুভাষচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হলেন?

এ সম্বন্ধে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর আত্মজীবনী 'India wins Freedom' গ্রন্থে লিখেছেন:

> I also saw that Subhas Bose's escape to Germany made a great impression on Gandhiji *** and now I found a change in his out look.

১৯৪২ সালের ৭ই ও ৮ই আগস্ট দুদিন ব্যাপী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল বোম্বাই-এ। দীর্ঘ আলোচনার পর 'ইংরাজ, ভারত ছাড়' ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। প্রস্তাবে বলা হল:

> ভারতের স্বাধীনতা লাভ ঘটলে সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের মন আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হবে। এই কারণে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে আফ্রিকা ও এশিয়ার পরিবেশের সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে যুক্ত—এই ভাবনা ক্রমশঃই ভারতীয়দের মনে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির উপরই মহাযুদ্ধের ভবিষ্যৎ এবং গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করছে।

প্রস্তাবে আরও বলা হল যে, জনসাধারণ যেন ধৈর্য ও সাহসের সহিত বিপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হয়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে মুক্তি সংগ্রামে অনুগত সৈন্যের ন্যায় তাঁর আদেশ মেনে চলে। তারা যেন মনে রাখে অহিংসাই এই আন্দোলনের ভিত্তি।

এমন সময় আসতে পারে যখন কংগ্রেস কমিটির অস্তিত্বই হয়ত থাকবে না, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি কংগ্রেসের স্বীকৃত নীতি লঙ্ঘন না করে নিজেরাই কাজ করবেন। স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ভারতবাসী সংগ্রাম কালে নিজেই নিজের পথ প্রদর্শক হবেন। দেশের মন্ত্র হল—'Do or die', কর না হয় মর। ইহা যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর মাত্র। অহিংসা এই যুদ্ধের অস্ত্র।

মহাত্মাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করার সুযোগ দেওয়া হল না। সংগ্রামের কর্মপন্থা ঘোষণার সময়ও তিনি পেলেন না। ৯ই আগস্ট সূর্যোদয়ের পূর্বেই গান্ধীজী ও কংগ্রেসের প্রধান নেতাদের ভারত রক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার করা হল। সুতরাং গান্ধীজী তাঁর শেষ সংগ্রাম করতে পারলেন না।

সংগ্রামের জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতি এবং পরিচালন-নেতৃত্বের অভাব সত্ত্বেও কংগ্রেস কর্মিগণ আন্দোলন আরম্ভ করলেন। কংগ্রেস স্যোসালিস্ট দল ও ফরোয়ার্ড ব্লক আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা নিলেন। ইতিপূর্বে কংগ্রেস বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়েছিল, সুতরাং আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেসের কোন দায়িত্ব রইল না। কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি অনুসারেও সংগ্রাম হল না।

আন্দোলনে নির্যাতন বরণ করে অত্যাচারী শাসকের মনের পরিবর্তন সাধনের গান্ধীনীতির স্থান ছিল না। অহিংস পন্থাও সর্বক্ষেত্রে অনুসৃত হল না। থানা আক্রমণ, আদালত ভবন দখল, রেলপথ ধ্বংস, সেতু উড়িয়ে দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা, টেলিগ্রাফ-পোস্টাফিসে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ছিল সংগ্রামের কর্মসূচী।

অল্পদিনের মধ্যে আন্দোলন দেশের সর্বত্র বিস্তৃত হল এবং আন্দোলন গণবিদ্রোহের রূপ নিল।

বিদ্রোহ দমনে সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। পুলিশের সাহায্যে সেনাবাহিনী এল, কোথাও বিমান থেকে বোমা বর্ষিত হল, লাঠি ও গুলীচালনা হামেশাই চলল। তার সঙ্গে জেল, জরিমানা, বিনাবিচারে আটক, গৃহদাহ, নারীর শ্লীলতাহানি প্রভৃতি দমনমূলক অনাচার চলতে লাগল।

গুলীতে প্রাণ দিলেন সহস্রাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামী, আহত হলেন তার চেয়ে অনেক বেশি। ধ্বংসাত্মক কাজের অভিযোগে যাঁরা ধরা পড়লেন তাঁদের স্পেশাল আদালতে বিচার করে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল। জনতার আক্রমণে শতাধিক পুলিশকর্মীও নিহত হলেন।

আগস্ট বিদ্রোহ বেশিদিন স্থায়ী হল না। এক বৎসরের মধ্যেই সরকার বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হলেন। আগস্ট বিদ্রোহের ব্যর্থ পরিণতি আর একবার প্রমাণ করল যে, নিরস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন সম্ভব নয়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে বলেছিলেন: "নেতা নেই, সংগঠন নেই, উদ্যোগ আয়োজন নেই, কোন মন্ত্রবল নেই অথচ একটা অসহায় জাতি আপনা হইতে কর্ম-প্রচেষ্টার অন্য কোন পথ না পাইয়া বিদ্রোহী হইল—এ দৃশ্য প্রকৃতই বিপুল বিস্ময়ের ব্যাপার।"

ভাবুকতা পরিহার করে একটু তলিয়ে দেখলেই পণ্ডিত নেহেরু আগস্ট বিদ্রোহের অপ্রত্যক্ষ নায়ককে খুঁজে পেতেন।

কংগ্রেস নেতা ডঃ বি. কে. কেশকর এ সম্পর্কে লিখেছেন:

> Subhas Babu has been fighting in the Congress all along for a more aggressive and realistic strategy in our national struggle. He, with other radicals and socialists, had

been maintaining all along that it was during the war that we could fight the British Government. We must try to take advantage of the difficulties of Great Britain and if we lost this opportunity we might not get any for a long time to come. So, in fact, this revolutionary change in the mind of Gandhiji, which ultimately led to the movement of 1942, is a triumph of Subhas Babu and other radicals.

—Netaji His Life and Work.

॥ ১০ ॥

নেতাজীর প্রথম পরিকল্পনা ছিল জার্মানী উত্তর আফ্রিকা অধিকার করে পশ্চিম এশিয়ায় প্রবেশ করলে, জার্মানীর সহায়তায় তিনি ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত পথে মুক্তি অভিযান পরিচালনা করবেন। জার্মানীর উত্তর আফ্রিকা অভিযান পরিত্যক্ত হওয়ায়, সেই পরিকল্পনা তাঁকে বাতিল করতে হয়। তখন তাঁর আশা ছিল জার্মানী স্তালিনগ্রাড দখল করে রাশিয়ার পূর্ব সীমান্তে উপস্থিত হলে, পূর্ব পরিকল্পনামত অভিযান বাস্তবায়িত করার সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশের অভাবনীয় পরাজয় এবং ভারতের পূর্ব সীমান্তে জাপানের উপস্থিতিতে নেতাজীর চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটল। তিনি ১৯৪২ সালের ২২শে মে জার্মান সরকারকে লিখলেন :

> দূর প্রাচ্যের ঘটনাবলী সবই অবগত আছেন। জাপান ভারতের পূর্ব সীমান্তে উপস্থিত। ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে এই তার অপূর্ব সুযোগ। এই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করা আমার পক্ষে আমি কর্তব্য বলে মনে করি।
>
> এ সময় দূর প্রাচ্যে যাওয়া আমার একান্ত প্রয়োজন। আশা করি ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমাকে সেখানে যাবার সুব্যবস্থা করে দিয়ে বাধিত করবেন, যাতে একজন

জাতীয় নেতা হিসাবে স্বদেশের প্রতি আমার কর্তব্য আমি যথাযথভাবে পালন করতে পারি।

পত্রের উত্তরের অপেক্ষা না করে, ২৮শে মে নেতাজী জার্মান রাষ্ট্রনায়ক হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করে তাঁর পূর্ব এশিয়ায় গমনের বিষয়টি হিটলারের নিকট উত্থাপন করলেন। সাক্ষাতের সময় জার্মান পররাষ্ট্র সচিব রিবেনট্রপ, এস. এস. বাহিনীর প্রধান হিমলার, স্বরাষ্ট্র সচিব কেপলার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দো-ভাষীর কাজ করলেন ভন ট্রট।

সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব সম্পর্কে জার্মানীর পক্ষ থেকে কোন আপত্তি উঠল না। সমস্যা দেখা দিল তাঁর পূর্ব-এশিয়া গমনের ব্যবস্থা নিয়ে। জলে স্থলে আকাশে যুদ্ধ চলেছে পৃথিবী জুড়ে। এ অবস্থায় নিরাপদ যাত্রার কি ব্যবস্থা হতে পারে? জার্মানী বা জাপান কেউই বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজী হল না।

এই সময় ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের আমন্ত্রণ নেতাজীর কাছে পৌঁছাল। পূর্ব-এশিয়া গমনের জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

অন্যদিকে, যুদ্ধে এতদিন জার্মানীর যে অনুকুল অবস্থা ছিল-তার তখন দ্রুত অবনতি ঘটতে লেগেছে। ১৯৪২-এর নভেম্বরে পাঁচশত জাহাজভর্তি সৈন্য, তিন শত যুদ্ধ জাহাজ এবং বিশাল বিমান বহরে সজ্জিত হয়ে, মার্কিন সেনাপতি আইসেনহাওয়ার উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়ায় নেমেছেন।

স্তালিনগ্রাডে চলেছে তুমুল যুদ্ধ। রাশিয়া সর্বশক্তি নিয়োগ করে স্তালিনগ্রাডে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পথে ব্রিটিশ রণসম্ভার ও খাদ্য পাঠাচ্ছে রাশিয়ার সাহায্যে। জার্মানী কিছুতেই পারল না রুশ প্রতিরোধ ভাঙ্গতে। দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনীর আক্রমণ এই সর্বপ্রথম প্রতিহত হল স্তালিনগ্রাডে।

নেতাজীর উৎকণ্ঠা বেড়ে যেতে লাগল। বার বার তিনি

জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগ ও বার্লিনের জাপ-দূতাবাসকে তাঁর প্রস্তাবের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিলেন কিন্তু উত্তর সেই একই—পথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল।

১৯৪২ সালের ৫ই ডিসেম্বর নেতাজী পুনরায় জার্মান সরকারকে লিখলেন :

> আমি বিশ্বাস করি, সাবমেরিন, বিমান অথবা জাহাজে আমার দূর প্রাচ্যে যাবার ব্যবস্থা করা এখনও সম্ভব। একাজে যথেষ্ট ঝুঁকি আছে তা আমি জানি। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এবং আনন্দের সঙ্গে সেই ঝুঁকি আমি মেনে নেব। আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি। আমি জানি যে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হবেই।
>
> যত রকম বিপদ, যত রকম ঝুঁকি বা যত অসুবিধাই থাকুক না কেন, এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। যত তাড়াতাড়ি যেতে পারব, ততই ভারতের এবং আমাদের সবার মঙ্গল।

জার্মানী ও জাপানের পররাষ্ট্র বিভাগ শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের পূর্ব-এশিয়া গমনের ব্যবস্থা করলেন। জার্মানীতে অবস্থিত আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সংঘের ভার সহকারী অধিনায়ক শ্রীনাম্বিয়ারের উপর ন্যস্ত করে, ১৯৪৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্র জার্মানীর কিয়েল বন্দর থেকে সাবমেরিনে পূর্ব-এশিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গী একমাত্র আবিদ হাসান, নেতাজীর অ্যাডজুট্যান্ট। কিয়েল বন্দরে নেতাজীকে বিদায় অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন জার্মান স্বরাষ্ট্র সচিব কেপলার, পররাষ্ট্র দপ্তরের আলেকজাণ্ডার ওয়র্থ এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের শ্রীনাম্বিয়ার। বার্লিন থেকে কিয়েল বন্দর পর্যন্ত রেলপথে ভ্রমণ কালে জার্মান সরকার নেতাজীর স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার ত্রুটিহীন ব্যবস্থা করেছিলেন।

জার্মানীর অচিন্তনীয় দুঃসময়ে হের হিটলার নেতাজীর জন্য একটি সাবমেরিন জুগিয়ে তাঁকে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবার যে ব্যবস্থা করলেন তাতে সুভাষচন্দ্রের প্রতি হিটলারের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়।

হিটলার বহু বিতর্কিত অসাধারণ পুরুষ। মত ও পথের জন্য বিগত জীবন এই রাষ্ট্রনায়ক কম নিন্দাভাগী হন নি। কিন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর সৌজন্যমূলক আচরণ, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের পোষকতা এবং নেতাজীর জন্য সাবমেরিন সরবরাহ ভারতবাসী কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করবে এবং জার্মান জাতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবে।

হিটলার তাঁর My struggle গ্রন্থে লিখেছেন :

> I can fight only for what I love, love only what I respect and respect only what I, at any rate, know about.

জার্মান ফুরার হের হিটলার সুভাষচন্দ্রকে চিনেছিলেন। আলেকজাণ্ডার ওয়র্থ জার্মানীর পররাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করতেন। জার্মান সরকারের সহিত নেতাজীর সম্পর্ক বিষয়ে তিনি তাঁর 'Netaji in Germany' গ্রন্থে লিখেছেন :

> নেতাজী জার্মান সরকারের নিকট দৃঢ়ভাবে দাবি করেছিলেন যে, তাঁর কাজকর্ম অবাধে চালাতে দিতে হবে, জার্মানী তাঁকে যে অর্থসাহায্য দেবে তা ঋণ হিসাবে স্বীকার করে নিতে হবে, যুদ্ধের পর তিনি সেই ঋণ শোধ করে দেবেন এবং জার্মান পররাষ্ট্র ও সমর বিভাগ তাঁকে যে সকল বিশেষজ্ঞ, অস্ত্র, যান্ত্রিক সাহায্য দেবে তা হবে জার্মান রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণমুক্ত। জার্মানীর পররাষ্ট্র বিভাগ নেতাজীর এই দাবিগুলি মেনে নিয়েছিল।
>
> নেতাজীর অপর কথা ছিল—ভারতবাসী ইংলণ্ড ব্যতীত

জার্মানীর অন্যান্য রাষ্ট্রবিরোধ অথবা তার আভ্যন্তরীণ কলহের সামিল হবে না। জার্মান সরকার নেতাজীর এ প্রস্তাবও স্বীকার করে নিয়েছিল।

বস্তুতঃ মিঃ বসু অথবা আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র ইউরোপ অথবা অন্য কোন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করে নি। জার্মানী তার অপর শত্রু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নেতাজীকে কিছু বলতে অনুরোধও জানায় নি। নাৎসী-দলের নীতি থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল জার্মানীতে ভারতীয়দের কাজ।

জার্মান সরকারের এই মহান স্বীকৃতিদান একমাত্র নেতাজীর অসামান্য ব্যক্তিত্ব প্রভাবেই সম্ভব হয়েছিল, ইতিহাসে যার দৃষ্টান্ত অতীব বিরল।

সাবমেরিন ১/২৯ উত্তর সাগরে পড়ে, শত্রুপক্ষের নজর এড়িয়ে, নরওয়ের কুল ঘেঁষে এগিয়ে চলল। জলের উপর সাবমেরিনের গতিবেগ ঘণ্টায় কুড়ি নটিক্যাল মাইল, জলের নীচে মাত্র দশ মাইল। দীর্ঘ বিপদপূর্ণ পথ, চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে, সাবধানে বিসর্পিল পথে চলতে পথের দূরত্ব বেড়ে গেল। সাবমেরিন কমাণ্ডার হের মুসেমবার্গ তাঁর গুরু দায়িত্ব পালনে সতত সজাগ রইলেন। আর নেতাজী নিশ্চিন্তে তাঁর ক্ষুদ্র কেবিনে বসে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের পরিকল্পনা রচনা করে চললেন এবং মাঝে মাঝে ডিকটেশন দেন অ্যাডজুট্যান্ট তরুণ আবিদ হাসানকে।

সুভাষচন্দ্রের গায়ে জার্মান নৌ-বিভাগের অফিসারের পোশাক, মুখে দাড়ি এবং নির্ভুল জার্মান ভাষায় কথা বলায় তাঁর ছদ্মবেশ ধরা শক্ত ছিল। শত্রুর হাতে পড়লে আত্মপরিচয় গোপনের জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

আটলান্টিকের তলা দিয়ে সাবমেরিন নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যায়। একবার শত্রুপক্ষের হাতে পড়তে পড়তে সে রক্ষা পেয়ে

গেল। ১৯৪৩ সালের ২৬শে এপ্রিল দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে সাবমেরিন ১/২৯ এসে দাঁড়াল ভারত মহাসাগরের পশ্চিম ভাগে মাদাগাস্কার দ্বীপের উপকুলে নির্দিষ্ট বিন্দুতে। সেখানে জলের নীচে অপেক্ষারত ছিল একটি জাপানী সাবমেরিন, ২৮শে এপ্রিল সংকেত বিনিময়ের পর ছুটি সাবমেরিন ভেসে উঠল জলের উপর, রবার বোটের সাহায্যে নেতাজী এবং আবিদ হাসান জার্মান সাবমেরিন ছেড়ে উঠলেন জাপানী সাবমেরিনে। নেতাজী এবার বেশ পরিবর্তন করে সাজলেন জাপ নৌ-অফিসর। বিদায় নিলেন মুসেমবার্গ, কমাণ্ডার ইজু নেতাজীকে নিয়ে ভারত মহাসাগরের নীচে দিয়ে চালিয়ে ছিলেন তার সাবমেরিন পূর্বমুখে। ১৯৪৩ সালের ৬ই মে তিন মাসের বিপদ সংকুল দীর্ঘযাত্রা শেষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র মালয় উপদ্বীপের পেনাং বন্দরে অবতরণ করলেন এবং সেখান থেকে বিমানে ১৬ই মে টোকিও পৌঁছলেন।

নেতাজী কালবিলম্ব না করে কর্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হলেন। জাপানের পররাষ্ট্র ও সামরিক বিভাগের কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁর কথাবার্তা হল। ১০ই জুন তিনি জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর সহিত সাক্ষাৎ করলেন। ১৪ই জুন উভয়ের মধ্যে পুনরায় সাক্ষাৎ হল। বিশদ আলোচনার পর জেনারল তোজো সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবমত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতের মুক্তিসংগ্রাম সংগঠনে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

১৬ই জুন জাপানের পার্লামেন্টের অধিবেশনে এক বিশেষ আমন্ত্রণে সুভাষচন্দ্র উপস্থিত হলেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তোজো ঘোষণা করলেন :

> ভারতবর্ষ যে এখনও ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশে নিষ্পেষিত হচ্ছে এ বিষয় আমাদের ক্ষোভের কারণ হয়ে আছে। ভারতবাসীর মুক্তি সংগ্রামের প্রতি আমরা সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল।

> ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসে আমরা সর্বপ্রকার সহায়তা করতে কৃতসংকল্প। আমাদের বিশ্বাস, সেদিন দূরে নয় যখন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে মুক্ত জীবন ও সমৃদ্ধির আনন্দ উপভোগ করবে।

১৯শে জুন সুভাষচন্দ্র টোকিও সহরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন :

> প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজ সরকারকে বিশ্বাস করে আমরা প্রতারিত হয়েছিলাম। গত বিশ বছর ধরে আমরা সুযোগের প্রতীক্ষা করেছি। আজ সেই সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। এ সুযোগ কোনমতেই আমরা হেলায় হারাতে রাজী নই।
>
> কেবলমাত্র নিজেদের রক্তের বিনিময়েই আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে এবং বহুমূল্যে অর্জিত সেই স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে সব সময়ই আমাদের প্রচুর ত্যাগ ও আত্মদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
>
> এবারের এই যুদ্ধে আমাদের উপযুক্ত ভূমিকা নিতেই হবে। শত্রুর তরবারির জবাব তরবারি দিয়েই দিতে হবে। এতদিনকার নিরস্ত্র সংগ্রামকে সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত করতে হবে।

জাপানের ডোমেই সংবাদ সংস্থা সেইদিনই স্টকহলম থেকে সুভাষচন্দ্রের সাংবাদিক সম্মেলনের খবর প্রকাশ করল। ২০শে জুন জাপানের বিখ্যাত সংবাদপত্র নিচি নিপ্পন সিমবুম লিখল—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক এবং এক সময় কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু কিছুকাল জার্মানীতে থেকে, জাপান ও বৃহত্তর পুর্ব-এশিয়ার সাহায্যে ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ত্বরান্বিত করবার উদ্দেশ্যে এখন পূর্ব এশিয়ায় এসেছেন। গত ১৪ই জুন টোকিও শহরে জাপানের প্রধান মন্ত্রীর সহিত তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে

এবং জাপ সামরিক ও রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে ভারতের মুক্তিসংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা হয়েছে।

বিশ্ববাসী জানল—সুভাষ বোস বার্লিন থেকে টোকিও এসে গেছেন।

২১শে জুন টোকিও বেতারকেন্দ্র থেকে নেতাজী স্বদেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিলেন।

বার্মার মুক্তিসংগ্রামের নেতা ডাঃ বা. ম. সুভাষচন্দ্রের পূর্ব-এশিয়া আগমনের সংবাদে আনন্দিত হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন :

> I **sincerely** congratulate you on your return to the East. Your first statement issued in Tokyo deeply impressed the Indian people here and gave them courage and hope. Both Indian and Burmese people have long awaited this opportunity.
>
> The time has come for us to rise. Burma hereby pledges herself to fight on your side in the event of your fight for the national honour and independence.

টোকিওতে সুভাষচন্দ্র শ্রীরাসবিহারী বসুর সহিত সাক্ষাৎ করলেন। জাপ-সরকারের সহিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্পর্ক নিয়ে ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং শ্রীরাসবিহারী বসুর মতানৈক্যের ফলে মুক্তিবাহিনী গঠনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। ৪০ হাজার বন্দী ভারতীয় সৈন্যের মধ্যে ১৬ হাজারের বেশি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয় নি। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ পূর্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়দের মনে আস্থা সঞ্চারে ব্যর্থ হয়েছিল এবং সেই কারণে অর্থভাণ্ডার গড়াও সম্ভব হয়নি। নেতাজী সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন

এবং ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের প্রধান কেন্দ্র সিঙ্গাপুরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

২২শে জুন ইংলণ্ডের 'লণ্ডন টাইমস' পত্রিকা লিখল :

> Subhas Bose appeared in Tokyo. All the newspapers in the countries under Axis Powers expect a great deal from his forthcoming activities and claim that the plea he made over radio from Tokyo was far more effective than any broad-casts he made from Berlin.
>
> His movement to Tokyo means not only his personal movement but also the fact the centre of the Indian Independence movement has moved from Berlin to Tokyo.
>
> Germany and Italy failed to do much to help the Indian Independence Movement. From now on, they will embark on propaganda emphasizing military aid from Japan.

২রা জুলাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে এলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসর ও স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। বিমান বন্দরের বাইরে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষ থেকে প্রদত্ত গার্ড অব অনার পরিদর্শন কালে সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন :

> ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাবার ক্ষেত্রে এতদিন আমাদের একমাত্র অভাব ছিল একটি সশস্ত্র সেনাদলের। আপনাদের ন্যায় দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা সে অভাব পূর্ণ করেছেন। আসুন আমরা সকলে আত্মদানের

ব্রত নিয়ে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য একসঙ্গে সামনে এগিয়ে যাই।

হঠাৎ এক বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহে গেল উপস্থিত সৈন্য সেনানীদের সারা দেহে। নতুন আশায় ভরে উঠল বুক। তাদের দীপ্ত কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হল -নেতাজী জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ, আমরা প্রস্তুত।

৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুরের ক্যাথে বিল্ডিং হলে পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয় অধিবাসী সমাবেশে বিপুল উদ্দীপনার মাঝে সুভাষচন্দ্র শ্রীরাসবিহারী বসুর নিকট থেকে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। সর্বভারতীয় নেতা সুভাষচন্দ্রের নাম সকলেই জানতেন, তবু শ্রীরাসবিহারী বসু জনসমক্ষে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখিয়ে বললেন, টোকিও যাবার আগে বলেছিলাম আপনাদের জন্য আমি একটি ভাল উপহার আনব। এই আমার সেই উপহার। আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি, নেতাজী বোসের পরিচালনায় ও নেতৃত্বে ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে।

পূর্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়দের সাদর অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ এবং বিদায়ী সভাপতি শ্রীরাসবিহারী বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রায় একঘণ্টাকাল সম্মেলনে বক্তৃতা দিলেন। শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁর প্রতিটি কথা শুনলেন। এক নতুন উৎসাহ ও সঞ্জীবনী ধারায় উদ্দীপিত হল সকলের অন্তর, বিশ্বাস জাগল দ্বিধাগ্রস্ত মনে।

৮ই জুলাই নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করলেন। ফৌজের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন :

> সামরিক নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে নিয়ে, আদর্শের প্রতি গভীর নিষ্ঠা রেখে, এই সংকটময় দিনে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

স্বাধীনতার এই শেষ সংগ্রামে আমাদের অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ক্ষুধার জ্বালা, তৃষ্ণা, অনিদ্রার কষ্ট, দুর্গম পথে অভিযান, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হতে পারে। এসব কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তবে আসবে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

নেতাজী তারপর ঘোষণা করলেন—আমাদের লক্ষ্য হল দিল্লী, দিল্লীর লালকেল্লার উপরে ত্রিবর্ণ পতাকা স্থাপন, আমাদের রণধ্বনি 'চলো দিল্লী'।, দিল্লীর পথ কঠিন বিপদসংকুল, কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এই পথে চলবার সময় আমাদের অনেকের হয়ত মৃত্যু হতে পারে, তবুও এ চলার মাঝে আছে আনন্দ, আছে গৌরব। আমি মিথ্যা সুখের আশ্বাস দেব না আপনাদের, রক্ত, শ্রম ও অশ্রুর কথাই শুধু বলতে পারি। আপনাদের মধ্যে যাঁরা এই দুঃখ ও বিপদ বরণে দ্বিধাচিত্ত তাঁরা ইচ্ছা করলে এখনো বাহিনী থেকে চলে যেতে পারেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা, সর্বস্বদান এবং বিনিময়ে কোন আশা না করে যাঁরা দেশ সেবার জন্য প্রস্তুত, তাঁরাই এই ফৌজের সৈনিক।

একজন সৈনিকও ফৌজ ছেড়ে গেলেন না, যাঁরা এতদিন ফৌজে যোগ দেননি তাঁরাও ফৌজের অন্তর্ভুক্ত হলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ নববলে বলীয়ান হয়ে উঠল, সকল দ্বিধা ও অবিশ্বাসের অবসান ঘটল।

৯ই জুলাই সিঙ্গাপুরে নেতাজী এক জনসভায় ভাষণ দিলেন। অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হল সভায়। সভা স্থলেই মুক্তি সংগ্রামের ভাণ্ডারে কয়েক লক্ষ ডলার সংগৃহীত হল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সিঙ্গাপুরে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি সংগ্রাম নবপ্রাণ পেল। শহরে সর্বত্র শুধু নেতাজীর কথা। স্থানীয় চীনা, মালয়ী এবং ইউরেশিয়ানদের মধ্যেও নেতাজী সম্পর্কে প্রচুর আগ্রহ ও কৌতূহল দেখা দিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজ সুগঠিত হবার পর নেতাজী সুভাষচন্দ্র ফৌজের সর্বাধিনায়ক এবং মেজর জেনারাল ভোঁসলে চীফ অব স্টাফ মনোনীত হলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই বার্মায় ফৌজের নতুন একটি হেড-কোয়ার্টার্স খোলার ব্যবস্থা হল।

১৯৪৩ সালের ১লা আগস্ট বিশেষ আমন্ত্রণে নেতাজী বার্মার স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিতে রেঙ্গুন গেলেন। উৎসব সভায় নেতাজী বক্তৃতা দান কালে বললেন :

> ১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সাল, এই ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে আমি বন্দী ছিলাম। খোলা বাতায়ন পথে আমি প্রায়ই তাকিয়ে থাকতাম বাইরের দিকে। চোখে পড়ত ব্রহ্মের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, ভাবতাম কবে আবার এই পরাধীন ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হবে? আজ সেই স্বাধীনতা বাস্তবে পরিণত হয়েছে।
>
> আপনাদের এই স্বাধীনতা থেকে আমরা দুটো শিক্ষা পেয়েছি। এক—উপযুক্ত সুযোগ এলে তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রহণ করা। দুই—একদিন যে ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে ব্রহ্মদেশ অধিকার করেছিল, আজ সেই ব্রহ্মদেশ হবে ব্রিটিশ অধিকার থেকে ভারতবর্ষকে পুনরুদ্ধার করার ঘাঁটি। ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত বৃহত্তর এশিয়ার স্বাধীনতা কোনদিন পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

অনুষ্ঠান শেষে বার্মার প্রতি ভারতের বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ নেতাজী বার্মার জাতীয় সরকারকে দু লক্ষ টাকা উপহার দিলেন।

সিঙ্গাপুরে ফিরে এসে নেতাজী কর্মব্যস্ততার মাঝে ডুবে গেলেন। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের কাজ কয়েকটি বিভাগের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল। বিভাগগুলি নিজ নিজ দপ্তরের কার্যের জন্য দায়ী থাকল। সামরিক শৃঙ্খলার সহিত প্রস্তুতি পর্বের কাজ এগিয়ে চলল।

পূর্ব-এশিয়ায় ভারতের মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে

নেতাজীর ভূমিকার বিষয়ে ডঃ কে. কে. ঘোষ তাঁর Indian National Army পুস্তকে লিখেছেন :

> When Bose (Netaji) took over its leadership, the army having no high morale, or discipline, was in a very bad shape. But within a short time, the I. N. A. became a real revolutionary force under the new leadership. Its strength increased, its morale rose and its status became that of the army of a Provisional Government.
>
> The leader gave the army a sense of pride, a battle cry and helped it realise for the first time the significance of its revolutionary role.

১৯৪৩ সালে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বেতার মারফত ভারত সরকারকে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের পক্ষ থেকে অনশনক্লিষ্ট দেশবাসীর জন্য খাদ্য সাহায্য পাঠাবার প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবে বলা হয়, প্রথম কিস্তিতে কলিকাতা বন্দরে এক লক্ষ টন চাল পাঠান হবে, পরে প্রয়োজন মতো আরও চাল পাঠান হবে। তবে চাল খালাসের পর জাহাজগুলিকে ফিরে আসতে দিতে হবে, আটক করা চলবে না।

ভারত সরকার নেতাজীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। কারণ দেশে খাদ্যাভাব ছিল না। জাপানের আক্রমণের আশঙ্কায় বাংলাকে খাদ্যশূন্য করে রাখা ছিল যুদ্ধ নীতির অন্যতম অঙ্গ। মনুষ্যসৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষে বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ নরনারী প্রাণ হারাল।

গম্ভীর প্রকৃতি, দৃঢ়তাব্যঞ্জক চেহারার মানুষ সুভাষচন্দ্রের অন্তর ছিল স্নেহ-করুণা ভরপুর, ব্যবহার ছিল অমায়িক, আন্তরিকতার স্পর্শে

মোহময়। বহুবিধ কাজ ও চিন্তা নিয়ে বিব্রত থাকলেও তিনি সহকর্মী ও ফৌজের জওয়ানদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আহার বাসস্থান এবং অসুখের চিকিৎসা সম্পর্কে সর্বদা খোঁজ খবর নিতেন।

সকালে ঘুম থেকে উঠে নেতাজী কিছুক্ষণ গীতাপাঠ করতেন, ৮ টায় স্নান সেরে নিয়ে চা ডিমসিদ্ধ খেয়ে বেরিয়ে পড়তেন। প্রথমে যেতেন ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সদর দপ্তরে, তারপর আজাদ হিন্দ ফৌজের হেড কোয়ার্টার্সে। বাসায় ফিরতেন বেলা ২টায়। দুপুরে তাঁর আহার ছিল ভাত, দাল, দই এবং একটা কলা। কোন দিন তার সঙ্গে এক টুকরো মাছ।

তিনি তাঁর সহকারী, অতিথি, কূটনৈতিক প্রতিনিধি, ব্যক্তিগত সচিব যাঁরা গৃহে উপস্থিত থাকতেন সকলের সঙ্গে এক টেবিলে একত্রে আহার করতেন। আহারের পর তাঁর জন্য বরাদ্দ ছিল এক কাপ কফি। এ সময় নানা প্রসঙ্গে আলোচনা হত, কখনো কখনো আলোচনাকালে নেতাজীর পরিহাসপ্রিয়তাও প্রকাশ পেত। তাঁর বিলাসের মধ্যে ছিল ধূমপান।

দুপুরে তিনি ঘুমাতেন না, বিশ্রামের সময়ও ছিল সামান্য। বিকালে মাঝে মাঝে ব্যাডমিনটন খেলতেন।

তাঁর রাতের খাবার ছিল ঐ একই ধরনের। কোন কোন দিন তিনি দুপুরে ফৌজের জওয়ানদের সহিত একত্রে বসে আহার করতেন। তখন কথাবার্তা চলত অন্তরঙ্গ পরিবেশে, সর্বাধিনায়ক এবং সৈনিকের ব্যবধান চিহ্ন মুছে যেত। নেতাজী হয়ে উঠতেন সবার একান্ত আপনার জন।

সিঙ্গাপুরে আসবার পর প্রথমে একটা ঘরেই নেতাজীর শোবার ব্যবস্থা এবং নিজস্ব অফিস ছিল। এক একদিন সন্ধ্যার পর তিনি স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু ব্রহ্মচারী কৈলাশকে গাড়ী পাঠিয়ে বাসায় নিয়ে আসতেন এবং দীর্ঘ সময় সাধুর সহিত আধ্যাত্মিক আলোচনায় নিরত হতেন। ব্রহ্মচারী কৈলাশ চলে গেলে নেতাজী

একাকী ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকতেন। রাত্রি বেড়ে যেত, ধীরে ধীরে বাইরের জগৎ নিদ্রাস্তব্ধ হত, দক্ষিণের শীতল সমুদ্র সমীর বাতায়ন পথে ভেসে আসত। আত্মসমাহিত নেতাজীকে দেখলে মনে হত তিনি যেন এ জগতের কেউ নন।

বৌদ্ধদের দেশ মালয়ে অনেকে তাঁকে বুদ্ধের ন্যায় মনে করতেন। থাইল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিবুল সংগ্রাম বলেছিলেন, বুদ্ধের পাশে বসাবার মতো একটি মাত্র লোকই তিনি দেখেছেন, তিনি হলেন নেতাজী বসু।

১৯৪৩ সালের ২৫শে আগস্ট ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণের দিন। তাঁর প্রথম নির্দেশনামায় সেদিন তিনি ঘোষণা করলেন :

> ভারতের মুক্তি আন্দোলনে সহায়তা করার জন্য আজ থেকে আমি আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করছি। আজ আমার জীবনের পরম আনন্দ ও গৌরবের দিন। যে কোন ভারতীয়ের কাছেই আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতা হওয়ার চাইতে বেশি সম্মানের আর কিছুই হতে পারে না।
>
> নিজেকে আমি আমার আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর সেবক বলে মনে করি। এই আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার্থে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যাতে প্রত্যেকটি ভারতবাসী আমাকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারে সেই ভাবে আমি আমার কর্তব্য করে যাব।
>
> কেবলমাত্র অকৃত্রিম দেশ প্রীতি, ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতেই আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে উঠতে পারে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদের যে সংগ্রাম করতে হবে তাতে সব চাইতে বড় দায়িত্ব থাকবে আজাদ হিন্দ ফৌজের।
>
> এ কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করতে হলে আমাদের সামনে থাকবে দুটি মাত্র পথ। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দরকার

হলে আমরা প্রাণ দেব, নয়তো বিজয় গৌরবের অধিকারী হব।

যখন আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াব, তখন শত্রুরা যেন মনে করে আমরা একটা দুর্লঙ্ঘ্য চীনের প্রাচীর। আবার যখন মার্চ করে এগিয়ে যাব, তখন স্টীম রোলারের মতই সমস্ত বাধা চূর্ণ করে এগিয়ে যাব।

আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেছে। 'চলো দিল্লী'—এই রণধ্বনি তুলে আমরা যুদ্ধ যাত্রা করে দিই। যেদিন দিল্লীর বড়লাট প্রাসাদে আমাদের জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়বে আর আজাদ হিন্দ ফৌজ লাল কেল্লায় বিজয় উৎসবে মেতে উঠবে সেই দিনই আমাদের এই অভিযান শেষ হবে।

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই ;
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

॥ ১১ ॥

সুভাষচন্দ্র অবিশ্রান্ত কর্ম ব্যস্ততায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন। বহু মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে গেছে। যুদ্ধের অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ইতালী পরাজয়ের মুখে, রাশিয়ায় জার্মান সৈন্য বাহিনী তার পূর্বের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী সর্বত্র প্রতি আক্রমণ শুরু করেছে। যুদ্ধের সুযোগ কাজে লাগাতে গেলে আর বিলম্ব করা চলে না। তাই অভিযানের প্রস্তুতি শেষ করতে নেতাজী তখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

পূর্ব-এশিয়ায় আসন্ন অভিযানের অনুকূলে জনমত সৃষ্টি এবং অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নেতাজী রেঙ্গুন, ব্যাংকক, সাইগন, ম্যানিলা, কুয়ালালামপুর প্রভৃতি স্থানে গেলেন। তাঁর আবেদনে আশাতীত সাড়া মিলল।

১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরের ক্যাথে হলে পূর্ব-এশিয়াবাসীদের প্রতিনিধিবর্গ ও জনসাধারণের উপস্থিতিতে নেতাজী ভারতের অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। অস্থায়ী সরকারের প্রধান রূপে তিনি তাঁর শপথ বাক্যে বললেন :

> ঈশ্বরের নামে, ভারতবর্ষ এবং আমার আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর মুক্তির উদ্দেশ্যে, আমি সুভাষচন্দ্র বসু, এই পবিত্র শপথ করছি যে আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এই সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

> আমি চিরকাল ভারতবর্ষের সেবা করব এবং ভারতের আটত্রিশ কোটি ভাইবোনের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাব। এই হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্তব্য।
>
> স্বাধীনতা লাভের পরেও, ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনে আমার শেষ রক্তবিন্দু দিতে আমি প্রস্তুত থাকব।

তারপর, অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের মন্ত্রিগণ একে একে শপথ বাক্য পাঠ করলেন। তাঁদের শপথ ছিল—

> ভগবানের নামে আমি এই শপথ নিচ্ছি যে ভারতবর্ষ এবং আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর মুক্তির জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতি পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাসী থাকব এবং এই সংগ্রামে আমার সর্বস্ব এমন কি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকব।

অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠিত হল নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে,—

(১) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু : রাষ্ট্র প্রধান, প্রধানমন্ত্রী, সমর ও পররাষ্ট্র সচিব এবং ফৌজের সর্বাধিনায়ক।
(২) ক্যাপ্টেন কুমারী লক্ষ্মী স্বামীনাথন : নারী সংগঠন।
(৩) শ্রী এ. এস. আয়ার : প্রচার
(৪) লে ঃ কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জি : অর্থ
(৫) লে : কর্নেল আজিজ আহম্মদ : সেনা বাহিনীর প্রতিনিধি।
(৬) লে : কর্নেল এন. এস. ভগৎ ”
(৭) লে : কর্নেল জে. কে. ভোঁসলে ”
(৮) লে : কর্নেল গুলজারা সিং ”
(৯) লে : কর্নেল এম. জেড. কিয়ানি ”
(১০) লে : কর্নেল এ. ডি. লোগনাথন ”
(১১) লে : কর্নেল এ. ডি. রাও ”
(১২) লে : কর্নেল ঈশান কাদির ”
(১৩) লে : কর্নেল শাহ নওয়াজ খান ”

(১৪) শ্রী এ. এম. সহায় : সেক্রেটারী।
(১৫) শ্রীরাসবিহারী বসু : প্রধান উপদেষ্টা।
(১৬) ম : করিম গনি : উপদেষ্টা।
(১৭) শ্রীদেবনাথ দাস : ”
(১৮) শ্রী ডি. এম. খান : ”
(১৯) শ্রী এ. ইয়েলাপ্পা : ”
(২০) শ্রী আই. থিবি : ”
(২১) সর্দার ঈশ্বর সিং : ”
(২২) শ্রী এ. এন. সরকার : আইন উপদেষ্টা।

অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারকে প্রথম কূটনৈতিক স্বীকৃতি জানাল জাপান। প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো রাষ্ট্র প্রধান নেতাজীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক অভিনন্দন বার্তায় বললেন :

> ইওর এক্সেলেন্সী, ভারতবর্ষ থেকে দ্রুত ব্রিটিশ আধিপত্যের বিলোপ সাধনকল্পে মাননীয় যে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠার আশা অনেকদিন ধরে পোষণ করে এসেছেন তার বাস্তব রূপায়ণে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। নিপ্পন সরকার আপনার সরকারকে সম্ভবপর সকল সাহায্য দিতে দৃঢ় সংকল্প।

কয়েকদিনের মধ্যে ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, জার্মানী, ইতালী, নানকিং চীন, মাঞ্চুরিয়া এবং ক্রোটিয়া অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারকে কুটনৈতিক স্বীকৃতি দিল।

স্বাধীন রাষ্ট্র মর্যাদা লাভের পর অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

সিঙ্গাপুরের পাডাং ময়দানে আজাদ হিন্দ ফৌজের পঞ্চাশ হাজার দেশপ্রেমিক যোদ্ধার প্যারেডে নেতাজী যুদ্ধ ঘোষণার কথা বললেন। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল উঁচু করে সকল সৈনিক একযোগে ঘোষণার প্রতি সামরিক প্রথায় সমর্থন জানালেন।

নেতাজী ফৌজের উদ্দেশ্যে বললেন :

> ব্রিটিশ সরকার ভাল করেই জানে, আমি যা বলি তা কার্যে পরিণত করার জন্যই বলি। সুতরাং আমি যখন বলছি 'যুদ্ধ', তখন তা হবে সত্যই যুদ্ধ, চূড়ান্ত যুদ্ধ—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ হলেই কেবল সে যুদ্ধের সমাপ্তি।

অর্দ্ধলক্ষ বীরের 'চলো দিল্লী' 'চলো দিল্লী' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস স্পন্দিত হল।

৫ই নভেম্বর টোকিও সহরে জাপ-প্রধানমন্ত্রী তোজোর সভাপতিত্বে বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বিশেষ আমন্ত্রণে সুভাষচন্দ্র পর্যবেক্ষক রূপে সম্মেলনে যোগ দিলেন।

সম্মেলনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন বার্মার প্রধানমন্ত্রী ডঃ বা. ম.। তিনি বললেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছাড়া স্বাধীন বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া পরিকল্পনা সফল হতে পারে না, সুতরাং সকল সদস্য-রাষ্ট্রের উচিত প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান।

প্রধানমন্ত্রী তোজো, নানকিং চীনের প্রেসিডেন্ট ওসিই, মাঞ্চুরিয়ার প্রধান মন্ত্রী চু, ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট লরেল প্রমুখ রাষ্ট্র প্রধানগণ প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

প্রধানমন্ত্রী তোজো জাপ-অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দুটির অধিকার অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের হস্তে সমর্পন করলেন।

নেতাজী দ্বীপপুঞ্জ দুটির অধিকার গ্রহণ করে ইস্তাহার প্রকাশ করলেন এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামীদের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে আন্দামান ও নিকোবরের নতুন নাম দিলেন শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ।

৭ই নভেম্বর টোকিওর হিবিয়া পার্কে এক জনসভায় নেতাজী ভাষণ দিলেন।

জাপানের মহামান্য সম্রাট তাঁর প্রাসাদ সংলগ্ন ফনিক্স হলে এসে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে সাদর সংবর্ধনা জানালেন।

১৫ই নভেম্বর জাপানের ব্ল্যাক ড্রাগন দলের নেতা মিৎসু তোয়ামা নেতাজীর সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। সভায় জাপানের বহু গণ্যমান্য সামরিক অফিসার এসেছিলেন। শ্রীরাসবিহারী বসুও নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন।

চীন সরকারের আমন্ত্রণে ১৮ই নভেম্বর নেতাজী গেলেন নানকিং-এ। সেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কূটনীতিকদের এক আলোচনা সভায় তিনি অংশ নিলেন এবং জনসভায় বক্তৃতা দিলেন।

সাংহাইবাসী ভারতীয়দের আহ্বানে নেতাজী গেলেন সাংহাই এবং সাংহাই থেকে ম্যানিলায়, ফিলিপাইন প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে। যেখানেই তিনি গেলেন সেখানেই তাঁকে প্রচুর সংবর্ধনা জানান হল। জনসভাগুলিতে তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য প্রভূত লোক সমাগম হত। নেতাজীর সফরের উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পূর্ব এশিয়াবাসীদের সংগঠিত করা এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন লাভ।

২৪শে নভেম্বর তিনি এলেন সাইগনে। তিনি জনসভায় বক্তৃতা দিলেন এবং দেখা করলেন জাপানের সাদার্ন কমাণ্ডের অধিনায়ক কাউন্ট তেরাউচির সঙ্গে।

নেতাজী ২৫শে নভেম্বর তাঁর সদর দপ্তর সিঙ্গাপুরে ফিরে এলেন। তাঁর প্রচার অভিযান অনেকাংশে সফল হয়েছিল। পূর্ব-এশিয়ায় স্বাধীনতার স্পৃহা তীব্রতর হল এবং এক নব জাগরণ দেখা দিল।

ইতিমধ্যে আজাদ হিন্দ সরকারের মুখপত্র 'দৈনিক আজাদ হিন্দ' প্রকাশ শুরু হয়েছে, স্থাপিত হয়েছে আজাদ হিন্দ ব্যাংক এবং তার নিজস্ব কারেন্সী ব্যবস্থা। সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনের নতুন হেড কোয়ার্টার্সে সৈন্যবাহিনীর স্থানান্তরের কাজও এগিয়ে চলেছে। শত্রুবিমান আক্রমণের আশঙ্কাপূর্ণ দীর্ঘ পাঁচশত মাইল পথের অধিকাংশই যোদ্ধাদের পায়ে হেঁটে চলতে হচ্ছে।

ফৌজের অগ্রগামী কয়েকটি ছোট দল সাবমেরিন যোগে নেমেছেন ভারতের উপকূল ভাগে, গোপনে ছড়িয়ে পড়েছেন নির্দিষ্ট অঞ্চলে। সঙ্গে তাদের ট্রান্সমিটার, আত্মরক্ষার উপযোগী ছোট অস্ত্র এবং নেতাজীর হাতে লেখা আশ্রয় দাতার নাম ঠিকানা। শত্রুপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্য সংগ্রহ করে বেতারে আজাদ হিন্দ ফৌজের সদর দপ্তরে পাঠান ছিল তাদের কাজ। অবশ্য সকল দল নিরাপদে আশ্রয় স্থলে পৌঁছাতে পারেননি। যাঁরা শত্রুহস্তে ধরা পড়লেন তাঁদের সামরিক বিচারে মৃত্যুদণ্ড হল। তবে এমন মৃত্যুর জন্য তাঁরা প্রস্তুত হয়েই কাজে নেমেছিলেন। নির্ভয়ে তাঁরা মৃত্যু বরণ করলেন। অপর দলগুলির দ্বারা কাজ ঠিকমত এগিয়ে গেল।

সুভাষচন্দ্র ১০ই ডিসেম্বর রওনা হলেন ইন্দোনেশিয়া অভিমুখে। জাকার্তায় এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিলেন।

ওলন্দাজ অধিকার মুক্ত ইন্দোনেশিয়াতেও তখন নব জাগরণ দেখা দিয়েছিল। নেতাজী তাঁর ভাষণে বললেন, স্বাধীনতা দান হিসাবে পাওয়া যায় না, রক্তের বিনিময়েই শুধু স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর। যে স্বাধীনতা দান হিসাবে পাওয়া যায় তা চিরস্থায়ী হয় না।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি বললেন, অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়াতেই, ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদের জন্য তিনি দেশের বাইরে থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম গঠনের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে চলে এসেছেন। ভারতের মুক্তি বাহিনী এখন ভারতের পূর্বসীমান্তে দাঁড়িয়ে।

২৯শে ডিসেম্বর নেতাজী আন্দামান পরিদর্শনে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এ. এম. সহায় এবং আবিদ হাসান। পোর্ট ব্লেয়ারে জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলিত হল। নেতাজী আন্দামানের সেলুলার জেলে গিয়ে নির্বাসিত বন্দীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রশাসক নিযুক্ত হলেন লে : কর্নেল লোগনাথন, সহ-প্রশাসক মেজর আলি। নেতাজী ফিরে এলেন সিঙ্গাপুরে।

আসন্ন সমরাভিযান সম্পর্কে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও জাপ-কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হল। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষে নেতাজী এবং জাপানের পক্ষে জেনারেল কাওয়াবে চুক্তিতে সই করলেন। চুক্তির শর্তগুলি ছিল—

(১) আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপ সৈন্যবাহিনী অভিন্ন রণ কৌশল অবলম্বন করবে।

(২) আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের নিজস্ব সামরিক আইন কানুন মেনে চলবে। জাপ সামরিক কানুন ও পুলিশী নিয়ন্ত্রণ আজাদ হিন্দ ফৌজের উপর থাকবে না।

(৩) মুক্তাঞ্চল আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্তৃত্বাধীনে যাবে।

(৪) রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য বিশেষ সেকটর নির্দিষ্ট থাকবে, সেখানে তারা নিজেদের ব্যবস্থামত লড়াই করবে।

(৫) ভারতের মুক্তাঞ্চলে কেবল ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা তোলা হবে।

(৬) কলিকাতায় সামরিক লক্ষ্য বস্তু ছাড়া অন্যত্র বোমা নিক্ষেপ করা হবে না।

(৭) যে কোন জাপানী অথবা ভারতীয় সৈনিককে লুণ্ঠন অথবা নারীর শ্লীলতাহানি করতে দেখলে তৎক্ষণাৎ গুলী করা হবে।

জাপ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল সুগিয়ামা সাদার্ন কমাণ্ডের জি ও. সি. কাউন্ট তেরাউচিকে নির্দেশ দিলেন :

Army Instruction No. 1776

In order to strengthen the defence of Burma, G. O. C. Southern Army is to attack

the enemy when conditions become favourable and occupy and consolidate 'Imphal Area' and strategically important regions in N. E. India.

Sugiyama Gen.

To

G. O. C., Southern Command, Chief of General Staff. Count Terauchi Misaichi.

7th January, 1944.

পূর্ব-এশিয়ার অধিকৃত অঞ্চল এবং আজাদ হিন্দ সরকারের সহিত সংযোগ রক্ষাকারী জাপ সামরিক সংস্থা হিকারি কিকানের উপর রইল আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের দায়িত্ব। হিকারি কিকানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার জেনারল ইসোদা সাদার্ন কমাণ্ডের জি. ও. সি কাউন্ট তেরাউচির পরামর্শ ক্রমে কাজ পরিচালনা করতেন।

জাপ সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল সুগিয়ামার নির্দেশ থেকে প্রতীয়মান যে জাপান ভারত অভিযানে আদৌ ইচ্ছুক ছিল না, আজাদ হিন্দ ফৌজের লক্ষ্যের সঙ্গেও জাপান নিজেকে যুক্ত করেনি। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি অভিযানে জাপ-বাহিনীর অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল বার্মার প্রতিরক্ষা ভিত্তিক এবং সম্ভব হলে 'ইম্ফল এরিয়া' অধিকার।

জাপান জাতীয়তাবাদী চীনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন চীনকে অস্ত্র ও রসদ দিয়ে সাহায্য করছিল। এই সাহায্য চীনের রাজধানী চুংকিং-এ যেত রেঙ্গুন বন্দর থেকে বার্মা রোড হয়ে। বার্মার পতনের পর বার্মা রোড সংযোগ বিনষ্ট হয় এবং সাহায্য যেতে থাকে কলিকাতা বন্দর থেকে ইম্ফল-সাদিয়া সড়ক পথে। ইম্ফল এরিয়া দখল করতে পারলে জাপানের পক্ষে জাতীয়তা-

বাদী চীনের সরবরাহ পথ অবরোধ করা সম্ভব হত, যার ফলে চুংকিং-এর চিয়াং চীন সরকার যুদ্ধ চালাতে অসুবিধায় পড়ত। তাছাড়া আসাম-মণিপুর অঞ্চলের ডিগবয় তৈল খনিও সামরিক প্রয়োজনের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই কারণেই আসন্ন সংগ্রামে সম্ভবত জাপ সৈন্যাধ্যক্ষ সুযোগমত 'ইম্ফল এরিয়া এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল অধিকার'—জাপানের লক্ষ্য নির্দেশ করেছিলেন। নতুবা অভিযান বার্মা সীমান্তবর্তী আকিয়াব অতিক্রম করে চট্টগ্রাম-কুমিল্লা অভিমুখে পরিচালিত হত। সেক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজের রসদ সরবরাহ-পথের দূরত্বও অনেক হ্রাস পেত এবং অভিযানের শুরুতেই মুক্তি সংগ্রামের অনুকুলে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন পূর্ববঙ্গে গণ অভ্যুত্থানও ঘটতে পারত।

এই সময় জার্মানী পরাজয়ের সম্মুখীন, ইতালী পরাভূত, ইউরোপে ইঙ্গ-মার্কিন পুনরাধিকার-লড়াই শুরু হয়ে গেছে। জাপানের পক্ষে তখন নতুন যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছিল একরূপ অসম্ভব।

আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং জাপানের মনোভাব সম্পর্কে নেতাজী নিঃসন্দেহে অবহিত ছিলেন। অগ্র পশ্চাৎ ভেবে, হিসাব করে চললে, সময়টি আসন্ন অভিযানের পক্ষে উপযোগী বিবেচিত হত কিনা সন্দেহ। কিন্তু আত্মবিশ্বাসে চিরনির্ভর, স্থিরসংকল্প নেতাজী অবিচলিত চিত্তে অভীপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেলেন। বস্তুতঃ পৃথিবীর যুগান্তরকারী প্রায় সকল বড় ঘটনার পিছনেই এমন দুঃসাহসিকতা পরিলক্ষিত হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজে ছিল তিন ডিভিশন সৈন্য, দুটি কমাণ্ড গ্রুপ, একটি মেডিকেল ইউনিট, ঝাঁসীর রাণী সেবিকা বাহিনী এবং আজাদ হিন্দ স্বেচ্ছাসেবক দল। মূল সৈন্য বাহিনী বাদে অপর সব কটি ইউনিটও ছিল উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা প্রাপ্ত এবং অস্ত্র সজ্জিত। সর্ব সাকুল্যে ফৌজের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার।

আজাদ হিন্দ ফৌজের তিন ডিভিশন যোদ্ধার অধিনায়ক ছিলেন

মেজর জেনারেল এম. জেড. কিয়ানি, কর্নেল আজিজ আহম্মদ (পরে শাহ নওয়াজ খান) এবং লে ঃ কর্নেল এন. ভগৎ।

অভিযানে সহযোগী জাপানেরও ছিল তিন ডিভিশন সৈন্য। অধিনায়ক ছিলেন ফিল্ড মার্শাল মুতাগাচি।

১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রেঙ্গুন থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ মার্চ শুরু করল। যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী তাঁর 'অর্ডার অব দি ডে' ঘোষণায় সৈন্য বাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন :

There, there in the distance—beyond that river, beyond those jungles, beyond those hills, lies the promised land, the soil from which we sprang—the land to which we shall now return.

Hark, India is calling, India's metropolis Delhi is calling, Blood is calling to blood.

Get up, we have no time to lose. Take up your arms. There in front of you, is the road that our pioneers have built, we shall march along the road.

We shall carve our way through the enemy's ranks or God wills we shall die a Martyr's death.

And in our last-sleep we shall kiss the road that will bring our army to Delhi. The road to Delhi is the road to Freedom.

Chalo Delhi.

[ওই দূরে—নদীর ওপারে, অরণ্য-পর্বত শেষে, আমাদের চিরবাঞ্ছিত দেশ, আমাদের জন্মভূমি, সেখানে আমরা ফিরে যাব।

শোন, ভারতবর্ষ আমাদের ডাকছে, ভারতের রাজধানী আমাদের ডাকছে, আত্মীয় ডাকছে আত্মীয়কে।

ওঠো, সময় নেই। অস্ত্র হাতে নাও। আমাদের অগ্রদূতেরা যে পথ তৈরি করে গেছেন, আমরাও সেই পথে এগিয়ে যাব।

আমরা শত্রু সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে সামনে এগিয়ে যাব, অথবা ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয়, আমরা শহীদের মৃত্যু বরণ করব।

এবং মৃত্যুর পূর্বে সেই পথকে আমরা চুম্বন করব যে পথে আমাদের সেনা বাহিনী দিল্লী যাবে। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ।

চলো দিল্লী।]

আজাদ হিন্দ ফৌজ একটার পর একটা খণ্ড যুদ্ধে জয়লাভ করে এগিয়ে চলল। দেড় মাসের মধ্যে আরাকান, তাউংবাজার মিয়ামিয়াং, কালাদিন, ফোর্ট হোয়াইট, লেনাকট এবং কেনেডি পিক দখল করে মুক্তি বাহিনী পৌঁছে গেল ভারত ভূখণ্ডে। যোদ্ধারা তখন আনন্দে আত্মহারা।

পরবর্তী লক্ষ্য হল নাগাল্যাণ্ডের রাজধানী কোহিমা। ব্রিটিশ বাহিনী বাধা দিতে প্রস্তুত হল প্রচণ্ড শক্তিতে। ব্রিটিশ সৈন্যদলকে সাজানো হল নতুনভাবে, বাহিনীর পুরোভাগে ভারতীয় সৈনিকের পরিবর্তে রাখা হল খাস ইংরাজ, আমেরিকান ও কৃষ্ণকায় পশ্চিম আফ্রিকান রেজিমেন্টগুলি। যুদ্ধ নিপুণ অত্যাধুনিক অস্ত্র সজ্জিত রয়েল ইয়র্কশায়ার, ডারহাম লাইট ইনফ্যানট্রি, রয়েল স্কটস্, সি ফোর্থ হাই ল্যাণ্ডারস্ সাম্রাজ্য রক্ষায় শক্ত হয়ে দাঁড়াল। ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে রইল কিছু চিয়াং কাইশেকের চীনা সৈন্যও।

ব্রিটিশ অধিনায়ক সৈন্যদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিলেন—'পিছু হটলে

চলবে না ; মনে রেখ, এ হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার শেষ লড়াই। যত অস্ত্র চাও দেব, যত যানবাহন চাও দেব। বিমান বহর তোমাদের মাথার উপর ছত্রাকারে থাকবে। খাদ্য, মদ্য, স্ফুর্তির খোরাক সব আছে। হতাহতের পরিবারের জন্য আছে মোটা পেনসন, চাকুরী এবং চাষের জমি। হটাও জাপদস্যুদের।'

কিন্তু কোথায় জাপদস্যু ? বিপক্ষ দলের পুরোভাগে সবই যে ভারতীয় জওয়ান, গায়ে তাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোশাক, হাতে ভারতীয় রাইফেল। লাউড স্পীকারে তারা বলছে, 'ভাই ভাইয়ের সঙ্গে কেন লড়তে এসেছ, দুশমন ইংরাজের পক্ষ ছেড়ে আমাদের সহিত মুক্তি ফৌজে যোগ দাও।'

যুদ্ধ হল, প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সম্মুখ সমর। কোহিমা হাতছাড়া হল ব্রিটিশের। ব্রিটিশ বাহিনী সরে গেল মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে। কোহিমার রণক্ষেত্র আজাদ হিন্দ ফৌজের শৌর্যের স্মরণীয় প্রতীক হয়ে রইল ভারতের মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসে।

দু'বছর ধরে ইম্ফলে ব্রিটিশ প্রচুর সৈন্য, অস্ত্র, কামান, বিমান এবং গোলাগুলী মজুদ করে দুর্ভেদ্য রণব্যূহ গড়ে তুলেছিল। ব্রিটিশের সৈন্য সংখ্যা ছিল দু'লক্ষের উপর। ইম্ফল রক্ষার্থে ব্রিটিশ সর্বশক্তি নিয়োগ করল।

ভারতবাসীর সামনে তখন প্রসারিত মিথ্যার ঘন এক প্রচার যবনিকা। যুদ্ধরত আজাদ হিন্দ ফৌজের সংবাদ প্রায় কেউই জানত না। জানত জাপানীরা আসছে, আর তাদের সঙ্গে আছেন সুভাষ বসু। সে সময় ঘরে ঘরে রেডিও ছিল না। কম শক্তি সম্পন্ন আজাদ হিন্দ সরকারের বেতার-কেন্দ্রে যে সংবাদ পরিবেশন করত, তা ভাল ভাবে শোনা যেত না। যেটুকু সংবাদ প্রকাশ পেত, সরকার বলতেন, জাপানী প্রোপাগাণ্ডা। ইংরাজের বিপক্ষ রাষ্ট্রের বেতার-সংবাদ শোনা নিষিদ্ধ ছিল। তা ছিল গুরুতর অপরাধ। সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ ত তৎপর ছিলই, তাছাড়া ছিল অতি উৎসাহী ব্রিটিশ

সহযোগী রাজনৈতিক দলের ক্যাডার। যুদ্ধের আলোচনা কিংবা সরকার বিরোধী কোন মন্তব্য করলেই তার খবর তারা সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে দিত ইংরাজের গুপ্তচর-দপ্তরে।

সরকারী ভবন, রেল স্টেশন, পোস্টাফিস, স্কুল ও কলেজ ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাক্ষসাকার বীভৎস জাপানী মূর্তি, সর্বত্র পোস্টার পড়েছিল—গুজবে কান দিও না, সাবধান, দেওয়ালেরও কান আছে ইত্যাদি।

ব্রিটিশের যুদ্ধোত্তম অবাধে দেশব্যাপী চলেছিল। মহাত্মার 'কুইট ইণ্ডিয়া' হুঙ্কার বিস্মৃত প্রায়, তখন 'মরে গিয়ে ঝিল্লিস্বনে কাঁদায় রে নিশার গগন' অবস্থা। আগস্ট বিদ্রোহ স্থান নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়। কয়েক হাজার বিদ্রোহীকে জেলে আটক রাখা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে খুব কঠিন কিছু ছিল না।

অস্ত্র কারখানাগুলি দিবারাত্র কাজ করছিল, অফিসে চালু ছিল ওভারটাইম, শ্রমিক-করণিক পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে আনন্দে ঘরে ফিরছিল। শিল্প মালিক-ব্যবসায়ীরা দুহাতে মুনাফা লুঠছিল, ঠিকাদার-দালালরা টো টো করে ঘুরে গ্রাম সাবাড় করে চাল, গম, হাঁস, মুর্গি, গরু, ভেড়া কিনে এনে পৌঁছে দিচ্ছিল সমর বিভাগের হাতে। দরিদ্র দেশে টাকা ছড়ালে কি না মিলে। আর টাকা? রিজার্ভ ব্যাংক নোট ছাপিয়ে দিলেই হল।

চার্চিল সাহেব কংগ্রেসের আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন—"Let the dogs bark, caravan shall pass on" কথাটা শুনতে খুব খারাপ লেগেছিল। কি ভীষণ অবমাননাকর! কিন্তু ভারতবর্ষের সত্যিকার অবস্থাটা ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর ভালই জানা ছিল। মিঃ চার্চিল মিথ্যা বলেন নি। ব্রিটিশ ক্যারাভান নির্বিঘ্নে চলতে লাগল।

১৯৪২-৪৩ সালে কলিকাতায় দু চারটা বোমা পড়েছিল, শহরবাসী অনেকে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল কলিকাতা ছেড়ে।

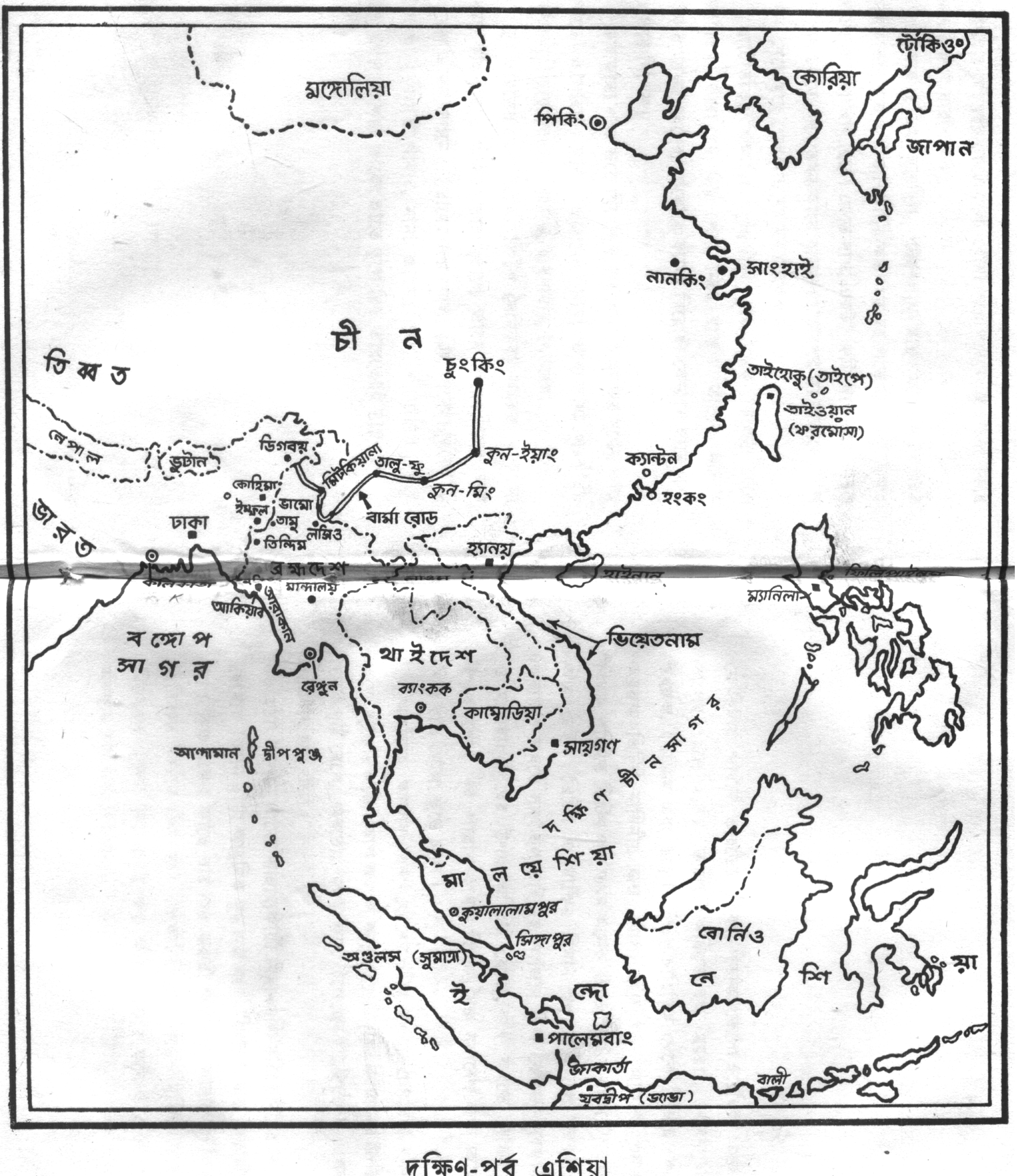
তারপর দু-দেড়বছর কেটে গেল, বোমা আর পড়েনি, ভয়ার্তরা ফিরে এসেছিল যে যার ঘরে।

বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, পঞ্চাশলাখ মানুষ মরেছিল। শহর কলিকাতার রাজপথে সারি সারি কত মৃতদেহ পড়ে ছিল। বুভুক্ষুর কাতর প্রার্থনা 'বাবু, দুটো খেতে দাও, একটা রুটি দাও'-এর করুণ সুর পথ চলতে যখন তখন কানে বাজত। তারপর তা বাতাসে মিশে গেল, শেষে মুছে গেল মানুষের মন থেকেও।

সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ছিলেন দেশে অগণিত। তাঁরা যে যাঁর পেশা নিয়ে ব্যস্ত। তাঁদের অনেকে আবার আধজাগরণের স্বপ্নঘোরে ফ্যাসী বিরোধী কোরাস গানে গলা মিলিয়ে দিলেন।

কলিকাতা শহর ভরে গিয়েছিল মানুষে। ইংরাজের যুদ্ধের কাজ করতে এসেছিল নানা প্রদেশের নানা ভাষা-ভাষী সরকারী-বেসরকারী চাকুরিয়া দল, শ্রমিক, ব্যবসাদার, খিদমদগার।

পূর্ব ভারতের যে ঘাঁটিতেই ব্রিটিশ সৈনিকরা কর্মরত থাক না কেন, কলিকাতায় আসত তারা ভাগে ভাগে কয়েকদিনের জন্য প্রমোদ জীবন যাপনে। তাদের জন্য খোলা ছিল সিনেমা-থিয়েটার, টিনে আঁটা বিলাতী খাবার, নানা জাতের সুরা ও নারী। আর এসব জোগাড় করে তাদের হাতে তুলে দিত ভারতেরই মানুষ।


মঙ্গোলিয়া
পিকিং
কোরিয়া
টোকিও
জাপান
নানকিং
সাংহাই
তিব্বত
চীন
চুংকিং
তাইহোকু (তাইপে)
তাইওয়ান
(ফরমোসা)
নেপাল
ভুটান
ডিগবয়
কুন-ইয়াং
তালু-ফু
কুন-মিং
ক্যান্টন
হংকং
কোহিমা
ইম্ফল
ভামো
তামু
তিদ্দিম
লাসিও
বার্মা রোড
ভারত
ঢাকা
হ্যানয়
ব্রহ্মদেশ
মান্দালয়
ম্যানিলা
আকিয়াব
ভিয়েতনাম
বঙ্গোপসাগর
থাইদেশ
রেঙ্গুন
ব্যাংকক
কাম্বোডিয়া
সায়গণ
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ
দক্ষিণ চীন সাগর
মালয়েশিয়া
কুয়ালালামপুর
সিঙ্গাপুর
বোর্নিও
সুমাত্রা
ইন্দোনেশিয়া
পালেমবাং
জাকার্তা
বালী
যবদ্বীপ (জাভা)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

॥ ১২ ॥

কোহিমায় স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা তোলা হয়েছিল ১৯৪৪ সালের ১৯শে মার্চ। তারপর অধিকৃত হল ময়রাং, বিষেণপুর, উখরুল, তিড্ডিম এবং তামু। ইম্ফল চারিদিক থেকে বিচ্ছিন্ন হল, অবরুদ্ধ ব্রিটিশ বাহিনীর জন্য খোলা রইল শুধু আকাশ পথ। বিমান শক্তিতে ব্রিটিশ পক্ষ তখন অনেক উন্নত, ১৯৪২ সালের অবস্থা আর নেই। ব্রিটিশ ও মার্কিন বিমান শুধু যে ইম্ফলে সরবরাহ অব্যাহত রাখতে সমর্থ হল তাই নয়, আজাদ হিন্দ ফৌজের অবস্থান ও সরবরাহ পথের উপর অবিরত বোমা বর্ষণ করতে লাগল। ইম্ফল থেকে দূর পাল্লার কামান বিপক্ষ সৈন্য সমাবেশ লক্ষ্য করে দিবা রাত্র গোলা ছুড়ে চলল।

অন্যদিকে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর জওয়ানরা পরিখা খনন করে, বাংকার গড়ে, ঝোপ জঙ্গলে আত্মগোপন করে, রণাঙ্গনের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে, অবরোধ রক্ষা করে চলেছেন। ইম্ফলের পতন অনিবার্য হয়ে উঠল।

হঠাৎ জাপান তাদের সাহায্যকারী বিমানগুলি সরিয়ে নিয়ে গেল। বোমারু বিমান ছাড়া আধুনিক যুদ্ধ চলে না। বিমানের জন্য নেতাজী জাপ কর্তৃপক্ষের কাছে বার বার জরুরী অনুরোধ জানালেন কিন্তু প্রতিশ্রুত বিমান এল না। সংকটের মুখে পড়েও মুক্তিযোদ্ধারা নিরুৎসাহ হলেন না, প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করে তাঁরা স্ব স্ব অবস্থান রক্ষা করে রইলেন।

ব্রিটিশ বিমান থেকে রাশি রাশি প্রচার পত্র নীচে ছড়িয়ে দেওয়া হল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকদের উদ্দেশ্যে প্রচার পত্রে বলা হল :

"তোমরা তোমাদের বাহিনীতে ফিরে এস, তোমাদের গ্রহণ করা হবে। এখানে আছে উৎকৃষ্ট খাদ্য, পানীয়, পরিধেয় ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা। ওখানে থেকে কি করবে? খাদ্য নেই, সরঞ্জাম নেই, পানীয় নেই। ঘাস খেয়ে কি যুদ্ধ করা যায়?

তোমরা ফিরে এলে, কিছুদিনের বিশ্রামের জন্য, বিমানে করে তোমাদের দেশে পাঠান হবে, তোমরা পরিবারের সহিত তখন মিলিত হতে পারবে। চলে এস।"

আবেদনে কাজ হল না।

ইম্ফলের পতন যখন সুনিশ্চিত, তখন হঠাৎ বৃষ্টি নামল, সাত দিন ধরে চলল বর্ষণ। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে বার্মার সরবরাহ পথ জল কাদায় ভরে গেল, রসদের ট্রাকগুলো অচল হয়ে পথে দাঁড়িয়ে রইল। পরিখা জলে ভর্তি হল, অনেক গোলাগুলি জলে ভিজে নষ্ট হল। সুযোগ বুঝে ব্রিটিশ বিমান বহর জোর আক্রমণ চালাল।

মৌডক ছেড়ে জাপ সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ করল। জাপ অধিনায়ক আজাদ হিন্দ ফৌজকেও পশ্চাদপসরণ করবার পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ গ্রহণ করে অনন্যোপায় নেতাজী ফৌজের প্রতি পশ্চাদপসরণের আদেশ দিলেন।

দীর্ঘ একমাস কাল পরে ইম্ফলের অবরোধ মুক্ত হল। গভীর দুঃখ ও অনিচ্ছাভরে ১৯৪৪ সালের ২৪শে এপ্রিল আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকবৃন্দ মণিপুরের পার্বত্য বনভূমির পথে বার্মা অভিমুখে রিট্রিট মার্চ শুরু করলেন।

প্রথম অভিযান ব্যর্থ হলেও, আজাদ হিন্দ ফৌজের মনোবল ভেঙ্গে পড়ল না, দলত্যাগ ঘটল না, শৃঙ্খলার সঙ্গে যোদ্ধগণ ফিরে এলেন বার্মার সামরিক ঘাঁটিতে।

রণক্লান্ত সৈনিকদের জন্য উত্তর বার্মায় অনেকগুলি চিকিৎসা ও বিশ্রাম শিবির খোলা হয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজ ও বার্মা সরকারের চিকিৎসক, ঝাঁসী রাণী সেবিকা বাহিনী এবং আজাদ হিন্দ স্বেচ্ছাসেবক দল আহত ও অসুস্থ সৈনিকদের সেবার ভার নিলেন। নেতাজী সৈনিকদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করতে রেঙ্গুন থেকে উত্তর বার্মায় এলেন।

বিপ্লবীর জীবনে পরাজয় নেই। বিপ্লবী চির আশাবাদী। সুভাষচন্দ্র নবোদ্যমে আবার কাজ শুরু করে দিলেন, নতুন করে সমর-পরিষদ গড়লেন, এবং পুনরায় তিন ডিভিশন সৈন্য অস্ত্রসজ্জিত হল।

১৯৪৪ সালের ১লা নভেম্বর জাপকর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার উদ্দেশ্যে নেতাজী টোকিও গেলেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী তখন জেনারেল কইসো। সুভাষচন্দ্রের সম্মানে অনুষ্ঠিত ভোজসভায় জেনারেল কইসো বললেন যে, অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের সহিত জাপানের সম্পর্ক পূর্বের ন্যায়ই বন্ধুত্বপূর্ণ থাকবে এবং জাপ-সরকার তার সাধ্যানুযায়ী ভারতের মুক্তিসংগ্রামে সাহায্য করে যাবে। নেতাজীর প্রতি প্রীতি ও সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ প্রাক্তন জাপ-প্রধানমন্ত্রী জেনারল তোজো নেতাজীকে একখানি সুদৃশ্য তরবারি উপহার দিলেন।

টোকিও অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র অসুস্থ নায়ক শ্রীরাসবিহারী বসুর সহিত সাক্ষাৎ করলেন, তারপর প্রসিদ্ধ জাপানী কবি নোগুচি এবং জাপ-সম্রাটের সঙ্গে। ১৪ই ডিসেম্বর তিনি সিঙ্গাপুরে ফিরে এলেন।

১৭ই ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে এক বিরাট জনসভায় সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে বললেন: "শত্রুর সহিত আপোস নেই, যুদ্ধ চলবেই। হয় স্বাধীনতা লাভ, নয় মৃত্যুবরণ, এর মাঝে দ্বিতীয় পথ নেই।"

নতুন করে গণসংযোগ, অর্থ সংগ্রহ ও যুদ্ধ-প্রস্তুতির কাজ এগিয়ে

চলল। নেতাজী রেঙ্গুন, কুয়ালালামপুর এবং সুমাত্রায় গেলেন। পূর্ব এশিয়াবাসী ভারতীয়গণ তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে অকাতরে অর্থ দান করতে এগিয়ে এলেন। দুচার জন ধনী ব্যক্তি তাঁদের সর্বস্ব দান করে দারিদ্র্য বরণ করলেন। রেঙ্গুনের ব্যবসায়ী জনাব হবিবুর রহমান নগদে ও অলঙ্কারে দিলেন এক কোটির অধিক টাকা। নেতাজী রহমান সাহেবকে 'সেবক-ই-হিন্দ' পদকে ভূষিত করলেন। জনৈকা গুজরাটী মহিলা শ্রীমতী বেতাই দান করলেন ত্রিশলক্ষ টাকা। ধনী শেঠগণও মুক্ত হস্তে আজাদ হিন্দ ভাণ্ডারে অর্থ দিলেন।

কুয়ালালামপুরে অর্থ সংগ্রহ হল নব্বই লক্ষ এবং সুমাত্রায় দশ লক্ষ ডলার।

নেতাজীর প্রতি জনসাধারণের ছিল অগাধ বিশ্বাস, তারা যুদ্ধ পরিস্থিতির দিকে তাকাল না, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিপর্যয়ের কথাও ভাবল না।

নেতাজীর চেষ্টায় ইম্ফল বিজয়ে ব্যর্থতা জনিত নৈরাশ্য পূর্ব-এশিয়ার জনমন থেকে দূর হয়ে গেল। সকলেরই মনে আশা জাগল, অচিরে আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের দ্বিতীয় অভিযান শুরু করবে।

১৯৪৫ সালের ২১শে জানুয়ারী টোকিও হাসপাতালে শ্রীরাস-বিহারী বসু দীর্ঘ রোগ ভোগের পর দেহত্যাগ করলেন। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রয়াত নেতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হল।

২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে রেঙ্গুনবাসীরা তাঁকে সোনা দিয়ে ওজন করে সেই সোনা আজাদ হিন্দ তহবিলে দান করলেন। এই সোনার তাৎকালীন মূল্য ছিল দুই কোটি টাকা।

নেতাজী তাঁর সমর পরিষদের সদস্যদের সহিত পরবর্তী কর্মপন্থা নিয়ে বিশদ আলোচনা করলেন। জাপানের সাহায্যের উপর নির্ভর না করে সেনাবাহিনীর জন্য নতুন অস্ত্রশস্ত্র ও যান বাহন কেনার

ব্যবস্থা হল। নিজেদের খাদ্য ভাণ্ডার গড়া হল। পরবর্তী সংগ্রামের কৌশলও নতুন ভাবে স্থির হল।

পরিকল্পিত দ্বিতীয় মুক্তি-অভিযান কিন্তু সম্ভব হল না। ব্রিটিশের সাম্রাজ্য পুনরাধিকারের সংগ্রাম শুরু হওয়ায়, আজাদ হিন্দ ফৌজকে বার্মার প্রতিরক্ষা রণে নামতে হল। জাপ বাহিনী ও স্বাধীন বার্মার সৈন্য দলের সহিত একত্রে লড়াই চালিয়ে, আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিন দখলদার বাহিনীর অগ্রগতি ঠেকিয়ে রাখল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। খাস জাপানের উপর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ আরম্ভ হলে, বার্মার প্রতিরক্ষা যুদ্ধে জাপানের যে কয়টি বিমান নিযুক্ত ছিল তাদের তুলে নেওয়া হল জাপানের আত্মরক্ষার যুদ্ধের প্রয়োজনে।

আরাকান, আকিয়াব ইংরাজের দখলে গেল, ক্রমে উত্তর বার্মার প্রতিরোধ ব্যূহ ভেঙ্গে পড়ল; মিকটিলা, পোপা হিল, নিওঙ্গ, মান্দালয় একে একে শত্রুর অধিকারে চলে গেল। আজাদ হিন্দ ফৌজ সরে এল রেঙ্গুনের দিকে। অবস্থার অবনতি দেখে বার্মার জাতীয় বাহিনী প্রতিরক্ষা সংগ্রামে ইতি দিয়ে ব্রিটিশের সঙ্গে হাত মিলাল।

১৯৪৫ এর ২৩শে এপ্রিল জাপ সৈন্যবাহিনী রেঙ্গুন পরিত্যাগ করল। ২৪শে এপ্রিল রাত্রিতে নেতাজী মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ও ফৌজের প্রধানদের সহিত বোমা বিধ্বস্ত রেঙ্গুন ত্যাগ করে, ব্যাংককের পথে সিঙ্গাপুর অভিমুখে রওনা হলেন।

রেঙ্গুন ত্যাগের প্রাক্কালে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসর এবং জওয়ানদের উদ্দেশ্যে তাঁর বিদায় ভাষণে বললেন :

> আমি বার্মা ছেড়ে চলে যাচ্ছি—১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে যে বার্মায় আপনারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন এবং এখনো করছেন। ইম্ফল ও বার্মার যুদ্ধে আমরা সাফল্য লাভ করতে পারিনি কিন্তু আমাদের যুদ্ধের শেষ হয় নি। আমি আজন্ম আশাবাদী, কোন অবস্থাতেই আমি পরাজয়

স্বীকার করি না। ইম্ফল উপত্যকা, আরাকানের অরণ্য-পর্বত, তৈলাঞ্চল এবং ব্রহ্মদেশে শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাদের নির্ভীক সংগ্রামের ইতিবৃত্ত ভারতের মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

সাথীবৃন্দ, এই সংকটকালে আমি আপনাদের শুধু একটি আদেশই দিতে পারি—যদি পরাজয় মেনে নিতেই হয় তবে সে পরাজয় আপনারা যেন বীরের ন্যায় মেনে নেন। আত্ম-সম্মান ও শৃঙ্খলার আদর্শ অম্লান রেখে যেন তা করেন। স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ বংশধররা যাতে গৌরবের সহিত আপনাদের নাম স্মরণ করে এবং সগর্বে বিশ্ববাসীকে বলতে পারে যে তাঁদের পিতা-পিতামহরা মণিপুর, আসাম এবং ব্রহ্মদেশে মুক্তি যুদ্ধে আত্মদান করে স্বাধীনতার পথ সুগম করেছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। আপনাদের যোগ্য হস্তে আমি আমাদের ত্রিবর্ণ পতাকা, জাতীয় সম্মান এবং ভারতীয় যোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ ঐতিহ্য সমর্পণ করে যাচ্ছি। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে মুক্তি যুদ্ধের অগ্রগামী ফৌজ, আপনারা দেশের সম্মান রক্ষার জন্য সব কিছু, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করে এমন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন যা সবাইকে চিরদিন অনুপ্রাণিত করে।

আপন ইচ্ছায় চলতে পারলে আমি এই দুঃখের দিনে আপনাদের মাঝে থেকে সাময়িক পরাজয়ের বেদনা সমান ভাবে ভাগ করে নিতে পারতাম। কিন্তু মুক্তি যুদ্ধ চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রীমণ্ডলী ও সামরিক বিভাগের প্রধানদের উপদেশমত আমাকে বার্মা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। পূর্ব এশিয়াবাসী ভারতীয় এবং স্বদেশবাসীদের আমি জানি, তারা সকল অবস্থাতেই যে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে, সে বিষয়ে আমি

নিশ্চিত এবং আপনাদের দুঃখ বরণ ও আত্মত্যাগ কখনো বিফলে যাবে না।

আমার সম্বন্ধে আমি বলতে পারি যে, আটত্রিশ কোটি স্বদেশবাসীর স্বার্থরক্ষা ও মুক্তির জন্য সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করবার যে সংকল্প আমি ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর গ্রহণ করেছি তাতে আমি অবিচল থাকব। পরিশেষে, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারাও আমার মতো আশা রাখুন এবং বিশ্বাস করুন, গভীর অন্ধকার রাত্রির শেষেই উষার আলোর উদয় ঘটে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই এবং অচিরেই হবে। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন। ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ! জয় হিন্দ্!

২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫ স্বা: সুভাষচন্দ্র বসু

সর্বাধিনায়ক আজাদ হিন্দ ফৌজ।

ফৌজের প্রতিটি যোদ্ধা নীরবে শুনলেন বিদায় বাণী। প্রিয় নেতার প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন অশ্রু দিয়ে। চারিদিকে তখন ব্যস্ততা, দূর থেকে শত্রুর কামান দাগার শব্দ ভেসে আসছে। নেতাজী যাদের সামনে পেলেন তাদের সঙ্গেই দু-একটা কথা বললেন, তাদের হাতে হাত রেখে প্রীতির স্পর্শ দিয়ে নিজেকে জানাতে চাইলেন। ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সাধারণ সম্পাদক কে. এম. কান্নাপিল্লীর দিকে চেয়ে বললেন, "There can be no farewell in a movement like ours."

নেতাজীর মুখে ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধতা নেমে এল। বেদনার্দ্র হল দৃষ্টি। বহু দূরে ফেলা আসা স্মৃতির জগতে বুঝি তিনি ফিরে গেলেন। অস্ফুট স্বরে তাঁকে বলতে শোনা গেল—"I could not say goodbye to my mother."

কনভয় প্রস্তুত হল, নেতাজী উপস্থিত সকলের নিকট বিদায়

নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলেন। প্রীতিস্নিগ্ধ কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল —"জয় হিন্দ্! আবার দেখা হবে।"

গাড়ীগুলি পর পর দ্রুত বেগে বেরিয়ে গেল। রাত্রি তখন ১০টা, শত্রুপক্ষের গোলা বর্ষণের শব্দ ক্রমেই নিকটতর হচ্ছিল।

১৯৪৫ সালের ৩রা মে আজাদ হিন্দ ফৌজ রেঙ্গুনে ব্রিটিশ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করল। বার্মার স্বাধীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী ডঃ বা. ম. তাঁর মন্ত্রিগণের সঙ্গে পূর্বেই রেঙ্গুন ত্যাগ করেছিলেন। সুতরাং বার্মার প্রতিরক্ষা সংগ্রামের অবসান ঘটল।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রাম করা ছাড়াও, সংকটকালে পূর্ব এশিয়াবাসী ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়ের ধনপ্রাণ রক্ষার দায়িত্ব পালন করে অশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। মুক্তি যোদ্ধাদের দেশপ্রেম, দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত বার্মার জনগণের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা দৃঢ়তর করেছিল। ব্রিটিশ বার্মা পুনরাধিকার করল বটে, কিন্তু সেই মোহগ্রস্ত পূর্বের বার্মাকে ফিরে পেল না।

ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের প্রধান নেতাদের জেল থেকে মুক্তি দিয়ে,—বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৫ সালের ২৫শে জুন সিমলায় এক বৈঠক আহ্বান করলেন। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং বড়লাটের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হল।

নেতাজী নতুন আপোস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবার আহ্বান জানালেন সিঙ্গাপুর আজাদ হিন্দ বেতার-কেন্দ্র থেকে। তিনি তাঁর বেতার ভাষণে বললেন, জাতীয়তার আদর্শ বিসর্জন দিয়ে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা দেশের পক্ষে আত্মহত্যার সমতুল্য হবে। যুদ্ধ শেষ হতে চলেছে কিন্তু এখনিই ভারত যদি ব্রিটেনের সহিত আপোস করে বসে, তাহলে যুদ্ধান্তে রাশিয়া বা অন্য কোন শক্তির পক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সমস্যা সম্পর্কে কিছু করবার থাকবে না।

নতুন ব্রিটিশ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল—সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতিক

ভিত্তিতে বর্ণহিন্দু, তপশিলী হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি নিয়ে দেশ শাসনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় একসিকিউটিভ কাউনসিল গঠনের কথা। কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত ছিল, কিন্তু মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচন করবে একমাত্র মুসলিম লীগ, লীগের এই দাবি কংগ্রেস মেনে নিতে অস্বীকার করায়, ত্রি-দলীয় বৈঠক সফল হতে পারল না। কংগ্রেসে বহু জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছিলেন, মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচনে তাঁদেরও অধিকার আছে এই ছিল কংগ্রেসের বক্তব্য।

জাপানের সহিত সোভিয়েত রাশিয়ার অনাক্রমণ চুক্তি ছিল। সেই কারণে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের তখনও অবনতি ঘটে নি। প্রতিকূল অবস্থায় জাপান রাশিয়াকে দিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির নিকট যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করল। পটস্‌ডাম সম্মেলনে আমেরিকা, ব্রিটিশ ও রাশিয়ার তিন প্রধানের মধ্যে জাপানের প্রস্তাব আলোচনান্তে অগ্রাহ্য হল। যুদ্ধ চলল এবং বৃটিশ বাহিনী বার্মা অধিকার করে সিঙ্গাপুর অভিমুখে অগ্রসর হল। অন্যদিকে মার্কিন বিমান জাপানের উপর বোমাবর্ষণ অব্যাহত রাখল।

নেতাজী রেঙ্গুন থেকে গেলেন ব্যাংককে, তারপর জুনের মাঝামাঝি সিঙ্গাপুরে। যুদ্ধ-পরিস্থিতি লক্ষ্য করে তিনি ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাবার উদ্দেশ্যে জাপান সরকারের নিকট বিমান সাহায্যের অনুরোধ জানালেন। জাপ কর্তৃপক্ষ নেতাজীকে প্রার্থিত সাহায্যের আশ্বাস দিলেও, আবশ্যক বিমান পাঠালেন না।

১৯৪৫ সালের ৭ই মে জার্মানী আত্মসমর্পণ করল। নেতাজী জাপ কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যক্তিগত প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাঁর প্রস্তাবমত নিরাপদ যাত্রার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে অনুরোধ করলেন। প্রতিনিধি টোকিও থেকে ফিরে এলেন সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে, তার বেশি কিছু নয়। এইভাবে তিন মাস কেটে গেল।

৭ই আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমা নগরে বিমান থেকে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করল। মুহূর্তের মধ্যে হতাহত হল লক্ষাধিক নরনারী-শিশুবৃদ্ধ। শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল।

হিরোশিমার পর ৯ই আগস্ট পুনরায় আণবিক বোমা পড়ল নাগাসাকিতে। হতাহতের সংখ্যা আরো বেশিতে পৌছাল। জাপ-কর্তৃপক্ষ সামগ্রিক ধ্বংসের আশঙ্কায় শঙ্কিত হলেন।

৮ই আগস্ট অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে সোভিয়েত রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং জাপানের ঘোর সংকটের সুযোগ নিয়ে, মাঞ্চুরিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপ-অধিকারভুক্ত দ্বীপ ও ভূভাগ করায়ত্ত করল।

আত্মসমর্পণ করে আত্মরক্ষা করা ছাড়া জাপানের গত্যন্তর রইল না।

এ সময় নেতাজী সিঙ্গাপুরের নিকটে সেরামবামে অবস্থান করছিলেন। সেরামবামে ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর-শিক্ষা কেন্দ্র। ১২ই আগস্ট জনৈক উচ্চপদস্থ জাপ অফিসার মিঃ নেগিশি, জাপানের উর্ধতম কর্তৃপক্ষের এক গোপন বার্তা নিয়ে সেরামবামে নেতাজীর সহিত সাক্ষাৎ করলেন। বার্তায় জাপানের আত্মসমর্পণের সংবাদ এবং নেতাজীকে অবিলম্বে সাইগনে পৌছে, পূর্ব এশিয়া ছেড়ে স্থানান্তর গমনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। নেতাজী পরামর্শ গ্রহণ করতে অসম্মতি জানালেন।

নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারবৃন্দ ও মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শের উদ্দেশ্যে সেই দিনই সিঙ্গাপুরে এলেন। জাপানী অফিসার মিঃ নেগিশিও সেরামবাম থেকে নেতাজীর অনুগমন করলেন।

আজাদ হিন্দ ব্যাংক থেকে গচ্ছিত টাকা তুলে নেতাজী ফৌজের এবং অন্যান্য কর্মীদের তিন মাসের অগ্রিম বেতন দেবার ব্যবস্থা করলেন। ঝাঁসির রাণী সেবিকা বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হল এবং

সেবিকাদের প্রত্যেককে এককালীন অর্থ দিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হল।

নেতাজীর ইচ্ছানুসারে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের নিহত যোদ্ধাদের জন্য একটি স্মৃতি-বেদী নির্মিত হল এবং নেতাজী স্মৃতি-বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করলেন।

মিঃ নেগিশির দৌত্য বিফল হওয়ায়, ১৩ই আগস্ট সন্ধ্যায় হিকারী কিকানের অধিনায়ক জেনারল ইসোদা এবং অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত মিঃ হাচিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে বুঝিয়ে জাপ-ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষের পরামর্শ গ্রহণ করে, তিনি যাতে সাইগনে যেতে সম্মত হন, তার জন্য বিমান নিয়ে সিঙ্গাপুরে এলেন। নেতাজী সিঙ্গাপুর ছেড়ে সাইগনে যেতে পুনরায় তাঁর অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন।

নেতাজী তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ এবং ফৌজের সেনানীদের সহিত সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশের নিকট আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তে অবিচল রইলেন।

১৫ই আগস্ট জাপান সরকারীভাবে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করল। দখলদার বাহিনী টোকিওতে অবতরণ করল এবং জাপ রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষের স্বাধীনতার অবসান ঘটল।

ঐ ১৫ই আগস্ট, জাপানের ইম্পিরিয়াল হেড কোয়ার্টার্সের পক্ষ থেকে বিশেষ দূত কর্নেল সাকাই এক জরুরী বার্তা নিয়ে সিঙ্গাপুরে এসে নেতাজীর সহিত সাক্ষাৎ করলেন। সাক্ষাৎকার ঘটল গোপনে। কর্নেল সাকাই-এর সহিত নেতাজীর গোপন আলোচনার বিষয়বস্তু নেতাজীর সহকর্মীদের নিকট অজ্ঞাত রইল। নেতাজী তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন এবং পরের দিন, ১৬ই আগস্ট জেনারল ইসোদা, মিঃ নেগিশি, কর্নেল সাকাই এবং সহকর্মী শ্রীএস. এ. আয়ার, কর্নেল হবিবর রহমান, শ্রীদেবনাথ দাস প্রভৃতির সহিত একত্রে একটি জাপ বিমানে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে ব্যাংককে এলেন।

মার্শাল কাউন্ট তেরাউচির বিশেষ বার্তাবহ কর্নেল তাডাব্যাংককে নেতাজীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নেতাজীর সহিত জেনারল ইসোদা, এবং কর্নেল তাডার আর এক দফা গোপন পরামর্শ হল। এই পরামর্শকালে জানা যায় কর্নেল হবিবর রহমান কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা ছিল একান্তভাবে গোপনীয়। নেতাজী কোথায় যাচ্ছেন সহকর্মীদের কেউই জানলেন না। একমাত্র হবিবর রহমান হয়ত তাঁর পরিকল্পনার বিষয়ে কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন।

১৭ই আগস্ট সকালে জেনারল ইসোদা, মিঃ নেগিশি, কর্নেল সাকাই, মিঃ হাচিয়া, এবং নেতাজীর সহকর্মী শ্রীএস. এ. আয়ার, শ্রীদেবনাথ দাস, কর্নেল প্রীতম সিং, গুলজারা সিং, অ্যাডজুটান্ট আবিদ হাসান এবং কর্নেল হবিবর রহমানের সমভিব্যাহারে নেতাজী বিমানে ব্যাংকক থেকে সাইগনে পেঁছিলেন।

সাইগনে জেনারল ইসোদা নেতাজীর সহিত পুনরায় কিছু গোপন আলোচনা করলেন। নেতাজীর সহিত তাঁর যে ছয়জন সহযোগী সাইগনে এসেছিলেন তাঁরা নেতাজীর সিদ্ধান্তের বিষয় সম্বন্ধে অনবহিত রইলেন। আভাসে তাঁরা যেটুকু বুঝেছিলেন তাতে তাঁদের মনে হয়েছিল যে নেতাজী টোকিও যাচ্ছেন এবং সম্ভবত তাঁদেরও নেতাজীর সহিত টোকিও যেতে হবে।

যাত্রার জন্য নির্দিষ্ট বিমানটি সাইগন ছেড়ে যাবার ঘণ্টা কয়েক আগে, জেনারল ইসোদা নেতাজীকে জানালেন যে টোকিওগামী বিমানটিতে তাঁর জন্য একটিমাত্র আসন আছে। নেতাজীর সঙ্গী সহকর্মীদের তাঁর সঙ্গে লওয়া সম্ভবপর নয়।

এই নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ছিল অতীব অপ্রত্যাশিত। নেতাজী এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ গভীরভাবে চিন্তিত হলেন। জাপ-কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমেই পূর্বোক্ত ছয়জন সহকর্মীর সহিত নেতাজীর স্থানান্তর যাত্রার ব্যবস্থা স্থির হয়েছিল। হঠাৎ যাত্রার পূর্বমুহূর্তে

জাপ-কর্তৃপক্ষের গুরুতর মত পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট সকলকে বিস্ময়-বিমূঢ় করল। নেতাজী জাপ-কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁদের সিদ্ধান্তের রদবদলের জন্য অনুরোধ জানালেন। মার্শাল কাউন্ট তেরাউচির সহিত টেলিফোনে কথা বললেন, কিন্তু কোন ফল হল না। প্রকাশ, শেষ পর্যন্ত নাকি বিমানে আর একটি আসনের ব্যবস্থা হয়েছিল।

পূর্ব-এশিয়া ছেড়ে স্থানান্তর গমনের পরিকল্পনা গ্রহণ করবার পর, নেতাজীকে সম্পূর্ণরূপে জাপানের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল, তখন থেকে তাঁর কোন স্বাধীনতা ছিল না বললেই চলে।

যাত্রার পূর্বে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নেতাজী সহকর্মীদের সহিত শেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে পরামর্শ করলেন এবং তাঁদের সম্মতি গ্রহণ করে, নির্দিষ্ট বিমানে আরোহণ করলেন। সোনার বার ও মণিমুক্তাভরা আজাদ হিন্দ তহবিলের কয়েকটি পেটিও ঐ বিমানে তোলা হল। প্রকাশ, আজাদ হিন্দ ফৌজের ডেপুটি চীফ অব স্টাফ কর্নেল হবিবর রহমান নেতাজীর সহযাত্রী হয়েছিলেন।

১৭ই আগস্ট বেলা ৫টার সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে জাপ-বোমারু বিমানটি সাইগন বিমান বন্দর থেকে উড়ে গেল। বিমানখানি জাপ-সামরিক অফিসারের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল।

নেতাজীর শেষ পরিক্রমা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত হল স্বীকৃত তথ্য। তার পরের সংবাদ সংশয়যুক্ত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কর্নেল হবিবর রহমান শেষ পর্যন্ত নেতাজীর সঙ্গে ছিলেন কি না বিতর্কিত বিষয়।

নেতাজীর অন্যতম তরুণ সহকর্মী কর্নেল প্রীতম সিং যিনি সিঙ্গাপুর থেকে সাইগন পর্যন্ত নেতাজীর সহযাত্রী ছিলেন, শাহ্ নওয়াজ তদন্ত কমিশনের সামনে তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন—১৭ই আগস্ট অপরাহ্নে সাইগন বিমান বন্দরে নেতাজীর সহিত তাঁর শেষ সাক্ষাৎকার কালে তিনি স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে জাপানীরা নেতাজীকে একাকী কোন অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাচ্ছে। বিমান ক্ষেত্রের একটি

বিশ্রাম ঘরে নেতাজী একধারে একাকী বসেছিলেন, অপর প্রান্তে বসেছিলেন দুজন জাপ সামরিক অফিসার। নেতাজীকে বিমর্ষ ও চিন্তাচ্ছন্ন দেখা যাচ্ছিল। নেতাজীর সহকর্মীরা তাঁর সহযাত্রী হবার জন্য অতিশয় আগ্রহী ছিলেন। তাই কর্নেল প্রীতম সিং এ সম্বন্ধে নেতাজী জাপ-কর্তৃপক্ষের সহিত যে কথাবার্তা বলেছিলেন তার ফল কি হল জানতে চাইলে, নেতাজী প্রীতম সিংকে বললেন, "They are taking me to an unknown destination alone."

কর্নেল প্রীতম সিং এর জবানবন্দী বিশ্বাস করলে স্বীকার করতে হয়, এই ছিল ভারতীয়দের নিকট নেতাজী সুভাষচন্দ্রের শেষ বাক্যালাপ। পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত অতিশয় গোলমেলে এবং দারুণ অসঙ্গতিপূর্ণ।

॥ ১৩ ॥

১৯৪৫ সালের ২৩শে আগস্ট অর্থাৎ নেতাজীর সাইগন ত্যাগের ছয় দিন পরে, জাপানের সংবাদ-সংস্থা ডোমেই এজেন্সি পরিবেশিত সংবাদে টোকিও বেতার কেন্দ্র থেকে বলা হল :

> Mr. Bose, Head of the Provisional Government of Azad Hind, left Singapore on April 10, by air for Tokyo for talks with the Japanese Government. He was seriously injured when his plane crashed at Taihoku at 2 p.m. on August, 18. He was given treatment in hospital in Japan, where he died at mid night.
>
> [অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রধান, মিঃ বসু ১০ই আগস্ট সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে জাপান সরকারের সহিত আলোচনার উদ্দেশ্যে বিমানে টোকিও রওনা হন। ১৮ই আগস্ট বেলা ২টার সময় তাইহোকু বিমান বন্দরে ঐ বিমানটি ভেঙ্গে পড়ার ফলে তিনি গুরুতররূপে আহত হন। জাপানের একটি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা করা হয়। তিনি ঐ দিনই মধ্য রাত্রিতে মারা যান।]

২৪শে আগস্ট ভারতের দৈনিক পত্রিকাগুলিতে তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হল।

নেতাজীর রহস্য বিস্ময়ময় জীবনের কথা মনে রেখে তাঁর বিমান দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যুর সংবাদ অনেকের পক্ষেই সত্য বলে মেনে নেওয়া সম্ভবপর হল না। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী বললেন :

"I believe Subhas is still alive. He is bidding time and will come out at the right moment."

মহাত্মা সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পরিবর্তে কেবল প্রার্থনা করতে পরামর্শ দিলেন।

টোকিও বেতারে ঘোষিত পূর্বোক্ত মৃত্যু সংবাদের পরে, ২৫শে আগস্ট তাইহোকুর একমাত্র দৈনিক 'তাইওয়ান শিন পাও' পত্রিকায় জাপানের মিলিটারী ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর একটি প্রেস নোট প্রকাশিত হল। প্রেস নোটে বলা হল :

"The Chief of Independence Movement of Free India, Netaji Subhas Chandra Bose, desirous of a discussion with the Japanese authorities, took the plane from Chonun (Singapore) enroute Tokyo on August, 16. The plane crashed in the vicinity of Taihoku airport at 2 o'clock in the afternoon on August, 18. Mr. Bose who sustained severe injury, was sent to the local hospital for treatment. He died at zero-hour—the junction of August 18 and 19. On the same plane, there were Col. Habibur Rahaman, a senior aide, also badly burnt, Lt. General Shidei, a Japanese military officer, who died on the spot and four other Japanese officers who were either severely or slightly injured".

[আজাদ হিন্দ সংগ্রামের অধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জাপ কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার উদ্দেশ্যে ১৬ই আগস্ট তারিখে

বিমানে টোকিও অভিমুখে রওনা হন। ১৮ই আগষ্ট বেলা দুটার সময় তাইহোকু বিমান বন্দরের নিকটে ঐ বিমানটি ভেঙ্গে পড়ে এবং নেতাজী গুরুতর আহত হন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি ঐ তারিখে রাত্রি বারটার সময় মারা যান। বিমানের যাত্রীদের মধ্যে নেতাজীর সহযোগী কর্নেল হবিবর রহমানও আহত হন, জাপ সামরিক অফিসার লেঃ জেনারল শিদেই ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং অপর চারজন জাপানী অফিসার সকলেই অল্পবিস্তর আঘাত পান।]

দুটি সংবাদের পরিবেশন সূত্রই জাপান। প্রথম বার্তায় বলা হল—তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় আহত নেতাজীকে জাপানের হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয় এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু ঘটে। দ্বিতীয় বিবৃতিতে বলা হল—আহত নেতাজী স্থানীয় অর্থাৎ তাই-হোকুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানে নেতাজী মারা যান। সংবাদে জানান হল যে, নেতাজীর সঙ্গে কর্নেল হবিবর রহমান সহযাত্রী ছিলেন। তাছাড়া, সিঙ্গাপুর থেকে নেতাজীর যাত্রা তারিখ প্রথম বার্তায় ভ্রমক্রমে ১০ই আগস্ট বলা হয়েছিল তা সংশোধন করে যথাযথ ১৬ই আগস্ট বলা হল।

১৫ই আগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করে; আত্মসমর্পণের পর জাপানের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব, বিশেষ করে টোকিওর বেতার কেন্দ্র কি জাপানের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণে থাকা সম্ভবপর ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের সূত্রানুসন্ধান অনেকটা নির্ভর করে।

যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যাধ্যক্ষ ম্যাক আর্থার ১৯৪৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর টোকিওতে অবতরণ করেন এবং জাপানের রাষ্ট্র কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৫ই আগস্ট আত্মসমর্পণের দলিল সহি হবার পর, কার্যতঃ জাপানের স্বাধীন রাষ্ট্র কর্তৃত্বের বিলোপ ঘটেছিল। দখলদার ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির অনভিপ্রেত কোন কাজ জাপানের পক্ষে করা

তখন অসম্ভব ছিল বলেই মেনে নিতে হয়। দখলদার কর্তৃপক্ষ দণ্ড-বিধানের উদ্দেশ্যে যে সকল ব্যক্তিকে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য জাপানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারল তোজো ছিলেন। জাপানের আত্মসমর্পণের পরই তোজো হারিকিরি (আত্মহত্যা) করতে উদ্যত হলে, জাপান সরকার তাঁকে বাধা দেন এবং বন্দী করে দখলদার কর্তৃপক্ষের নিকটে সমর্পণ করেন। বিচারে জেনারল তোজোর প্রাণদণ্ড হয়। এ থেকে বোঝা যায়, আণবিক বোমা বিধ্বস্ত, পরাজিত জাপান সরকারের মনোবল কি পরিমাণে তখন ভেঙ্গে পড়েছিল। ধ্বংস শঙ্কিত জাপানের পক্ষে আত্মসমর্পণের পর নতুন করে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির ক্রোধের কারণ হওয়া কখনই সম্ভব ছিল না। নতুবা জেনারল তোজোকে পর্যন্ত পরাভূত জাপ-সরকার আত্মহত্যা করে মরবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন কেন? সুতরাং ২৩শে আগস্ট তারিখে টোকিও বেতারে তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ রটনার পিছনে জাপানের সঙ্গে দখলদার সামরিক কর্তৃপক্ষের যে হাত ছিল না তা বলা কঠিন। নেতাজী এবং তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি সংগ্রামে জাপানের সহায়তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিলেও বাস্তব-পন্থী ধারণাকে নস্যাৎ করা চলে না।

তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর সংবাদে বর্তমানে কেউই আস্থাশীল নয়। ১৯৭৮ সালের ২৮শে আগস্ট লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী মোরারজী দেশাই বলেন, "আমাদের বাস্তবপন্থী হতে হবে। নেতাজীর অন্তর্ধান নিয়ে এর আগে দুটি কমিশন হয়ে গিয়েছে। যদিও সেই কমিশন দুটির রিপোর্টে অনেক গোঁজামিল ছিল দেখে সরকার সেগুলি বাতিল করে দিয়েছেন। তা হলেও এ নিয়ে আর একটি কমিশন নিয়োগ করে কোন লাভ নেই।"

সংসদ সদস্য অধ্যাপক সমর গুহের অভিমত যে নেতাজী বেঁচে আছেন এবং তিনি মুক্ত অবস্থাতে আছেন, তাঁর সঙ্গেও প্রধান মন্ত্রী

এ বিষয়ে যে একমত নন সে কথাও প্রধান মন্ত্রী শ্রীদেশাই এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন।

[আঃ বাঃ পত্রিকা ২৯।৮।৭৮]

শাহ নওয়াজ কমিটির রিপোর্ট নিয়ে লোকসভায় বিতর্ক কালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুও বলেছিলেন—তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর বিষয় মেনে না নিলেও, নেতাজীর দীর্ঘ অনুপস্থিতি এবং তাঁর অস্তিত্বের অনুকূলে কোন তথ্য না থাকার কারণে স্বীকার করতে হয় যে নেতাজী বেঁচে নেই।

শাহ নওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের রিপোর্ট ভারতবাসীর নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং ভারত সরকারও তা অগ্রাহ্য করেছেন, সুতরাং ঐ দুটি তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে বিশদ বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রশ্ন কয়টিই স্বভাবতঃ এই সংবাদের সত্যতার প্রতিকূল।

(১) ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট নেতাজীর মৃত্যু হলে পাঁচ দিন পরে অর্থাৎ ২৩শে আগস্ট মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করা হল কেন? এবং দুইটি ঘোষণায় দুই রকম তথ্য পরিবেশিত হলই বা কেন?

(২) নেতাজীর মৃতদেহের ফটো রাখা হল না কেন?

(৩) নেতাজীর শেষকৃত্যের সময় স্থানীয় ভারতীয়দের ডাকা হল না কেন?

(৪) জাপানের আত্মসমর্পনের দলিলে দখলদার ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির নিকট নেতাজীকে অর্পণ করার যে শর্ত ছিল সেই শর্ত প্রমাণের জন্য জাপ-কর্তৃপক্ষের উচিত হত নেতাজীর মৃতদেহের ফটো রাখা এবং তাড়াতাড়ি গোপন ভাবে মৃতদেহের সংকার না করে স্থানীয় জনসাধারণ ও বিশিষ্ট বৈদেশিকদের জ্ঞাতসারে মৃতদেহ দাহ করা। তাহলে জাপ-সরকারের কোন দায়িত্ব কিংবা তার সততায় সন্দেহ আরোপের কোন কারণ থাকত না।

তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর আঘাতপ্রাপ্তি, তাইহোকু হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা, নেতাজীর মৃত্যু এবং মৃতদেহের শেষকৃত্য সম্পাদন সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের সামনে প্রদত্ত কর্ণেল হবিবর রহমান সহ ভারতীয় ও জাপানী সাক্ষীদের অসংলগ্ন এবং পরস্পর বিরোধী জবানবন্দীগুলি পাঠ করলে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুকে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা সাজানো কাহিনী বলে স্বতঃই মনে হবে।

১৯৫২ সালের ৫ই মার্চ লোকসভার অধিবেশনে শ্রী এইচ. ভি. কামাথের প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেন, "নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু সম্পর্কে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই, এ সন্দেহ আগেও ছিল না, এখনো নেই। আমি মনে করি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু অবধারিত সত্য।"

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা জনচিত্তকে শান্ত করতে পারল না। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং টোকিওতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক আদালতের অন্যতম বিচারপতি ডঃ রাধাবিনোদ পাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই জাপানে গিয়েছিলেন এবং জাপানে অবস্থানকালে বিমান দুর্ঘটনা জনিত নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী তথ্যাদি সমীক্ষান্তে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর সংবাদের অসারতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ডঃ পাল প্রকাশ্যে বললেন —"আমি ফরমোসায় নেতাজীর মৃত্যু কাহিনীকে সত্য বলে স্বীকার করতে পারি নাই। সে যাই হোক, আমি মনে করি সমস্ত বিষয়টি একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি রাখে। কাহিনীর সত্যতা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির এখানে ওখানে প্রদত্ত বিবৃতির দ্বারা আমার সন্দেহের নিরসন হবে না। আমার অবিশ্বাসের পিছনে সঙ্গত কারণ আছে।"

১৯৫৫ সালের ৬ই অক্টোবর শ্রী এইচ. ভি. কামাথ জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান তদন্তের দাবির কথা উল্লেখ করে ভারত সরকারের মনোভাব জানতে চাইলে, প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু বলেন, "এ বিষয়ে সত্যিকার তদন্ত করতে পারে একমাত্র জাপান সরকার। ঘটনার স্থান জাপান, সব কিছু হয়েছে সেখানে। আমরা এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারি না। অবশ্য জাপান যদি তদন্ত করতে চায় তাহলে আমরা তাদের সঙ্গে সানন্দে সহযোগিতা এবং সাধ্যানুসারে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু আমরা শুধু শুধু জাপানে গিয়ে তদন্ত করতে পারি না, বিশেষ করে যখন সম্ভাব্য সকল সাক্ষীই জাপান সরকারের অফিসার অথবা জাপ-সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি।"

১৯৫৬ সালে অর্থাৎ তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার ১১ বছর পরে, জনমতের চাপে নেহেরু সরকার শাহ নওয়াজ খানকে সভাপতি, শ্রী এস. এন. মৈত্র আই. সি. এস. এবং নেতাজীর অগ্রজ শ্রীসুরেশ চন্দ্র বসুকে সদস্য করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেন। কমিটি ভারত, জাপান এবং পূর্ব এশিয়ার নানা স্থানে উপস্থিত হয়ে সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ এবং সরকারী বেসরকারী তথ্যাদি পরীক্ষা করলেন। গেলেন না শুধু তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার অকুস্থল ফরমোসার তাইহোকুতে। নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু সম্পর্কে কমিটির সদস্যগণ একমত হতে পারলেন না। শাহ নওয়াজখান এবং এস. এন. মৈত্র তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুকে মেনে নিয়ে রিপোর্ট দিলেন। অপর সদস্য সুরেশচন্দ্র বসু সাক্ষীদের জবানবন্দীর মধ্যে গুরুতর অসঙ্গতি লক্ষ্য করে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু কাহিনীকে স্বীকার করে নিতে পারলেন না এবং তাঁর অভিমত একটি পৃথক রিপোর্টে প্রকাশ করলেন।

১৯৬২ সালের ১৩ই মে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু শ্রীসুরেশচন্দ্র বসুর এক পত্রের জবাবে তাঁকে লিখলেন :

"You ask me to send you proof of Netaji Subhas

Chandra Bose's death. I cannot send you any precise and direct proof. But all the circumstantial evidence that has been produced and which has been referred to in the Enquiry Committee's report has convinced us of the fact that Netaji died. In addition to this, the lapse of time and extreme improbablity of his being alive and living secretly somewhere, when he would be welcomed in India with great joy and affection, adds to the circumstantial evidence".

[আপনি আমার নিকট নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যুর প্রমাণ জানতে চেয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর কোন নিশ্চিত এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি দিতে পারি না। তদন্ত কমিটির সামনে উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণ দেখে নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। তাছাড়া এই দীর্ঘকাল ভারতবর্ষ যখন তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে উন্মুখ তখন তিনি অন্যত্র আত্মগোপন করে কালাতিপাত করছেন এমন ধারণার অবাস্তবতাও উপরোক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল।]

সংসদ সদস্য অধ্যাপক সমর গুহের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭০ সালের ১১ই জুলাই পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী জি. ডি. খোশলাকে নিয়ে নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে একজনের একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেন। তথাকথিত ঘটনার পঁচিশ বছর পরে গঠিত খোশলা কমিশন রহস্য উদ্‌ঘাটনে নতুন আলোর সন্ধান দিতে পারলেন না এবং শাহ নওয়াজ খান কমিটির অভিমতকেই বহাল রাখলেন। তদন্তকালে বিমান দুর্ঘটনা জনিত নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কিত সাক্ষ্য ও দলিল পত্রের অসঙ্গতি আরো বেশি করে ধরা পড়ল। যে বিষয়টি সব চেয়ে অধিক চমক সৃষ্টি করল তা হল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর বিশেষ দপ্তরে নেতাজীর অন্তর্ধান সম্পর্কিত অনেকগুলি গোপন সরকারী

নথির অবলুপ্তির ঘটনা। এই নথিগুলির মধ্যে একটি ছিল—'Investigation into the circumstances leading to the death of Subhas Chandra Bose'

তদন্ত কমিশনের সামনে গোপন নথিগুলি দাখিল করতে না পারার কারণ হিসাবে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল—নথিগুলি 'missing or destroyed.'। বলা বাহুল্য প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর খাস দপ্তরের এই গোপন নথিগুলি কমিশনের হাতে এলে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের আবরণ উন্মোচনের সহায়ক হত।

নথিগুলির অবলুপ্তিকরণ থেকে এই অনুমান দৃঢ়তর হয় যে নেতাজীর মৃত্যু তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় ঘটেনি, ঘটেছিল ভিন্নতর কারণে, অথবা আদৌ তাঁর মৃত্যু হয়নি এবং তদনান্তীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু সে বিষয় অবগত ছিলেন। কূটনৈতিক কারণে নেতাজীর অন্তর্ধান সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রকাশ ভারত সরকারের পক্ষে হয়ত সম্ভব ছিল না।

নেতাজীর শেষ পরিণাম সম্পর্কিত ব্যাপারটি একটি আন্তর্জাতিক গোপন কূটনৈতিক চক্রান্তের বিষয় বস্তু। বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুকাহিনী বাতিল করলে, তাঁর পরিণাম সম্বন্ধে যে দুটি সম্ভাবনা জনমানসে উদিত হয়, তার একটি হল, জাপানের সাহায্যে নেতাজী মাঞ্চুরিয়া হয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়েছিলেন ; অপরটি হল জাপানের হাতে বন্দী অবস্থায় তিনি টোকিও কিংবা অন্য কোন স্থানে দখলদার ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পিত হয়েছিলেন এবং সেখানে সামরিক আদালতের সংক্ষিপ্ত গোপন বিচারে নেতাজীর প্রতি চরম দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সেই জঘন্য কাজকে চাপা দেবার উদ্দেশ্যে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর সংবাদ রটনা।

লোকসভার প্রাক্তন সদস্য ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ ১৯৬৫ সালের জুন মাসে কলিকাতায় এক জনসভায় বলেন, নেতাজী জীবিত

আছেন, তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু ঘটেনি। সুভাষ বসু এখন সাইবেরিয়ার রুশ বন্দীশালায় ৪৫নং সেলে বাস করছেন। নেতাজী সাইগন ত্যাগের পর রুশ অঞ্চলে প্রবেশ করলে রুশ সৈন্যদের হাতে বন্দী হন এবং পরে সোভিয়েত রুশ সরকারের নির্দেশে তাঁকে একটি পৃথক নামে সাইবেরিয়ায় কারারুদ্ধ করা হয়। এম. এন. রায়ের সহকর্মী রাশিয়া প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী শ্রীঅবনী মুখার্জি স্তালিনের নিকট নেতাজীর মুক্তির জন্য আবেদন করায় তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

—অমৃত বাজার পত্রিকা, ২৯-৬-৬৫।

সোভিয়েত রুশ সরকারের পক্ষ থেকে কয়েকদিন পরেই একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানান হয় যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর শেষ পরিণাম সম্পর্কে রুশ সরকার কিছুই অবগত নন এবং এই ব্যাপারের সহিত রুশ সরকার কোন ভাবে জড়িত নন।

সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত নেতাজীর শত্রুতা ছিল না। নেতাজীর ত্রি-শক্তি শিবিরে যোগদান যে একান্ত ভাবে স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দেশ্যে ছিল, সে সত্য রাশিয়ার নিকট অবিদিত ছিল না। সোভিয়েত রাশিয়া বরাবর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে রাশিয়া এবং তার যুদ্ধ কালীন মিত্র ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধও দেখা দিয়েছিল। এরূপ অবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করতে যাবে কেন? এবং তা করলেই বা অনন্তকাল তাঁকে বন্দী করে রাখবে কেন? নেতাজী যদি রাশিয়ায় চলে যেতে সক্ষম হতেন তাহলে এই দীর্ঘকাল তিনি আত্মপ্রকাশ না করে সেখানে গোপনে অবস্থান করবেনই বা কেন?

অদম্য আত্মশক্তিদৃপ্ত অসাধারণ পুরুষ নেতাজীর পক্ষে এত দীর্ঘকাল বন্দী অথবা নিয়ন্ত্রণ-শাসিত জীবন যাপন কি তাঁর চরিত্র-

বিপরীত ধারণা সম্ভূত নয় ? নেতাজীর রাশিয়ায় অবস্থান সম্পর্কে যে সব তথ্যের অবতারণা করা হয় তার কোনটিও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সমর্থিত নয়। সুতরাং সেই সব তথ্য ভিত্তি বিহীন, সেগুলিকে জোড়াতালি দিয়ে ঈপ্সিত অভিমতের জন্য একটি কষ্টকল্পিত পাদভূমি তৈরি করা গেলেও কার্যতঃ সত্যনির্ধারণের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না।

১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের সময় চীনা সৈন্য বাহিনীর সহিত এশীয় মুক্তি ফৌজের উপস্থিতির কথা শোনা গিয়েছিল। সংবাদপত্রে এ খবরও বেরিয়েছিল যে হামলাকারী বিপক্ষ ফৌজের জওয়ানরা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ভারতীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিদ্রোহের উস্কানি দিত। ভারতীয় বাহিনীর এক বৃহৎ অংশের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিস্ময়কর ভাবে নিখোঁজ হয়ে যাবার সংবাদও ঐ সময় প্রকাশিত হয়েছিল। তথাকথিত মুক্তি ফৌজের সহিত নেতাজীর নামও যুক্ত করা হয়েছিল। তবে অনেকের নিকটেই এসব চীনা-প্রচার ছাড়া অন্য কিছু মনে হয়নি। চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ সম্পর্কে ভারত সরকারের সৌজন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনানায়ক হেণ্ডারসন ব্রুকস্ একটি তদন্ত করেন। ঐ তদন্তের রিপোর্ট ভারত সরকার প্রকাশ করেন নি। রিপোর্ট প্রকাশিত হলে হয়ত কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য জনসাধারণ জানতে পারত।

চীন-ভারত সংঘর্ষের পরই উত্তর বাংলার শৌলমারী আশ্রমের সাধু সারদানন্দকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলে চালাবার একটা চেষ্টা হয়। আশ্রমের জটিল পরিচালন ব্যবস্থা, বিপুল ব্যয় এবং সাধুর গতিবিধি সাধারণের মধ্যে প্রচুর আগ্রহ জাগায়। জনতার চাপে আশ্রম কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, সাধু সারদানন্দ নেতাজী নন। তারপর, কলিকাতার আদালতে সারদানন্দকে সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে একটি মামলা দায়ের হলে আদালতে হাজির হবার জন্য সাধু সারদানন্দের নামে পরোয়ানা বের হয়। সারদানন্দকে তখন আশ্রমে খুঁজে পাওয়া যায় না,

পরোয়ানা গরজারী হয়ে আদালতে ফিরে আসে এবং সেই সঙ্গে শৌলমারীর ভ্রান্তিকর চক্রান্ত নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

শৌলমারী আশ্রমের ব্যাপারটি ছিল নিঃসন্দেহে রহস্যপূর্ণ। কে বা কাহারা শৌলমারী আশ্রমের বিপুল ব্যয়ভার জুগিয়েছিল এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী প্রচারের পশ্চাতে ছিল ?

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াসকে ব্যাহত করার উদ্দেশ্যই যে এ জাতীয় চক্রান্তের মূলে তা অনুমান করতে বেশি অসুবিধা হয় না। 'নেতাজী জীবিত আছেন এবং তিনি শীঘ্রই আত্ম-প্রকাশ করবেন,' 'নেতাজীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়েছে' 'নেতাজীর সহিত আমার পত্রালাপ চলছে' ইত্যাদি নানা আশ্বাসবাণী নানাজনের নিকট থেকে ইতিপূর্বে অনেকবার শোনা গিয়েছে। তবে এ সকল বিবৃতি এখন আর মনে দাগ কাটে না। এগুলিকে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী চেষ্টার অঙ্গ বলেই মনে করতে হয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণের সহিত জড়িত ছিলেন না, সুতরাং তিনি যুদ্ধাপরাধী হতে পারেন না। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের বিদ্রোহী প্রজা এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান চালাবার অপরাধে অপরাধী। তাঁর দণ্ডবিধান ছিল ব্রিটিশ সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। ১৯৪৫ সালের আগস্টে যুদ্ধজয়ী ব্রিটিশের নিকট ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগের কথা ছিল কল্পনার অতীত। আরো বেশ কিছুকাল ইংরাজ যে ভারতবর্ষের উপর তার অধিকার কায়েম রাখতে পারবে সে সম্বন্ধে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না এবং সেই কারণে সাম্রাজ্যের ঘোরতর শত্রু সুভাষচন্দ্রকে ব্রিটিশ যে কোন প্রকারে ফাঁসী দিতে দৃঢ়সংকল্প ছিল। এমন কি আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদেরও ব্রিটিশ চরম দণ্ড দেবার উদ্দেশ্যে সামরিক আদালতে তুলেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নেতাজী পরিচালিত আজাদ হিন্দ সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন এবং মুক্তি অভিযান কালে আজাদ

হিন্দ ফৌজের হাতে ব্রিটিশ সৈনিকদের সহিত মার্কিন সৈনিকও নিহত হয়েছিল। সেই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতেও নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন চরম অপরাধী।

বর্তমান কালে যুদ্ধরত জাতির নিকট ন্যায় বিচার, আদর্শ ভাবনা এবং নৈতিক মূল্যবোধের কোন স্থান নেই বললেই চলে। নিরন্তর ধ্বংস ও হত্যার পটভূমিতে মানুষের মন থেকে উচ্চতর চিন্তা বিলুপ্ত হয়, সেখানে জেগে ওঠে উগ্র পাশবিক প্রকৃতি, প্রতিহিংসার আদিম বর্বর প্রবৃত্তি। এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় বিবেক বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

জাপান নেতাজীকে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির হাতে তুলে দিতে চুক্তিবদ্ধ ছিল। সুতরাং আত্মসমর্পণের পর, জাপানের পক্ষে নেতাজীকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর ছিল না বলেই ধরে নিতে হয়। নেতাজীর জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল বস্তুতঃ কোথায়ও ছিল না। ব্রিটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়া তাদের সহযোগী রাষ্ট্রগুলির সহিত সমগ্র পৃথিবীর উপর তখন অধিকার স্থাপন করেছিল। নেতাজীকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে জাপান সত্যি যদি আগ্রহশীল হত, তাহলে তা তারা করত নেতাজীর অনুরোধকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে, আত্মসমর্পণের এবং জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে।

আণবিক বোমার বিভীষিকা এবং সামরিক বিপর্যয় জাপানকে নিদারুণ জাতীয় সংকটের মধ্যে ফেলেছিল, তখন স্বাভাবিক কারণেই বিগত-প্রয়োজন মৈত্রী সম্পর্ক ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন প্রশ্নই তার নিকট ছিল না, সর্বনাশা ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের চিন্তাই জাপানকে সম্পূর্ণরূপে পেয়ে বসেছিল, মনে করলে ভুল হবে না।

নেতাজী জাপানের আত্মসমর্পণের পর, আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানী ও মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের সহিত সিঙ্গাপুরে ব্রিটীশের নিকট আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। একের পর এক জাপানী

উচ্চপদস্থ অফিসর এসে তাঁকে বুঝিয়ে, নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবার আশ্বাস দিয়ে, নেতাজীর পূর্ব সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন এবং তাঁকে সাইগনে নিয়ে গিয়েছিলেন। সিঙ্গাপুর ত্যাগের সময় নেতাজীর সহিত তাঁর যে ছয়জন সহকর্মীকে সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা জাপ-কর্তৃপক্ষ করেছিলেন, সাইগনে পৌঁছবার পর তাও নাকচ করে দেওয়া হয়েছিল। জাপানের এই আচরণের পিছনে তার সদিচ্ছার কথা যেমন ভাবা যায়, তেমনি তার ভিন্নতর অভিসন্ধির বিষয়ও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নেতাজীর প্রতি জাপ-কর্তৃপক্ষের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপানের সাহায্যের বিষয় কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করেও জাপানের পরিবর্তিত অবস্থার কারণে একথা ভাবতে হয়।

॥ ১৪ ॥

১৯৭৬ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত ঐতিহাসিক নথিপত্র প্রকা।শত হয়। ঐ নথিপত্রের ষষ্ঠ খণ্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশের হস্তে অর্পিত হলে ব্রিটিশ সরকার নেতাজীকে কি দণ্ড দেবে সে সম্বন্ধে কিছু গোপন তথ্য আছে। ঐ তথ্যের সারাংশ ১৯৭৬ সালের ২০শে আগস্ট স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্টেটসম্যানের সংবাদটি নিম্নে উদ্ধৃত হল :

British Dilema over Netaji's Trial

London, Aug. 23—The British Government had one time considered the possibility of having Subhas Chandra Bose tried and hanged outside India—in Malaysia or Singapore, reports Samachar.

But the fear that it would be accused of judicial murder and that such a course might lead to severe long-term political consequences prompted the Home Department in New Delhi to think other alternatives.

This dilema over the treatment of Bose in the event of his being handed over by the Japanese after

their surrender in World War I is revealed in the sixth volume of the historical records relating to the transfer of power to India, published here recently.

A note written by Mr. R. F. Mudie, Home Member in the Government of India, on August, 23 1945, to Sir E. Jenkins, Private Secretary to Lord Wavell, then viceroy, said :

"There is more to be said for detention and internment somewhere out of India. Out of sight would be to some extent out of mind and agitation for his release might be less."

This note was in response to Mr. Jenkin's letter in which he made a reference to the surrender list of 'traitors' whom the Government of India wished to be handed over to it and to the treatment of Bose and his Indian National Army associates. Mr. Jenkins had suggested that Lord Wavell was not at all sure that Bose and his immediate associates should be returned to India for trial. The viceroy thought it would be better to have them dealt with as war-criminals outside India.

Mr. Mudie's note said, "As regards the treatment of Bose, there are the following possibilities : (i) bring him back to India and try him either for waging war or under Enemy Agents' Ordinance ; (ii) have him tried by a Court in Burma or Malaya for waging war against the king of the country ; (iii) have him tried

by a military Court outside India ; (iv) intern him in India ; (v) intern him in some other British possession, for example, Seychelles islands ; (vi) leave him where he is and do not ask for his surrender.

"I do not think that there is any chance of Bose being hanged if he were tried in India. The pressure for his release would be too great. Also his trial would result in great publicity for his doings, motives etc. On the other hand, trial in India would be a straight forward coarse and the trial as such could not be criticized. If it is accepted, the execution would in the end, be impossible then reprieve him immediately after conviction, to forestall agitation, would be the best course".

The note added : "It is extremely unlikely that the Government of Burma, which is engaged in appeasing the Burma National Army, would agree to try Bose and even more unlikely that, if they did, they would hang him. The Government of Malaya might possibly have no such scruples, and we might get a hanging if His Majesty's Government agreed to ignore agitation in India and Parliament, however strong.

"But a trial in Singapore would cause almost as much agitation in this country as a trial here unless it was held in Camera and no news released till after his execution. But in that case we would be said—

and truly said—that we had kept the proceedings secret to prevent his friends and supporters from doing all they could to save his life. Also, what reason could be given for trying Bose outside India when the leaders of I. N. A. are to be tried openly in India ? The long-term political consequences of this course might be serious.

Obvious Subterfuge

"Trial and execution by a military Court outside India would be open to similar objections but to a less degree, as the trial would presumably be less prolonged and military punishments are expected to be more severe than civil ones. Again, trial by a military court would suggest that his crime was killing our soldiers, whereas trial by Civil Court at once raises the independence issue. On the other hand this would be an obvious subterfuge and it is unlikely the military would lend themselves to it.

"Interning Bose in India would lead only to an agitation to let him out and to his release after a short time. He might then escape to Russia, as he did in 1940. There would be also the usual agitation for a trial and we would incur the odium of detention without trial".

The note continued : "There is more to be said for detention and internment somewhere out of India. Out of sight would be to some extent out of mind

and agitation for his release might be less also. Escape to Russia would be difficult.

"In many ways the easiest course would be to leave him where he is and not ask for his release. He might, of course, in certain circumstances, be welcomed by the Russians. This course would raise first immediate political difficulties, but security authorities consider that in certain circumstances his presence in Russia would be so dangerous as to rule it out altogether."

The note concluded : "The choice seems to be between deporting and interning him outside India or trying him in India and commuting his death sentence. The two might be combined and Bose deported (or transported) after conviction. There would be considerable long-term advantages in a trial, but reprieve might raise the question of why military officers who joined Bose's Army should be hanged. The answer would be that their position in the Army greatly aggravated their offence, but this might not be accepted by the Army."

দীর্ঘ ত্রিশ বছর পরে প্রকাশিত এই ব্রিটিশ তথ্য নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের সঠিক হদিস না দিলেও, সূত্রানুসন্ধানে কিছুটা সাহায্য করে। তদানীন্তন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ আর. এফ. মুডির গোপন প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করলে নেতাজীর পরিণাম সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি অবগত হওয়া যায়।

(১) প্রতিবেদনটির তারিখ ১৯৪৫ সালের ২৩শে আগস্ট এবং প্রতিবেদনটি বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্যার ই. জেনকিংসের বরাবর লিখিত।

(২) যে তারিখে প্রতিবেদনটি লেখা হয়, সেই ২৩শে আগস্ট তারিখেই জাপানী সংবাদ সংস্থা কর্তৃক তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ টোকিও বেতার থেকে ঘোষিত হয়। মনে হয়, ভারত সরকার তখনও বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ অবগত হননি, নতুবা প্রতিবেদনে তার উল্লেখ থাকত।

(৩) আলোচ্য প্রতিবেদনটি লিখবার সময় ভারত সরকার জানতেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বন্দী অবস্থায় একটি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আছেন। তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় যেতে সক্ষম হন নি।

(৪) ব্রিটিশ সরকার যে কোন প্রকারে ভারতের বাইরে নেতাজীর বিচার পর্ব গোপনে সমাধা করে তাঁকে প্রাণদণ্ড অথবা নির্বাসন দণ্ড দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়ে দিতে মনস্থ করেছিলেন।

(৫) বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে নেতাজী যেখানে বন্দী অবস্থায় ছিলেন তাঁর হস্তান্তর দাবি না করে, সেখানেই তাঁকে সেই অবস্থায় রাখবার কথাও প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল।

(৬) আত্মসমর্পণের প্রস্তাব বিবেচনা কালে, ব্রিটিশ সরকার জাপানের নিকট যে সকল ব্যক্তিকে তাদের হাতে তুলে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন।

(৭) নেতাজীর রাশিয়া গমনে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী ছিলেন এবং নেতাজী যাতে রাশিয়ায় যেতে না পারেন তার জন্য তাঁরা যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন।

ব্রিটিশ তথ্যটি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ঘটেনি এবং জাপানের সাহায্যে নেতাজীর রাশিয়ায় গমনও সম্ভব হয়নি। এর পরই প্রশ্ন আসে নেতাজী কোন্ রাষ্ট্রের

হাতে তখন বন্দী ছিলেন? সে প্রশ্নের উত্তরও প্রতিবেদনটিতে আভাসে দেওয়া আছে—রাষ্ট্রটি জাপান।

ব্রিটেনে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রী এন জি. গোরে এবং আরো অনেকে মিঃ মুডির প্রতিবেদনটি পড়ে তাই বুঝেছেন। শ্রীগোরে ১০।২।১৯৭৮ তারিখে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বক্তৃতাদান কালে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত ভাষণ দেন। ভাষণটি ১১।৪।৭৮ তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রিপোর্টটি নিম্নে উদ্ধৃত হল :

A new Turn in Controversy over Netaji's Fate

Vienna, April, 11 :—The Indian High Commissioner in Britain, Mr. N. G. Goray introduced a new element into the controversy surrounding the fate of Netaji by pointing out that a 'top secret' note of the Government of India written within a week of the reported air crash, had contemplated the possibility of bringing back Netaji for trial, reports Samachar.

Mr. Goray who was speaking at a week-end seminar, hastened to add that "he was not suggesting that 'Subhas Babu' was alive but 'whether alive or dead', the Indian people would like to know what had happened to one of their foremost leaders—did he die in the crash or spend the rest of his life in some prison ?"

On the other hand, Mrs. Anita Pfaff, daughter of Netaji, who attended the seminar, said that she had little doubt that her father was no longer alive.

But what had happened in August, 1945 was a 'big question mark'.

Mr. Goray said that the note recorded by the Home member of the then Viceroy's Executive Council, Mr. R. F. Mudie, on August 23, 1945, and addressed to the British Government, had asked whether they should urge the Japanese to hand back Netaji and whether he should be brought back to India or sent to some remote island.

The note said: "There is more to be said for detention and internment somewhere out of India. Out of sight would be to some extent out of mind and agitation for his release might be less.

The then viceroy, Lord Wavell was of the view that it would be better to have Netaji and his close associates dealt with as war criminals outside India.

Mr. Goray said the question was whether the Government of India at that time really knew that Netaji did not die but escaped to some other place. "If he had died, why should they contemplate the possibility of bringing him back to face trial?"

সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে, যখন জাপান ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সহিত যুদ্ধ বিরতি সম্পর্কে কথাবার্তা চালাচ্ছিল, জাপানের হাতে বন্দী দশায় না থাকলেও, নজরবন্দী অবস্থায় ছিলেন। জাপানের সদিচ্ছার উপরই তাঁকে সম্পূর্ণভাবে

নির্ভর করতে হয়েছিল এবং জাপান তখন যুদ্ধে পরাভূত এবং ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত চুক্তিতে দায়বদ্ধ ছিল।

১৯৫৫ সালে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু লোকসভায় নেতাজীর অন্তর্ধান সম্পর্কে তদন্তের দাবির উত্তরে বলেছিলেন—"ঘটনার স্থান জাপান, সব কিছু হয়েছে সেখানে ; এ বিষয়ে সত্যকার তদন্ত করতে পারে একমাত্র জাপান সরকার।" প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর এই উক্তি অতীব অর্থপূর্ণ। কূটনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে এর চেয়ে বেশি বলা হয়ত তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। 'নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু অবধারিত সত্য' নেহেরুজীর এ উক্তিও গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪৫ সালের ২৩শে আগস্ট বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশের পর, ব্রিটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক গোয়েন্দা দপ্তর থেকে নেতাজীর অনুসন্ধানে পূর্ব এশিয়ায় দুই দল অফিসার প্রেরিত হয়েছিল জানা যায়। এই তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়না যে, ব্রিটিশ সরকার সত্যই নেতাজী বসু কি অবস্থায় কোথায় আছেন বা তাঁর কি হয়েছে সে বিষয়ে অবিদিত ছিলেন। নেতাজীর সন্ধানে গোয়েন্দা দল প্রেরণ মূল ঘটনার উপর সন্দেহের আবরণ সৃষ্টির কৌশলও হতে পারে, যেমন ছিল সুপরিকল্পিত বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ। কারণ ব্রিটিশ সরকার তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করে কোন প্রতিবাদ উত্থাপন করেন নি। এ থেকে অনুমিত হয়, জাপ সংবাদ সংস্থা কর্তৃক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর সংবাদ রটনার পিছনে খুব সম্ভব ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিরও হাত ছিল।

১৯৪৫ সালের ২৫শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটেলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনে পূর্বোক্ত মিঃ মুডির প্রতিবেদনটি মূলতঃ অনুমোদিত হয়। তাহলে কি ধরে নেওয়া যায় যে ২৫শে অক্টোবর পর্যন্ত নেতাজী সুভাষচন্দ্র জীবিত এবং কোথায়ও বন্দী অবস্থায় ছিলেন? এ সম্পর্কে হাঁ বা না বলা

খুবই শক্ত। প্রশাসন ব্যবস্থায় জরুরী কাজ সমাধা হবার পর, কাজের জন্য মামুলী আদেশনামা ও অনুমোদন দানের বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

খোসলা কমিশনের নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, সিঙ্গাপুর ত্যাগের সময় নেতাজীর সহিত লক্ষাধিক ইয়েন (জাপানী মুদ্রা) এবং স্বর্ণ ও রত্নপূর্ণ চারটি পেটি ছিল। সাইগন থেকে বিমান যাত্রা কালেও পেটিগুলি নেতাজীর সঙ্গে ছিল। এ সম্পর্কে জাপানী সূত্রে বলা হয়, পেটির স্বর্ণ ও রত্নালংকারগুলি তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনার পর বিমান ক্ষেত্রে ছিটকে, ছড়িয়ে পড়ে এবং সেগুলি কুড়িয়ে বাক্সবন্দী করে টোকিও আনা হয়। পরে টোকিওস্থ জনৈক ভারতীয় শ্রী জে. রামমূর্তির নিকট স্বর্ণ ও রত্নের বাক্স জমা রাখা হয়। পরে সেগুলি প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর হস্তে অর্পিত হয়। শ্রীনেহেরু স্বর্ণ ও রত্নের পেটি জাতীয় মহাফেজখানায় জমা দেন।

সম্প্রতি ঐ স্বর্ণ ও রত্নের পেটি প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই-এর নির্দেশে খোলা হয়েছে এবং সে সম্বন্ধে নিম্নোক্ত রিপোর্টটি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

Netaji's Treasure

Express News Service

New Delhi.
Oct, 25, 1978

The treasure chest which Netaji Subhas Chandra Bose had taken with him on his last flight to Tokyo was opened at the National Museum recently at the instance of Prime Minister Morarji Desai. It had been lying in the Museum for the last 24 years.

It is reported that the black steel box, half burnt

in the air crash in which Nataji is believed to have died, contained diamonds and jewellery worth several lakhs of rupees, given to Netaji by Indian residents in south-east Asia for freedom struggle. Sources close to the National Museum confirmed that the box was full of gold bangles, ear-rings, chains etc. They were charred, but were still valuable.

Asked why the treasure was lying in the museum for such a long period, a spokesman said Jawaharlal Nehru had sent a box marked 'secret' to the Museum and thereafter nobody touched it.

It is reported that there are two more boxes. But museum officials are not aware of these.

Mr. Desai's action followed criticism by Janata M. P. Subramaniam Swamy a few months ago that Netaji's treasures were handed over to Nehru who, he alleged, misappropriated them.

—Indian Express, 27. 10. 78.

অর্দ্ধদগ্ধ স্বর্ণালংকারগুলি সম্বন্ধে আলোচনার কি আর এমন আছে। সকলই ত সেই বিমান দুর্ঘটনার কাহিনীর সহিত যুক্ত। মানুষটিই যখন হারিয়ে গেলেন তখন তাঁর রত্ন পেটির কথা ভেবে কি বা লাভ। স্বর্ণালংকারগুলি সনাক্তকরণ হলে এইটুকু শুধু বোঝা যাবে যে নেতাজী তাঁর শেষ বিমানযাত্রার শেষে কোন নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পৌঁছাতে সক্ষম হন নি। জীবিত অথবা আহত অবস্থায় টৌকিওতেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

সংসদ সদস্য অধ্যাপক সমর গুহ তাঁর 'Netaji Dead or

Alive' গ্রন্থে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনা জনিত নেতাজীর মৃত্যুর ভ্রান্তিকর সংবাদ, দুটি তদন্ত কমিশনের গুরুতর ত্রুটি বিচ্যুতির বিষয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্যের সুন্দর বিশ্লেষণ করলেও, দৃঢ়তার সহিত কোথায়ও বলতে পারেন নি যে নেতাজী বেঁচেই আছেন। সামরিক সংক্ষিপ্ত বিচারের দণ্ডাদেশ বলে নেতাজী নিহত হয়েছিলেন অথবা বন্দীদশায় তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে এমন তথ্যের অনুকূলে প্রকৃষ্ট প্রমাণ না পাওয়ার একমাত্র কারণেই ভাবতে হয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বেঁচে আছেন। তবে এই ভাবনা অসহায় ব্যথিতের, একান্ত নৈরাশ্য পীড়িতের ঐচ্ছিক বিশ্বাস সম্বল সান্ত্বনা মাত্র।

গত ২৮/৮/৭৮ তারিখে অধ্যাপক সমর গুহ লোকসভায় বলেছেন, "নেতাজী সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘদিনের তত্ত্ব তল্লাস এতদিনে সফল হয়েছে। ঐ দিনই তিনি জানতে পেরেছেন নেতাজী বেঁচে আছেন এবং তিনি মুক্ত অবস্থাতেই রয়েছেন। দেশবাসী খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে সব কিছু জানতে পারবেন। আর কিছু বলতে সমরবাবু অস্বীকার করেন। বলেন, দুঃখিত, এখনই আর কিছু প্রকাশ করার অধিকার আমার নাই।"

—আনন্দ বাজার পত্রিকা, ২৮/৮/৭৮

অধ্যাপক সমর গুহ যা বলেছেন ইতিপূর্বে একাধিক নেতাজী সুভাষ অনুরাগী সুধীজনের মুখ থেকে তা শোনা গিয়েছে। আশা মরীচিকা বৃথাই তৃষাতুর করেছে জনমন। তবু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বেঁচে আছেন এ কথা শুনতেও ভাল লাগে।

জীবনের শেষে মৃত্যু আছে, আছে বিস্মৃতি কালপ্রবাহ। কিন্তু পৃথিবীতে অতি অল্প-সংখ্যক কিছু মানুষ জন্মেছেন যাঁরা লৌকিক সত্তার অবসানে মানব স্মৃতিলোকে চিরজীবন লাভ করেছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই বিশ্ববরেণ্য মহামানবদের অন্যতম।

ইতিহাস পুরুষ নেতাজীর মৃত্যু নেই। নেতাজী মৃত্যুঞ্জয়, ভারতের স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ। ভারত আত্মায় তাই এখনও ধ্বনিত হচ্ছে—

"তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্‌ঘাটন
সূর্যের মতন
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চিরবিস্ময়।"

* * *

সহসা অবলুপ্ত জ্যোতিষ্কের শেষ কথা বলেও কথা শেষ হয় না। তবে মানুষের তীব্র জিজ্ঞাসার উত্তর একদিন মিলবেই। অবরুদ্ধ অতীত সেদিন দ্বার খুলবে এবং বুকের যন্ত্রণা বাঙ্ময় হবে।

স্তব্ধ প্রতীক্ষা অন্তহীন নিষ্প্রভ আশা
বহে বর্ষমাস মহাকাল আবর্তনে
দিগন্তে মিলায় আলো নামে মেঘমালা
স্থির নদী বন দেওদার হিম আবরণে।

●

নেতাজী সুভাষচন্দ্র
সম্পর্কে বরণীয়দের স্মরণীয় উক্তি

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন
(দেশবাসীর প্রতি)

আমি আমার উজ্জ্বলতম রত্ন সুভাষকে তোমাদের দিয়েছি। অপেক্ষা কর, তোমরা অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছবে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি; কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা—তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারা-দুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতেই তোমাকে অভিভূত করেনি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোন পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানো নি।

আজ আমি তোমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি।

মহাত্মা গান্ধী

নেতাজী যেভাবে তাঁর অনুগামীদের মন থেকে জাতি, ধর্ম ও প্রাদেশিকতার বিভেদ চিহ্ন মুছে দিয়ে সকলকে ঐক্যের বন্ধনে বেঁধে ভারতবর্ষের মুক্তি যুদ্ধে আত্মদান-ব্রতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন, তাঁর জীবন থেকে আমাদের তাই হল শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা। নেতাজীর এই অদ্বিতীয় মহান সাফল্য ইতিহাসে তাঁকে অমর করে রাখবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র দেশপ্রেমিকদের রাজাধিরাজ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একটি নমস্কার

তুমিতো আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ—তাইতো দেশের খেয়া-তরী তোমাকে বহিতে পারে না ; সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়।

তাইতো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড় পর্বত ডিঙাইয়া তোমাকে চলিতে হয়!—কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য তো প্রথম শৃঙ্খল রচিত হয়েছিল, কারাগার তো শুধু তোমাকে মনে করিয়াই নির্মিত হয়েছিল, সেই তো তোমার গৌরব!

তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার ?

এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার সে তো কেবল তোমারই জন্য!

দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই তো ভগবান এতবড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন।

মুক্তিপথের অগ্রদূত, হে পরাধীন দেশের রাজবিদ্রোহী, তোমাকে শত কোটি নমস্কার।

হেমন্তকুমার বসু

২৩শে জানুয়ারী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান পুরোহিত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন—সারা বাংলা তথা ভারতের আনন্দোৎসবের দিন।

জননেতা সুভাষচন্দ্রের জীবন কাহিনী রূপকথার মতোই রোমাঞ্চকর। আজ বলতে দ্বিধা নেই যে, নেতাজীর পূর্বে পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রনেতা সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এতোখানি বিস্ময়ের উদ্রেক করতে পারেন নি, সারা দুনিয়াব্যাপী এতো শ্রদ্ধাও অর্জন করতে পারেন নি।

ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক পর্যন্ত এই দীর্ঘ কর্মব্যস্ত জীবন-গাথা সারা দুনিয়ার মানুষকে স্তম্ভিত করেছে। তাঁর নেতৃত্ব দেবার নির্ভুল ক্ষমতা ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জন্য সারা দেশ তাঁকে নেতার আসনে বসাতে কোনদিন দ্বিধা করেনি।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে তাঁরই নেতৃত্বে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন এবং বীরত্বপূর্ণ কোহিমা সংগ্রাম ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের সূচনা করেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম, নৌবিদ্রোহ, ১৯৪২ সালের গণ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ইংরেজকে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করেছিলো। তার ফলে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট কংগ্রেসের নিকট ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করল।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে নেতাজী তাঁর এক ভাষণে দ্বিধাহীনভাবে বলেছিলেন, "আপনাদের জানা প্রয়োজন আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য দুটি। প্রথমটি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, এটি জাতীয় বিপ্লব। অপরটি ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। এটি সমাজ বিপ্লব।"

প্রতিটি মানুষকে আজ নেতাজীর আদর্শ ও পরিকল্পনাকে সার্থক করবার জন্য আহ্বান জানাই। জয় হিন্দ্।

সরোজিনী নাইডু

সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। তাঁর জীবনের শেষ কটি বছর—যদি তাই তাঁর শেষ জীবনকাল হয়—প্রাণবন্ত নাটকের মতো, মহান দেশপ্রেমিক তখন বিপুল উত্তেজনাময় গতিছন্দে উদ্ভাসিত। স্বাধীনতা লাভের দুর্জয় সংকল্পজাত তাঁর অচিন্তনীয় সাহস, নিখুঁত পরিকল্পনা, সংগঠন শক্তি এবং নেতৃত্ব বিদেশভূমে মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার মধ্যে অভিব্যক্ত। তিনি মুক্তি ফৌজের মাঝে যে গভীর জাতীয় ঐক্য, শৃঙ্খলাবোধ, আনুগত্য ও স্বদেশপ্রেম সঞ্চারিত করেছিলেন, আমার মতে তাই হল সুভাষচন্দ্রের দেশসেবার শ্রেষ্ঠ সাফল্যের নিদর্শন।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

মুক্তি সংগ্রামের উদ্দেশ্যে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন।

ডঃ এস রাধাকৃষ্ণন

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু একজন অদম্য দেশপ্রেমিক, যিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জাতির সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর নির্ভীকতা, ত্যাগ, দুঃখবরণ ও আত্মদান ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁকে পৌরাণিক পুরুষের মর্যাদা দান করেছে। ভবিষ্যৎ বংশাবলী গভীর শ্রদ্ধা ও গর্বের সহিত নেতাজীর জীবনের বিস্ময়-রোমাঞ্চময় ঘটনাসমূহ পড়বে এবং ভারতের মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম প্রধান বীর নায়করূপে তাঁকে প্রণতি জানাবে।

গোবিন্দবল্লভ পন্থ

সুভাষবাবু বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক এবং বিপ্লবী নায়কদের অন্যতম। বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার সংগ্রামে তিনি সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিলেন। নেতৃত্ব ও সংগঠন-কর্মে তিনি যে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন সমগ্র দেশবাসী সেজন্য তাঁকে নেতাজী নামে সম্মানিত করেছেন। নেতাজীর স্মৃতি কোনদিন কেউ ভুলবে না এবং নেতাজীর নাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

হরিবিষ্ণু কামাথ

নির্ভীক সংগ্রামী নায়ক নেতাজী দ্বিতীয় বিশ্ব-সমরকালে সিঙ্গাপুরে যে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর সৃষ্ট আজাদ হিন্দ ফৌজ পূর্ব এশীয় রণাঙ্গণে যে অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল, তার ইতিবৃত্ত মূঢ় অবিশ্বাসীদের মনে কৌতূহল ও বিস্ময় জাগিয়েছে। নেতাজী খাদ্য, পরিচ্ছদ এবং অস্ত্রাভাব ক্লিষ্ট তাঁর ক্ষুদ্র বীর সৈন্যদলের মনে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের যে বিস্ময়কর অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিলেন, তার জন্য শিবাজী, ওয়াশিংটন, গারিবল্ডি এবং কামাল আতাতুর্কের ন্যায় মুক্তিযুদ্ধের নায়করূপে তিনি ইতিহাসের গৌরবময় স্বর্ণ মন্দিরে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন।

সমুদ্রের ওপারে দূর দেশ দেশান্তরেও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এখন একটি স্মরণীয় নাম। এই শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশ দশকে সীমিত সংখ্যক অনুগামী নিয়ে নেতাজী কংগ্রেসের ভিতরে সংগ্রামী মনোভাব

গড়ে তুলতে ঝটিকাবেগে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছিলেন, তার প্রকৃতিও কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তাঁর সকল কর্ম এক অজ্ঞাত দুর্বোধ্য আত্মিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। তিনি ছিলেন মহাসমুদ্রের ন্যায় অশান্ত কিন্তু তাঁর অন্তরে যে গভীর ধ্যানস্তব্ধ শান্তি বিরাজ করত তা তাঁর সদা প্রশান্ত আনন ও বিশ্বজয়ী হাসির মধ্যে প্রকাশ পেত। যে তাঁকে চিনেছে সেই তাঁকে ভালবেসেছে। কিশোর বয়সে আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য হিমালয়ে গমন এবং পরিণত বয়সে স্বাধীনতার জন্য দুর্গম সীমান্ত অতিক্রম করে দেশের বাইরে গিয়ে মুক্তিসংগ্রাম সংগঠন, মূলতঃ চিরবিপ্লবী জীবনের একই অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। পরাধীন দেশের কোটি কোটি নিগৃহীত মানুষের মুক্তির আহ্বান সুভাষচন্দ্রকে অনমনীয় রাজবিদ্রোহী করে তুলেছিল। সমগ্র জীবনকে তিনি পরম আত্মিক সাধনা বলে মনে করতেন, তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী 'ভারত পথিক'এ তার সুর প্রতিধ্বনিত। নেতাজীর মাঝে সাধক ও যোদ্ধার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল।

কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক, গতিশীল ও সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন করবার উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই ফরোয়ার্ড ব্লকের সৃষ্টি। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, ফরোয়ার্ড ব্লক সাম্রাজ্য বিরোধী শক্তিগুলিকে একত্রিত করে মহাযুদ্ধকালে কংগ্রেসকে সক্রিয় করে তুলতে অনেকাংশে সফল হয়েছিল। 'ভারত ছাড়' ও 'দিল্লী চলো' দুটি অভিযানই স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিন্ন অংশ। আগস্ট বিদ্রোহে ফরোয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেস কর্মীদল একসাথে লড়েছিল। নেতাজীর স্বপ্নের ভারত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমরা যেন নেতাজীর মহান দেশসেবাব্রতের কথা ভুলে না যাই, আদর্শের প্রতি বিশ্বাস রেখে চলি। তাহলে আমরা সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারব এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বন্ধন-মুক্ত ভারতবর্ষ আত্মিক সাম্রাজ্যের অধীশ্বররূপে দেবত্বে উন্নীত হবে। জয় হিন্দ্।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯১৮ সালে একটি আর্ন্ত কলেজ অনুষ্ঠানে সুভাষচন্দ্রকে আমি প্রথম দেখি। তাঁর বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ এবং প্রতিভাদীপ্ত আননে অসামান্য বুদ্ধি-গভীরতা লক্ষ্য করে তাঁকে স্বতন্ত্র বলে মনে হয়েছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক ওটেন সম্পর্কিত ঘটনায় আমি দুঃখ-বোধ করেছিলাম। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সুভাষ এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলেন না। ছাত্রদের নেতা হিসাবেই তিনি দণ্ডিত হয়েছিলেন।

১৯১৯ সালে সুভাষ যখন আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে ইংলণ্ডে ছিলেন, আমিও তখন সেখানে ছিলাম। লণ্ডনে গাওয়ার স্ট্রীটের শেক্সপীয়র কুটির ক্লাবে আমাদের মধ্যে প্রায়ই দেখাশুনা হতো। ১৯৩৫ সালে ভিয়েনায় আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, সুভাষ তখন ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত নেতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অদম্য যোদ্ধারূপে সর্বত্র পরিচিত। এই সময় সুভাষের সহিত জাতীয় মুক্তি ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনা হয়েছিল।

বহু ভাষাভাষী ভারতবর্ষে ভাষা বিরোধ নিরসন কল্পে এবং ভাষাকে আধুনিক সুবিধাযুক্ত করবার উদ্দেশ্যে, আমি জাতীয় ভাষা হিন্দুস্থানীকে রোমান হরফে প্রচলনের সুপারিশ করি। সুভাষ আমার অভিমত গ্রহণ করেন এবং হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তাঁর ভাষণে দেশবাসীর সামনে সেই অভিমত উপস্থাপন করেন।

সুভাষ জীবিত নেই, তাঁর আসন এখন বিশ্বের বীরশ্রেষ্ঠ মণ্ডলে। যুদ্ধনিপুণ শৌর্যময় ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যারা দেড়শত বছর ব্রিটিশ রাজত্বকালে মোহাচ্ছন্ন আজ্ঞাবহ মাত্র ছিল, তিনিই সর্বপ্রথম তাদের মধ্যে এই চেতনা জাগিয়েছিলেন যে তারাও মানুষ, দেশের প্রতি তাদের কর্তব্য আছে এবং চিরদিন তারা ব্রিটিশের ক্রীড়নক হয়ে

থাকতে পারে না। সুভাষই প্রথম স্বাধীন ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠাতা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরমে'র ন্যায় মহান জাতীয় প্রণতি বাক্য 'জয় হিন্দের' স্রষ্টা।

সুভাষের নাম ও তাঁর গৌরবময় কর্মসাধনা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের সামনে আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে এবং বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে। সাময়িক হলেও এমন ব্যক্তির পরিচয়স্পর্শলাভকে আমি পরম ভাগ্য বলে মনে করি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বদেশপ্রেম ও মহান দেশ সেবার জন্য সুভাষ ভারতবর্ষের মহত্তম দেশপ্রেমিক ঋষি।

সত্যরঞ্জন বক্সী

ইয়েটস লিখেছিলেন, সকল মহান সাহিত্যই পুরাণ বিশেষ, সৃজনশীল ও বিশ্লেষণধর্মী, ব্যক্তিভাবনার সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর বিশ্বভাবনায় উত্তরিত। সত্যিকার সার্থক সাহিত্যের ন্যায় সত্যিকার মহাপুরুষগণও বিশ্বজনীন। তিনি দেহী এবং দেহমুক্ত আত্মিক সত্তা। তিনি কারো অনুকরণ নন, নিজের মাঝে নিজে বিকশিত এবং বাঙ্ময়। সুভাষচন্দ্র বসু তেমনই একজন পুরাণ পুরুষ। তিনি নিজেই তাঁর বিস্ময় রহস্যময় পুরাণের স্রষ্টা, রূপকথা, কাব্যসঙ্গীত, ভাবনা, কর্মে—একটি পূর্ণ আলেখ্য।

সুভাষচন্দ্র বসুর তেজ, গৌরব, ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় ব্যক্তিত্ব এবং সম্মোহন শক্তির প্রকাশ আই. এন. এ-র মাঝে—যার সবই অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়কর। কিছু প্রচারক ও রাজনৈতিক দল লঘু চিন্তাপ্রসূত বুদ্ধিতে নেতাজীর মহান নামকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। নেতাজী ফ্যাসীপন্থী ছিলেন? নেতাজী মার্কসবাদী ছিলেন? যেন যুগান্তকারী একটি মহাপুরুষকে কোন বিশেষ 'ইজমের' প্রচলিত অবখ্যাত গণ্ডির মধ্যে ধরা যায়? সুভাষচন্দ্র ধূলিমলিন জীর্ণপথের পথিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন নূতন পথের অক্লান্ত দিশারী।

পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধ জয়ী মহান নায়ক। তিনি বর্তমান ভারতের নির্মাতা। ভারতমাতার জন্য তিনি নিজের পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং দেশের বাইরে গিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র মুক্তি-ফৌজ গড়ে সংগ্রাম করেছিলেন তা তাঁর বিস্ময়কর আত্মশক্তির পরিচয় বহন করছে। তাঁর স্বল্প পরিমিত সংগ্রামী জীবন আমাদের দেশের স্থিতিসংস্থাপক হয়েছে।

আচার্য নরেন্দ্র দেব

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু নবভারতের অন্যতম প্রধান নির্মাতা। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল চিত্তাকর্ষক, তিনি ছিলেন প্রকৃতিসিদ্ধ জননেতা। তাঁর জীবন ছিল ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ, সাফল্য ও ব্যর্থতা পরিপূর্ণ। কিন্তু আদর্শ থেকে তিনি কখনো বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। মহাযুদ্ধকালে তাঁর পরিকল্পনা ও সংগঠন শক্তির উজ্জ্বলতম বিকাশ ঘটে, আজাদ হিন্দ ফৌজের বিস্ময়কর ইতিবৃত্ত ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় হয়ে থাকবে এবং চিরদিন দেশবাসী তাঁর নাম সশ্রদ্ধায় স্মরণ করবে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

নেতাজী শুধু সাহসীই ছিলেন না, ছিলেন স্বাধীনতা প্রেমিক। তিনি যা কিছু করেছেন সবই ভারতের স্বাধীনতার জন্য। সারা জীবন ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য তিনি স্বকীয় পন্থায় সংগ্রাম করেছেন, সে বিষয়ে কারো মনে কোন সন্দেহ নেই।

ডঃ অমিয় চক্রবর্তী

নেতাজী সুভাষচন্দ্র আমাদের অনেকেরই কাছে আত্মীয়-স্বজনের মতো, তিনি আমাদের চিত্তের আপনতায় সুপ্রতিষ্ঠ। দেশনায়করূপে তাঁর যে মহীয়ান মূর্তি সর্বভারতীয় মানসে প্রকাশ হয়েছে, তার ভূমিকা প্রধানতঃ বহির্দেশীয় এবং যুগ সঙ্কটের বিদ্যুৎ অন্ধকারে দূর হতে ধ্যানদৃষ্টি-গোচর। স্বদেশেও তিনি তাঁর নেতৃত্বশক্তি দ্বারা প্রতিভাত হন, সেই শক্তিই জয়বাহিনী সেনা সংগঠনের বহু সাম্প্রদায়িক একত্বে এবং দৃঢ়তায় শেষ উজ্জ্বলতমরূপে দেখা দিল।

আমার মনে আছে, সুভাষচন্দ্র যখন শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন, তখন রাষ্ট্রিক আলোচনাকে অতিক্রম করে বাংলার গ্রাম্যজনের সুখ-দুঃখের প্রশ্ন এবং ভারতীয় সমাজের চিরদৈনিক সমস্যাগুলিই বড়ো হয়ে উঠত। কঠোর বীর্যশীল নেতার অন্তরস্থিত কোমল স্বভাবের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, ত্যাগে কর্মে অচলবিধৃত তাঁর সেই হৃদয়বৃত্তিকে কবি কতো বড় শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিয়ে গেছেন। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ গদ্য প্রশস্তি লিখে তাঁকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আবাহন করবার আয়োজন করেছিলেন, সেই রচনাটিতে স্নেহের শঙ্খ বেজে উঠেছে, বহুদিন পর্যন্ত যা বাঙালির হৃদয়ে ধ্বনিত হবে। বাঙালির তারুণ্য-মণ্ডিত তার নূতন নেতাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনের মঙ্গলমাল্য পরিয়ে গেলেন, তখনো সুভাষচন্দ্রের শিখর গৌরব প্রকাশিত হয়নি।

সুভাষচন্দ্রের মহা ভারতীয় মূর্তি আজ আমাদের আর্দ্র দৃষ্টির সম্মুখে বিরাজমান কিন্তু তাঁর সহজ প্রকাশের পূর্বতন অনুষঙ্গ

আমাদের নানাভাবে মনে রাখা দরকার। যেখানে ভাইয়ের দাক্ষিণ্য, মায়ের ভগিনীদের সিঁদুর শঙ্খ মঙ্গল প্রদীপের অনুপ্রেরণায় এবং অগণ্য সহকর্মীর কল্যাণ বাণীতে তিনি দেশের প্রত্যেক পরিবারের একান্ত নিজের মানুষ, সেখানেও তিনি অমরাবতীর অধিকারী।

এক সময় হিটলার সুভাষচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করতে চান নি। মহাযুদ্ধের সময় সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে হিটলারের মন বদলেছিল কিন্তু হিটলারের সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব কোনোদিনই যে বদলায়নি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশেও এই প্রসঙ্গে আজ পর্যন্ত অনেকে সুভাষচন্দ্রকে ভুল বুঝেছেন। কাঁটার কাছে অন্য কাঁটা তোলার জন্য যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, কণ্টককে ভুলে ভেবেছি পুষ্প। কাউকে ব্যবহার করা এবং তাকে যথার্থ গ্রহণ করা একই রীতি নয়। জাপানীদের ব্যবহারেও সম্পূর্ণ জানা গেল 'ব্যবহার' করবার রীতি কত ভয়ঙ্কর, সমূহ বিপদসঙ্কুল, কিন্তু প্রখর বুদ্ধি সুভাষচন্দ্র এ বিষয়ে চক্ষুষ্মান হয়েই ভুল করেছিলেন। একদিনের জন্যও তিনি হিটলার-মুসোলিনীর সমর্থক ছিলেন না। প্রথম হতেই নাৎসি-প্রবর্তিত ইহুদি-বিদ্বেষ, পরজাতি ঘৃণাকে তিনি ঘৃণাই করতেন।

সুভাষচন্দ্রের গৃহ থেকে অন্তর্ধানের সংবাদ পেয়ে ব্যাকুল হয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বস্তসূত্রে খবর নেন, এবং কয়েকদিনের মধ্যেই জানতে পারেন যে নির্বিঘ্নে সুভাষচন্দ্র অন্য দেশে গিয়ে পৌঁচেছেন। আর কিছু রবীন্দ্রনাথ জানতে চান নি।

তারপর সুভাষচন্দ্রের পালা শেষ হয়ে নেতাজীর অভ্যুদয়। দিগন্তে অবিশ্বাস্য উজ্জ্বল তারা উঠল। দূর থেকেই আমরা দেখলাম। যাঁরা কাছে থেকে দেখেছেন, তাঁদের কাহিনী ফুরোয় না, শুনেও তৃপ্তির শেষ নেই। নেতাজীর জয়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র পৃথিবী ছেড়ে গেছেন, আজ আর সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু গভীরতর অর্থে তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের ভূমিতে বেঁচে রইলেন! 'জয় হিন্দ্' মন্ত্র তিনিই উচ্চারণ করেছিলেন, সেই মন্ত্রের ধ্বনি আজ ভারতের কোটি কণ্ঠের স্বাধীনতা-অভিনন্দনে জেগে উঠল। সেই মন্ত্রের সঙ্গে তাঁর প্রাণশক্তি অনন্তকালের মতো ভারতবর্ষে রয়ে গেল।

বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বহু শতাব্দী ধরে বিদেশী শত্রু ভারতের সীমানা পেরিয়ে এদেশে হামলা করেছে—পরস্পরের মধ্যে বিবদমান রাজশক্তিদের হতবল করেছে। সারা দেশকে অধীনতার অপমানে জর্জরিত করেছে। এই প্রথম ভারতের সন্তান ভারত-মাতার শৃঙ্খল মোচন করবার জন্য প্রচণ্ড শক্তির বিরুদ্ধে নির্ভয়ে দাঁড়াতে সাহস করেছিলেন—সে কথা ভোলার নয়। পরে অবশ্য কি হল জানা নেই—এই বীর সন্তান গগনে উল্কার মতো আবির্ভূত হয়ে আবার কোথায় মিলিয়ে গেলেন সেটার ইতিহাস জানা নেই—নানা লোকে নানা কথা বলে—এ বিষয় অনেকটা আন্দাজী। আমার মনে হয়, সুভাষ বেঁচে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই দেশে ফিরে আসতেন—লোকে যে বলে তিনি নির্যাতন এড়িয়ে আত্মগোপন করে আছেন সেটা তাঁর স্বভাবের সঙ্গে খাপ খায় না।

রফি আহমেদ কিদোয়াই

১৯২৩ সালে দিল্লীতে সুভাষ বসুর সহিত আমার প্রথম পরিচয়। কংগ্রেসে তখন আইন-সভায় প্রবেশ কর্মসূচী নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, হাকিম আজমল খাঁ, বিঠলভাই প্যাটেল প্রভৃতি ছিলেন আইন সভায় প্রবেশের পক্ষে এবং রাজা গোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডাঃ আনসারী এবং সর্দার প্যাটেল ছিলেন এর বিরুদ্ধে। দেশবন্ধুর সহযোগীরূপে তরুণ সুভাষবাবু বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। উৎসাহী যুবক সুভাষবাবুর মধ্যে বিদেশী শাসন থেকে দেশের মুক্তির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা সেদিন লক্ষ্য করেছিলাম। পরবর্তীকালে সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষাই তাঁর সকল কর্মের প্রেরণা যুগিয়েছে।

সুভাষবাবুর প্রভাব শুধু বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র ভারতের যুবা সম্প্রদায় তাঁর অসীম উৎসাহ ও ত্যাগের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং অল্পকাল মধ্যে তিনি কংগ্রেসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। সুভাষবাবুর নিকট কংগ্রেসের গতানুগতিক রাজনীতি গ্রহণীয় হয়নি, অহিংসাকেও তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র পন্থা বলে স্বীকার করেন নি। সেই কারণে গোঁড়া গান্ধীবাদীদের সহিত তাঁর বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সুভাষবাবু বুঝতে পেরেছিলেন, ১৯২০ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মসূচী তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে, সুতরাং বিকল্প নতুন কর্মপন্থার প্রয়োজন। তিনি সাহসের সঙ্গে নতুন পন্থা গ্রহণ করেছিলেনও। ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাঁর সঙ্গে পুরাতন-পন্থীদের বিরোধ প্রকাশ্য রূপ নেয় এবং পুরাতন-পন্থীরা বিজয়ী হয়। ফলে সুভাষবাবুকে কংগ্রেস ছাড়তে হয়।

সুভাষবাবুর গোপনে দেশত্যাগ, জার্মানী ও জাপানে গমন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন দেশবাসীকে মুগ্ধ করেছে। তিনি আজ

অসামান্য জাতীয় বীর নায়কের সম্মানে ভূষিত। প্রতিটি মানুষ গর্ব ও ভাবাপ্লুত হয়ে তাঁর কথা স্মরণ করে।

মেজর জেনারল শাহ নওয়াজ খান

একথা আমার স্বীকার করতে বাধা নেই যে, যে মুহূর্তে আমি নেতাজীর সান্নিধ্যে এসেছি তখনই আমি তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। নেতাজীকে আমি মানুষ, যোদ্ধা এবং রাজনীতিজ্ঞ—এই তিন রূপে দেখেছি। কিন্তু এখনও আমি জানিনে, এই তিন রূপের কোনটি তাঁর বড় আর কোনটি তাঁর ছোট। ঘরে থাকবার সময় মনে হত মানুষ হিসাবেই তিনি বড়, যুদ্ধক্ষেত্রে ও সৈন্যদলের মাঝে তাঁকে দেখে মনে হত এতবড় যোদ্ধা আর হয় না। আবার যখন তিনি সভাসমিতি, বৈঠক অথবা আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বাধিনায়করূপে কাজ করতেন তখন তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা আমাদের মুগ্ধ করত।

ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে যে সকল ভারতীয় বাহিনীর অফিসার মানুষ হয়েছে আমি ছিলাম তাদের একজন। আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রথম যখন গঠিত হয় তখন আমি তার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম। আমি ব্রিটিশের প্রতি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলাম। জাপানীদের অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ ছিল। নেতাজী যখন এলেন তখন আমি তাঁকে ভালভাবে যাচাই করে নিতে ভুলিনি। তাঁর নির্ভীক আচরণ, গভীর স্বদেশপ্রেম এবং দেশের জন্য তিনি সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত সেই চিন্তা আমাকে

মুগ্ধ করল। অল্পদিনের মধ্যে বুঝতে পারলাম নেতাজী জাপানীদের কাছে নতি স্বীকার করবার লোক নন।

জাপানীদের সঙ্গে একত্রে কাজ করলেও, যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের পৃথক সেকটর ছিল, সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করত। তার উপর জাপানের কোন কর্তৃত্ব ছিল না।

নেতাজীর মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থের অথবা উচ্চকাঙ্ক্ষার নাম গন্ধ ছিল না। বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া সম্মেলনে জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারল তোজো তাঁর বক্তৃতার একস্থানে বলেন—স্বাধীন ভারতে নেতাজীই হবেন সর্বেসর্বা। সঙ্গে সঙ্গে নেতাজী উঠে দাঁড়িয়ে এ কথার প্রতিবাদ করে বলেন—এমন কথা বলবার কোন অধিকার জেনারল তোজোর নেই। স্বাধীন ভারতে কে কি হবেন তার সিদ্ধান্ত করবে ভারতের অধিবাসীরা। তিনি নিজে ভারতের একজন দীন সেবক মাত্র।

নেতাজীর কাছে ধর্মীয় বা প্রাদেশিক ভেদাভেদ ছিল না। তাঁর অনুপ্রেরণায় আমরা হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সবাই এক হয়ে গিয়েছিলাম। মানুষ হিসাবে কে কেমন—তাই দেখে নেতাজী লোককে সম্মান দিতেন। জার্মানী থেকে সাবমেরিনে বিপদসঙ্কুল পথে পূর্ব-এশিয়া যাত্রায় যাঁকে তিনি সঙ্গী নির্বাচন করেন তিনি এক মুসলিম তরুণ, আবিদ হাসান। তাঁর সৈন্যদল যখন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত তখন দুজন ডিভিশন কমাণ্ডারই ছিলেন মুসলমান—মেজর জেনারল কিয়ানি এবং আমি।

ভয় কাকে বলে নেতাজী জানতেন না—জীবনের কোন প্রকার সুখ সম্ভোগের জন্যও তিনি বিন্দুমাত্র লালায়িত ছিলেন না। আমি বহুবার দেখেছি অল্পের জন্য তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছেন। কোন দৈবশক্তি রক্ষা-কবচ যেন তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। এই সব দেখেছি বলেই আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, তিনি মারা গেছেন।

জন এ. থিবি

(আই. এন. এ.)

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসুর সহিত নেতাজী ১৯৪৩-এর ২রা জুলাই বিমান থেকে সিঙ্গাপুরে অবতরণ করলেন। আই. এন. এ. এবং ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের প্রতিনিধিবর্গ বিমান বন্দরে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর উপস্থিতিতে সকলে আনন্দ ও আশায় উচ্ছ্বসিত হল। এক নিমেষে তিনি আমাদের হৃদয় জয় করলেন। আমি অতিশয়োক্তি করছি না, যা ঘটল তাই শুধু বলছি। নেতাজী শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে আমাদের আশ্বাস দিলেন, আমরাও তাঁর প্রতি আমাদের আনুগত্য ও বিশ্বাস জানালাম। তিনি আমাদের নেতাজী হলেন।

নেতাজীর অক্লান্ত চেষ্টায় সেনাবাহিনী ও ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ পুনর্গঠিত হল। তিনি আমাদের বললেন—সশস্ত্র সংগ্রাম করে, প্রয়োজন হলে জীবন বলি দিয়ে, আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে এবং ভারত স্বাধীন হলে আই. এন. এ-র আদর্শে দেশের প্রতিরক্ষা-বাহিনীকে গড়তে হবে—যা চিরদিন ভারতের স্বাধীনতাকে রক্ষা করবে।

নেতাজীর ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনে গোপন চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্রের স্থান ছিল না, এমন কি ব্রিটিশের বিরুদ্ধেও নয়। তাঁর অভিমত ছিল, সকল সংগ্রামই প্রকাশ্য ও ঘোষিত হওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং বিশ্বপরিস্থিতি সম্বন্ধে নেতাজীর জ্ঞান

ছিল অপরিসীম। তাঁর সাহসিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, রাজনৈতিক জ্ঞান এবং ত্যাগব্রত ছাড়া ভারতের মুক্তিযুদ্ধ নানা সংকট, জাপানের অহেতুক কর্তৃত্ব এবং গুপ্তচরদের নাশকতামূলক তৎপরতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করে এগিয়ে যেতে পারত না।

অনেকে বলেন নেতাজী বেঁচে নেই। তাই হয়ত সত্য। জীবনের শেষে মৃত্যু আছেই। নেতাজীর সহকর্মী ও অনুগামীদের অন্তরে কিন্তু নেতাজী চিরজীবী। তাঁর স্মৃতি বুকে রেখেই শুধু আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পারি।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

উৎসাহদীপ্ত যৌবনের দিনগুলি থেকে সুভাষ ভারতের স্বাধীনতার জন্য গভীরভাবে আগ্রহী হয়েছিলেন এবং অসামান্য শক্তি ও একাগ্রতার সঙ্গে সঙ্কল্পসাধনে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দেশপ্রেম সন্দেহাতীত।

অনিমেষ রায় চৌধুরী

(স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রবন্ধকার)

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ইতিহাসের এক বৃহত্তম বিস্ময় প্রহেলিকা। তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা, ফরমোসার রাজধানী তাইহোকুতে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু, এমন কি তাঁর প্রাক্তন প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীমতী এমিলি শেংকলের সহিত তাঁর বিবাহের কথা গভীর রহস্যাবৃত।

ডঃ বা. ম.

(বার্মার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি)

সুভাষচন্দ্র অবিস্মরণীয় পুরুষ। যে লোক মাত্র একবার তাঁকে দেখেছে, সে-ও কখনো তাঁকে ভুলতে পারবে না। এমনি মূর্ত তাঁর মহত্ত্ব। তিনি বিপ্লববাদী। অন্যান্য বিপ্লববাদীর ন্যায় তাঁরও মহত্ত্ব এইখানে যে—একটিমাত্র কাজ, একটিমাত্র স্বপ্নকে কেন্দ্র করেই তিনি জীবন ধারণ করেছেন। সেই কাজ ও স্বপ্নের উপরেও তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। যুদ্ধের সময় যে স্বাধীন সরকার তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারই মধ্যে ভারতবর্ষের পরবর্তী স্বাধীনতার সূচনা। কয়েক বছর পরেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। সচরাচর যা ঘটে থাকে, এক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটল। একজন বীজ বপন করেছেন, অন্যেরা ফসল কেটেছে।

১৯৪৩-এর জুলাইতে সিঙ্গাপুরে নেতাজী বোসের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। টোকিও পৌঁছে আত্মপ্রকাশ-লগ্নে তিনি যে প্রথম বিবৃতিটি দেন তাতে যে সাহসিকতা, দৃঢ় সংকল্প ও আত্মশক্তির স্বাক্ষর ছিল তা বার্মাবাসীদের অন্তরে প্রবল আশার সঞ্চার করে এবং আমি নেতাজী বোসকে তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমি তখন বলি যে, আমাদের দুটি দেশ বহু বৎসর যাবৎ যে সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে, তা এসেছে এবং উভয় দেশকে সেই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করতে হবে।

মিঃ বোসের সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হত, অবশ্য তার বেশীর ভাগই ছিল যুদ্ধকে কিভাবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে কাজে লাগাতে পারি তাই নিয়ে। আমাদের প্রথম পরিচয় দিনের

স্মৃতিটি আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। ইউরোপে বহু জার্মান ও রুশ নেতার সহিত তাঁর সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়েছিল। যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর কোন ভ্রান্ত ধারণা ছিল না। সে সম্পর্কে তিনি ছিলেন বস্তুনিষ্ঠ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা যখন তিনি বলতেন আমাদের মনে হত আমরা যেন মানুষের মুখের কথা শুনছি না, শুনছি পবিত্র ধর্ম-কাহিনী। কথা বলতে বলতে তিনি ভাবাবেগে উদ্‌বেলিত হয়ে পড়তেন, তখন তাঁর মাঝে প্রকাশ পেত এক অজ্ঞাত শক্তি-তরঙ্গ, ত্যাগের মহিমা এবং ভবিষ্যতের পথ-সঙ্কেত।

কোহিমার যুদ্ধে জয়লাভ করে, আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এবং ইম্ফল অবরোধ করে, তখন জাপান হঠাৎ রণাঙ্গণ থেকে তার বিমানগুলি তুলে নেয়। বিমান-সাহায্য প্রত্যাহারের পক্ষে জাপানের যে কোন রাজনৈতিক বা সামরিক কারণই থাক না কেন, নেতাজী বোস এবং মুক্তি ফৌজের পক্ষে এ ছিল কঠিনতম আঘাত। তারপর থেকে ক্ষুদ্র মুক্তি ফৌজটি একটার পর একটা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে, সুযোগ বুঝে ব্রিটিশ তার বিশাল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালায়, অবশেষে শুরু হয় আকাশ থেকে অকাল বর্ষণ। দুর্ভাগ্য-পীড়িত আজাদ হিন্দ ফৌজ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়।

নেতাজী বোস হতোদ্যম না হয়ে নতুন করে ফৌজ পুনর্গঠন এবং জাপানীদের বাদ দিয়ে, বর্মা জাতীয় বাহিনীর সহিত একত্রে পুনরায় যুদ্ধারম্ভের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিপর্যয়ের পর, সসৈন্যে রেঙ্গুনে অবস্থানকালে, জাপানীদের সহিত নেতাজীর সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটেছিল। জাপানীদের হিসাবে ভারতবর্ষ বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ার অন্তর্গত ছিল না, সে কারণে ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ছিল সামান্যই।

১৯৪৫-এর এপ্রিলে চূড়ান্ত বিপর্যয় দেখা দেয়। ব্রিটিশ উত্তর

বর্মা পুনরাধিকার করে এবং বর্মা জাতীয় বাহিনী ব্রিটিশের পক্ষে যোগ দেয়। সেই চরম সংকটকালে আমি নেতাজী বোসকে জিজ্ঞাসা করি, "এখন কি করবেন?" তিনি ধীরভাবে উত্তর দেন, "কেন? সময়মত আবার সংগ্রাম শুরু করব।" তাঁর কথায় আমার চোখে জল আসে।

নেতাজীর কথা মনে পড়লে তাঁকে অভূতপূর্ব না ভেবে পারিনে। তিনি বাস্তব জগতের মানুষ এবং তার বাইরের কল্পলোকেরও, তাঁর মধ্যে এ দুয়ের অপূর্ব মিশ্রণ দেখেছি। আশা, আনন্দ ও বেদনাভরা ছিল তাঁর জীবন। তাতে যেমন ছিল সাফল্যের আলো, তেমনি নিরাশার আঁধার।

আলেকজাণ্ডার ওয়র্থ

(জার্মান গ্রন্থকার)

নেতাজী জার্মান সরকারের নিকট দৃঢ়ভাবে দাবি করেছিলেন যে, জার্মানীতে তাঁর কাজকর্ম হবে অবাধ, জার্মানী তাঁকে যে অর্থ সাহায্য দেবে তা ঋণ হিসাবে স্বীকার করে নিতে হবে, যুদ্ধের পর তিনি সে ঋণ শোধ করে দেবেন। জার্মানীর পররাষ্ট্র বিভাগ ও সর্বোচ্চ সমর পরিষদ তাঁকে যে সকল বিশেষজ্ঞ, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র সরবরাহ দেবে তা হবে জার্মানীর রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ মুক্ত। জার্মান সরকার নেতাজীর সকল দাবি স্বীকার করে নিয়েছিল। মিঃ বোস অথবা বার্লিনস্থ আজাদ হিন্দ বেতার কেন্দ্র কখনো নাৎসি মতবাদ প্রচার করেনি অথবা জার্মানীর অনুকূলে রাজনৈতিক বিতর্কে নামে নি। জার্মানীতে নেতাজী ও ভারতীয়দের কাজ ছিল, নাৎসিতন্ত্র থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

শৌর্য ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। জাপানীরা পশ্চাদপসরণ করলে, জয় আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও আজাদ হিন্দ ফৌজকে রণস্থল ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু তাদের যুদ্ধ বিফল হয়নি। কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, সশস্ত্র বিদ্রোহ, সন্ত্রাসবাদ, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৪২-এর বিদ্রোহের ন্যায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সাময়িক পরাভব প্রকৃত প্রস্তাবে সাফল্যের স্তম্ভ বিশেষ। এই সংগ্রামগুলিই ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা-লাভকে সম্ভব করেছিল।

এক অর্থে আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণ ক্রমেই বেশি করে বুঝতে পারছে যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের সৃষ্টি থেকে ব্রিটিশ বুঝেছিল যে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সে আর ভারতীয় বাহিনীর আনুগত্যের উপর নির্ভর করতে পারে না। নতুবা ব্রিটিশ কখনো স্বেচ্ছায় ১৯৪৭ সালে ভারত ছেড়ে চলে যেত না। ব্রিটিশ রাজনীতিকরা প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিপুল অর্থ ও প্রাণহানির পর, ইংলণ্ডের পক্ষে কেবল গোরা সৈন্যের দ্বারা ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না।

সেই কারণেই, যে চার্চিল সাহেব ভারতবর্ষকে সামান্যতম স্বাধিকার দানের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং জাপান কর্তৃক বর্মা দখলের পর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ভারতের সঙ্গে মিটমাটের জন্য তাঁকে যে অনুরোধ করেছিলেন তা অগ্রাহ্য করতে দ্বিধা করেন নি, তিনিই কিনা বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী হবার পর, ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। কংগ্রেস সরকার স্বাধীনতালাভের

সকল সম্মান গান্ধীজীকে দিয়েছেন, যদিও গান্ধীজীর পরিচালিত শেষ স্বাধীনতা আন্দোলন ১৯৩৪ সালে শোচনীয় ব্যর্থতার মধ্যে সমাপ্ত হয়েছিল। ১৯৪২-এর বিদ্রোহের সহিত গান্ধীজী যুক্ত ছিলেন না এবং তিনি বিদ্রোহীদের কর্মকাণ্ডকে প্রকাশ্যে নিন্দা করেছিলেন

কংগ্রেসে সুভাষ-বিরোধী প্রবাহের উৎস মহাত্মা গান্ধী। তিনি তাঁর অহিংসা নিয়ে এত বেশি ব্যাপৃত ছিলেন যে, দেশের স্বাধীনতার উপর অহিংসাকে স্থান দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের নিকট দেশের স্বাধীনতাই ছিল প্রধানতম লক্ষ্য। সেজন্য উভয়ের মধ্যে ঐক্যমতের স্থান ছিল না। গান্ধীজীর মন সর্বদা অহিংসার বিষয়ে নিবৃত্ত থাকত। ধর্মসাধকের জীবনে তার যথেষ্ট মূল্য থাকলেও, কংগ্রেসের ন্যায় একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা উপযোগী ছিল না। গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত তাঁর সমসাময়িক রাষ্ট্রনেতা হিটলার ও মুসোলিনীর ন্যায় কংগ্রেসে তাঁর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র গান্ধীভক্ত সীতারামিয়াকে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে পরাজিত করলে, গান্ধীজীর সুভাষ-বিরোধী রুদ্ধ আবেগের বিস্ফোরণ ঘটেছিল।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, যাকে গান্ধীজী তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন, প্রথমে সুভাষের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। গান্ধীজীর যাদু-প্রভাবিত ভক্তমণ্ডলে ঢুকবার পর তাঁর আচরণে পরিবর্তন দেখা দেয়। নেহরু নিজে স্বীকার করেছেন, গান্ধীজীকে তিনি ঠিক বুঝেন না, তাঁর বহু মধ্যযুগীয় ধারণার সহিত তিনি একমত নন, তবু তিনি কেন অন্ধের মতো গান্ধীজীকে অনুসরণ করেন তা বলতে পারেন না। নেহরু না বলতে পারলেও অন্যেরা ভালভাবে জানত যে, গান্ধীর গদি দখলের আগ্রহই তাঁর বিচারবুদ্ধি ও দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল।

১৯৪০ সালে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেও সুভাষচন্দ্র অবিলম্বে সংগ্রাম শুরু করবার জন্য গান্ধীজীর প্রতি সাগ্রহ আবেদন জানান। গান্ধীজী তাতে কোন সাড়া দেন না, নেহরু একপদ এগিয়ে ঘোষণা

করেন, "ব্রিটেন এখন জীবনমরণ যুদ্ধে লিপ্ত, আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা ভারতের পক্ষে মর্যাদাহানিকর।" কয়েকদিন পরে মহাত্মাও বলেন, "ব্রিটেনের ক্ষতিসাধন করে আমরা দেশের স্বাধীনতা চাই না। অহিংসার নীতি তা নয়।"

রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধীজীর ব্যর্থতা অপরিসীম। প্রতিটি আন্দোলনে জনসাধারণ যখন উৎসাহ-উদ্দীপনার শিখরে উঠেছে, তখনই তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

অধ্যাপক চিয়াং হাই ডিঙ

(সিঙ্গাপুর)

নেতাজী জাপানের তাঁবেদার বা সমর্থক ছিলেন না। তিনি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যেই জাপানের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। নেতাজীর সংগ্রামই ব্রিটিশ অধীনতা থেকে ভারতের মুক্তি ত্বরান্বিত করেছিল।

মাইকেল এডওয়ার্ডস

(ইংরাজ ঐতিহাসিক)

ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসী নেতাজী বসুর নিকট সর্বাধিক ঋণী, যদিও আপাত দৃষ্টিতে তাঁকে ব্যর্থ বলে মনে হয়। তিনি ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দ্ব্যর্থহীন ও বস্তুনিষ্ঠ। সুভাষচন্দ্র প্রাণ প্রাচুর্যে পূর্ণ কর্মোদ্যমের প্রতীক।

কর্ণেল এ. সি. চ্যাটার্জি

(আই. এন. এ.)

প্রত্যেক অফিসার, সৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবক স্ব-ইচ্ছায় ও স্বাধীন সম্মতি অনুসারে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেছেন। এই সংগঠনে কোন প্রাদেশিকতা বা সংকীর্ণ ধর্মভাব ছিল না। ব্যক্তিগত উন্নতির মানদণ্ড ছিল তাঁর কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা। সিঙ্গাপুরে যখন একবার টাকা তুলবার কথা হয়, তখন সেখানকার ধনী চেট্টিয়ার সম্প্রদায় নেতাজীকে বলে পাঠান—তাঁরা টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তাঁদের ধর্মমন্দিরে গিয়ে সেজন্য নেতাজীকে বলতে হবে।

তখন নেতাজী বললেন—যে কোন ধর্মাবলম্বীই হোন, মানুষ ভগবানকে ডাকতে পারে ; কিন্তু কর্মক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ব্যাপারে, দেশের ব্যাপারে ধর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তিনি মন্দিরে যেতে রাজী আছেন, যদি তাঁরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, শিখ নির্বিশেষে সকলকে তাঁদের মন্দিরে যেতে অনুমতি দেন। তা যদি না হয়, তাহলে তিনি টাকা চান না।

তাঁরা বলে পাঠালেন—যাকে খুশী তাকে নিয়ে নেতাজী তাঁদের মন্দিরে যেতে পারেন—তাঁরা কোন আপত্তি করবেন না।

সেদিন নেতাজীর সঙ্গে মুসলমান, হিন্দু, শিখ, খ্রীস্টান সব জাতীয় অফিসার ও সৈনিক চেট্টিয়ার দেব মন্দিরে প্রবেশ করেছিল।

সিঙ্গাপুরের ইতিহাসে তিনি প্রথম এ কাজ করেন। তার আগে সে মন্দিরে হিন্দু ছাড়া কেউ যায়নি এবং ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ মন্দিরের ভিতর ঢুকতে পারেনি।

শুধু তাই নয়, মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ এসে সকলের কপালে বিভূতি এঁকে দিয়েছিলেন, মায় মুসলমান ও খ্রীস্টান অফিসার পর্যন্ত।

পট্টভি সীতারামিয়া

সুভাষ মৃত্যুঞ্জয়, সে বিশ্বের নিকট প্রমাণ করেছে যে হিন্দুস্থান আজও বীর-প্রসবিনী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী।

ডঃ শোয়েকর্ণ

(ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত নায়ক হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। মিঃ গান্ধীর নীতি ছিল আপসমূলক, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একজন ব্রিটিশ সহযোগী।

[বান্দুং জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলন]

এস. এ. আয়ার

(নেতাজীর একান্তসচিব)

আমার সব সময় মনে হয়েছে যে, নেতাজী ঈশ্বরের নিকট থেকে তাঁর শক্তি লাভ করতেন। তাঁর সকল সিদ্ধান্তই ঈশ্বর-নির্ভর ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ঈশ্বর-নির্দিষ্ট। সেজন্য সাফল্য এবং ব্যর্থতার মাঝে তাঁর একই ধ্যান-প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ থাকত। ঈশ্বর-নির্ভরতার বিষয়টি ছিল তাঁর একান্ত আপনার, অপরের নিকট প্রকাশ পেত না। প্রকাশ্যে কথাবার্তায় কদাচিৎ তিনি ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করতেন। ঈশ্বর তাঁর অন্তরের গভীরে বিরাজ করতেন যেন। বাইবেলে বর্ণিত নিকোডিমাস খৃস্টকে যে কথা কয়টি বলেছিলেন তাই উল্লেখ করে আমি আমার কথা শেষ করব—"ঈশ্বর আপনার সঙ্গে না থাকলে আপনি যে-সকল অলৌকিক ক্রিয়া করেছেন, তা কোন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব হত না।"

মেজর আবিদ হাসান

(নেতাজীর একান্তসচিব)

প্রায় সবাই যা মনে করেন আমার ধারণাও তাই। তাইহোকুতে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনার খবর বাজে গল্প। তবে অন্য অনেকের মতো আমি কিন্তু মনে করতে পারছি না যে নেতাজী আবার আমাদের মধ্যে ফিরে আসবেন।

নেতাজী বেঁচে আছেন কিন্তু দেশে ফিরছেন না—একথা কি বীরশ্রেষ্ঠ নেতাজীর চরম অবমাননা করা নয়? ভারত যখন ভাগ হয়েছিল, তখন ভারতের মুক্তিসাধক নেতাজী তা রদ করার জন্য তেজোদ্দীপ্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন না—এটা কি আদৌ সম্ভবপর। অসাম্প্রদায়িকতার মূর্ত প্রতীক নেতাজী তাঁর প্রিয় হিন্দু-মুসলমানকে হানাহানি করতে দেখে দূরে থাকবেন—এ ঘটনা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য? দেশের সেই চরমতম দুর্দিনে নেতাজী মৃত্যুর পরোয়া না করে নিশ্চয় ভারতে ছুটে আসতেন। সেদিন নেতাজী ফিরলে গোটা দেশ নিশ্চয় তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হত এবং ভারত-ভাগ্যের দুর্দৈব ঘটত না। তিনি তাইহোকু দুর্ঘটনাতে মারা যাননি। তবে কোথায় মারা গেলেন তা আমি জানি না। হয়ত তাঁকে বন্দী করে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর স্বাস্থ্য যেমন ভাল ছিল তাতে সেই সময় তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটা অস্বাভাবিক হত।

শাহনওয়াজ কমিশন আমাকে সাক্ষী হিসাবে ডাকেনি। কিন্তু খোসলা কমিশন ডেকেছিল। কমিশনে গিয়ে আমি বলেছিলাম, ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগষ্ট নেতাজী যখন সাইগন বিমান বন্দর ছাড়েন তখন সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তারপর থেকে আমি নেতাজীর সহিত যোগসূত্রহীন। সুতরাং কমিশনকে জানাবার মত আমার কিছু নেই।

বাসন্তী দেবী

আজ সুভাষের জন্মদিন। তাই ওর কথাই আজ সকাল থেকে খালি বারবার মনে পড়ছে।

সুভাষ সেই যে গেল—আর এল না। ও যে নেই একথা ভাবা আমার পক্ষে ভয়ানক কষ্টের। কিন্তু ও যে আছেই একথাই বা আর কি করে জোর করে বলি! শুধু আমি তো নয়, দেশের কোটি কোটি মানুষই তো ওর কথা ভেবে এখনও দিশেহারা।

এমনিতে সঙ্কল্পে কঠোর হলেও মনের ভিতর ওর যে কী আশ্চর্য কোমলতা ছিল তা হয়ত তোমরা অনেকেই জানো না।

ও যখনই যেখানে যেত, ওর পেছনে গোয়েন্দা লেগে থাকত। একদিন রাত্রে ও আমাদের বাড়ী এসেছে—এসেই যেমন অভ্যেস, খাটের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়া—কিছুটা বিশ্রাম, সেই অবকাশে বোধহয় নতুন কিছু চিন্তার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া। সেদিন, লক্ষ্য করলাম বাড়ীর বিপরীত দিকের ফুটপাথে একজন ঠিক ঘোরাঘুরি করতে লেগে গেছে। আমি কিছুতেই সুভাষকে বাড়ী পাঠাতে পারছি না। বাইরে তখন টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে।

শেষে বলি,—হ্যাঁ সুভাষ, তুমি তো দিব্যি এখানে পড়ে রইলে, আর ওই বেচারা যে তোমার জন্য বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় ঠায় দাঁড়িয়ে—ও তো নড়তে পারছে না ডিউটি ফেলে।

সুভাষ মজা পেয়ে বলে উঠল—ভিজুক ব্যাটা দাঁড়িয়ে, যেমন পেছনে লেগেছে।

আমি বলি—তা ওর কি দোষ বলো। বেচারার চাকরি বাঁচাতেই

না এই কষ্ট। কিন্তু ওরও বাড়ীতে স্ত্রী কিংবা মা আছে, ছেলে-মেয়ে কিংবা ভাই-বোন আছে। ভেবে দেখতো, ওর জন্য তাদেরও কত ভাবনা হচ্ছে।

এটুকু বলতেই দেখি সুভাষের চোখ সজল, কোন মতে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে, চোখাচোখি হতে হয়ত বা একটু লজ্জিতও হল। আমি ওর অবস্থা বুঝতে পারছিলাম—অন্যের কষ্ট ও যে কিছুতেই সহ্য করতে পারত না—এমন কি কানে তেমন কিছু শোনা মাত্র ওর মন যেন ব্যথায় গলে পড়ত।

সেই সুভাষ!

তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে।—ঠিক করলাম আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়ব সে আন্দোলনে।

সুভাষ তো কিছুতেই রাজী হবে না। অথচ সে তখন বি. পি. সি. সি.-র প্রেসিডেন্ট। তার অনুমতি না নিয়ে আমাদের যাওয়াও চলে না। সে বলে—আগে আমরা যাই, তারপর তো মেয়েরা। এখনও আপনাদের যাওয়ার সময় হয়নি।

তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি—কিন্তু সে কি বোঝে! অনেক করে বুঝিয়ে শেষে রাজী করলাম। ৬ই মে আমরা আন্দোলনে যোগ দিলাম। ওঁর (দেশবন্ধুর) সম্মতি তো আগেই পেয়েছি। আমি, আমার ননদ ঊর্মিলা দেবী আর সুনীতি মিত্র গ্রেপ্তার হলাম। আমাদের নিয়ে যাওয়া হল বটতলা থানায়।

এদিকে আমাদের গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে প্রায় পাঁচ হাজার লোক বটতলা থানা ঘেরাও করে ফেলেছে। দারুণ উত্তেজনা। সেই জনতাকে কোন শক্তি দিয়েই রোখা যাচ্ছে না।

পুলিস অফিসারকে বললাম—আমার বাড়ীর গাড়ী আনার ব্যবস্থা করে দিতে। সেই গাড়ীতেই আমি জেলে যাবো, নইলে ওঁদের গাড়ীতে আমাদের নিয়ে যাবার ধাক্কা ওঁরা সামলাতে পারবেন না।

আমরা লালবাজারে এলে একজন ঊর্ধ্বতন পুলিস অফিসার

জানালেন, আমরা যদি লিখিতভাবে শপথ করি আন্দোলনে আর যোগ দেবো না, তবেই আমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। মজার কথা শোনো, শপথই যদি করবো তবে গ্রেপ্তার হলাম কেন! কর্তৃপক্ষ পড়লেন মহাবিপদে, একদিকে স্বাধীনতাকামী ক্ষুব্ধ দেশবাসী— আর একদিকে আইন। যা হোক, আমাদের জেলে পাঠানোই সাব্যস্ত হলো।

গেলাম জেলে।

ওমা, রাত দুটোয় হাঁকাহাঁকি।

কী ব্যাপার?

মুক্তির আদেশ এসে গেছে। চলে যেতে হবে।

জেলের অধ্যক্ষকে বললাম—রাতটা কাটুক, কাল সকালেই না হয় যাবো।

কিন্তু না, গভর্নরের আদেশ অবিলম্বে মুক্তির।

রাত দুটোয় অগত্যা বাড়ী।

আমাদের দেখে উনি তো অবাক, সেই সঙ্গে মহাক্ষুণ্ণও হলেন।

—ফিরে এলে?

—কি করবো? ছেড়ে দিলে যে।

রাত দুটোয় সুভাষও কোত্থেকে খবর পেয়ে এসে হাজির হয়েছে। মুখ তার তখনও কালো, সে মুখে কালবৈশাখীর গভীর অন্ধকার। বুঝলাম, সুভাষ তখনও শান্ত হয়নি।

হেসে বললাম—কি, এবার হয়েছে? ফিরে তো এলাম; আর কেন?

কালবৈশাখীর মেঘ সরে গেল, শুরু হলো বর্ষণ। কী ভালোই যে বাসতো আমাকে।

সুভাষ খুব ভালো রাঁধতে পারতো, তা জানো? ওঁর জন্য দিনের খাবার তো আমিই তৈরি করে নিয়ে যেতাম—রাত্রে ওঁর রান্না জেলের মধ্যে সুভাষ তৈরি করে দিতো। আর আমার কাজ কি

শুধু রোজ সকালের খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়া। রোজই সুভাষের ফর্দ থাকতো—বাজার থেকে এটা আনা চাই, ওটা আনা চাই। আর তার চাই বললেই তো সে এক প্রকাণ্ড দাবি হয়ে দাঁড়াতো!

অবশ্য মায়ের মতো বলে ছেলের আবদার ছিল যেমন, তেমনি বন্ধুর মতো তার মনের গোপন কথাগুলোও আমার কাছেই বলা চাই। ওর দুর্বলতা কোথায়, কতটুকু—তাও আমার কাছে গোপন করতে পারতো না—এই জন্য কতো সময় কতো যে আমরা হাসি ঠাট্টাও করেছি।

আজ সে সব দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে।

জ্যোতি বসু

নেতাজী সম্পর্কে আমরা কমিউনিস্টরা অতীতে যে সব কথা বলেছিলাম তা ভুল। আমরা আজ আমাদের ভুল স্বীকার করছি। কারও পদানত হয়ে থাকার জন্য নেতাজী কখনো কারও সাহায্য নেন নি। নেতাজী জাপানের সাহায্য নিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া নেতাজীর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। বিশেষ করে তাঁর মতো সংগ্রামী নেতা কখনো অন্য রকম ভাবতে পারেন না। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে আছে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরাট দান। নেতাজীর প্রেরণায় পরবর্তী-কালে নৌ, পুলিস, সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণের বিভিন্ন অংশ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। নেতাজীর অস্ত্রের আঘাতের জন্যই ইংরাজকে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয়েছে।

বনফুল

কোথাও যাও নি তুমি
আমাদেরই মাঝে আছো, হে বন্ধু মহান,
আমাদেরই অন্তর মাঝে, ওগো জ্যোতির্ময়,
আছো তুমি, আছো তুমি জানি
অন্ধকার আকাশেতে
ধ্রুব-নক্ষত্রের ভাতি চির অনির্বাণ
প্রভাতের আলোকেতে
সমুজ্জ্বল সত্য শিব সুন্দরের বাণী
তেমনি তুমিও আছো, হে সুভাষ, আমাদের প্রাণে
চিরন্তন ভারতের শাশ্বত সত্যের মাঝখানে
সভ্যতার সিংহাসনে সমাসীন রাজরাজেশ্বর
আছো তুমি ভরিয়া অন্তর।
তমিস্রা বিদীর্ণ করি নিত্য জাগে আলোকের রেখা
তার মাঝে পাই তব দেখা
যে প্রেরণা যুগে যুগে উত্তরিবে সুদুর্গম পথ
বীর্যবলে পার হবে অরণ্যানী সমুদ্র পর্বত
তুমি সে প্রেরণা
যে বাণীর তূর্যনাদে ধিক্কৃত হইবে পাপী
সমনস্ক হবে অন্যমনা
তুমিই সে বাণী
তারই মাঝে, হে অমর, আছো তুমি, আছো তুমি
আছো তুমি জানি।

জীবনপঞ্জী

২৩শে জানুয়ারী,	১৮৯৭	...	জন্ম
	১৯১৩	...	ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার
	১৯১৪	...	গৃহত্যাগ ও প্রত্যাবর্তন
	১৯১৭	...	সামরিক শিক্ষালাভ
	১৯১৯	...	দর্শনে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি. এ. ডিগ্রী লাভ
	১৯১৯	...	ইংলণ্ড যাত্রা
	১৯২০	...	আই. সি. এস. ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ডিগ্রী লাভ
	১৯২১	...	আই. সি. এস. ত্যাগ, ভারতে প্রত্যাবর্তন
১৬ই জুলাই,	১৯২১	...	বোম্বাইয়ে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ, দেশবন্ধু-সুভাষ মিলন, কংগ্রেসে যোগদান, জাতীয় বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ
ডিসেম্বর,	১৯২১	...	গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড
	১৯২২	...	কারামুক্তি, উত্তরবঙ্গে বন্যাত্রাণে নেতৃত্ব
	১৯২৩	...	স্বরাজ্য পার্টির সংগঠক, দৈনিক 'বাংলার কথা'র সম্পাদক ও 'ফরোয়ার্ডে'র পরিচালক
১০ই এপ্রিল,	১৯২৪	...	কলিকাতা পুরসভার প্রধান কর্মকর্তা
২৫শে অক্টোবর,	১৯২৪	...	১৮১৮ সালের ৩ আইনে গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে কারাবন্দী
	১৯২৫	...	মান্দালয় জেলে নির্বাসন
	১৯২৬	...	মান্দালয় জেলে অনশন, বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত
	১৯২৭	...	গুরুতর অসুস্থ
১৬ই মে,	১৯২৭	...	কারামুক্তি
নভেম্বর,	১৯২৭	...	বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সম্পাদক, নেহরু কমিটির সদস্য

ডিসেম্বর,	১৯২৮	...	হিন্দুস্থান সেবাদলের সভাপতি, কলিকাতা অধিবেশনে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন
	১৯২৯	...	পাঞ্জাব প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন, মধ্যপ্রদেশ যুব সম্মেলন, বেরারে অনুষ্ঠিত ছাত্র সম্মেলন, চট্টগ্রাম যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব
জানুয়ারী,	১৯৩০	...	গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড
আগস্ট,	১৯৩০	...	কলিকাতা পুরসভার মেয়র
২৬শে জানুয়ারী,	১৯৩১	...	কলিকাতায় শোভাযাত্রা পরিচালনকালে পুলিস কর্তৃক প্রহৃত ও গ্রেপ্তার
	১৯৩১	...	করাচীতে অনুষ্ঠিত নওজোয়ান ভারত সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব, করাচী কংগ্রেসে গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিরোধিতা
	১৯৩২	...	বোম্বাই-এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগদান করে ফেরার পথে ট্রেনে গ্রেপ্তার, বিনাবিচারে কারাবন্দী, জব্বলপুর জেলে গুরুতর অসুস্থ
	১৯৩৩	...	ইউরোপে নির্বাসন, চিকিৎসার জন্য ভিয়েনা গমন, জার্মানী, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, তুরস্ক, সুইজারল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ভ্রমণ, 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থ রচনা, বিঠলভাই প্যাটেল, রোমা রোঁলা, ডি. ভ্যালেরার সান্নিধ্যলাভ
	১৯৩৪	...	পিতার কঠিন পীড়ার সংবাদে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন ও স্বগৃহে অন্তরীণ
	১৯৩৫	...	ইউরোপ গমন, রোমে অনুষ্ঠিত এশীয় ছাত্র সম্মেলনে প্রধান অতিথিরূপে যোগদান, মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ, ডাবলিনে আইরিশদের

			নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন, ভিয়েনা সম্মেলনে যোগদান
	১৯৩৬	...	ভারতে প্রত্যাবর্তন, বোম্বাই বন্দরে জাহাজে গ্রেপ্তার, বিনা বিচারে কারাবন্দী, গুরুতর অসুস্থ
	১৯৩৭	...	চিকিৎসার্থে ইউরোপে নির্বাসন
	১৯৩৮	...	প্রবাসী ভারতীয়দের আমন্ত্রণে ইংলণ্ড গমন, বিপুল সংবর্ধনালাভ
	১৯৩৮	...	কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত, ভারতে প্রত্যাগমন কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে সভাপতিত্ব
	১৯৩৯	...	কংগ্রেসের সভাপতি পদে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত, পীড়িত অবস্থায় ত্রিপুরী অধিবেশনে সভাপতিত্ব, গান্ধীজীর সহিত মতানৈক্য, কংগ্রেস সভাপতির পদ পরিত্যাগ, 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন
	১৯৪০	...	ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব, রামগড় আপস-বিরোধী সম্মেলনে সভাপতিত্ব, হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলন, মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপন
জুন,	১৯৪০	...	ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার ও কারাবন্দী
ডিসেম্বর,	১৯৪০	...	কারামুক্তি, স্বগৃহে পুলিসের নজরবন্দী
জানুয়ারী,	১৯৪১	...	কলিকাতার বাসগৃহ থেকে নিরুদ্দেশ
মার্চ,	১৯৪১	...	কাবুল মস্কো হয়ে বার্লিনে উপস্থিতি, হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ
নভেম্বর,	১৯৪১	...	দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বার্লিন বেতারে ভাষণ
	১৯৪২	...	জার্মানীতে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতি, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন
ফেব্রুয়ারী,	১৯৪৩	...	জার্মানী থেকে সাবমেরিনে পূর্ব এশিয়া যাত্রা
মে,	১৯৪৩	...	পূর্ব এশিয়ায় অবতরণ, বিমানে টোকিও গমন
জুন,	১৯৪৩	...	জাপ-প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ, সাংবাদিক সম্মেলন
৪ঠা জুলাই,	১৯৪৩	...	সিঙ্গাপুরে শ্রীরাসবিহারী বসুর নিকট থেকে মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্বভার গ্রহণ, পূর্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়দের সম্মেলনে ভাষণদান

জুলাই-আগস্ট,	১৯৪৩	...	আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠন, ফৌজের সর্বাধিনায়ক
২১শে অক্টোবর,	১৯৪৩	...	সিঙ্গাপুরে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠা, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা
নভেম্বর,	১৯৪৩	...	টোকিওতে বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়া সম্মেলনে যোগদান, জাপ-অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিকার গ্রহণ, নানকিং, সাংহাই, ফিলিপিন, সাইগন ও মালয়ে প্রচার অভিযান
৩১শে ডিসেম্বর,	১৯৪৩	...	আন্দামান পরিদর্শন
জানুয়ারী,	১৯৪৪	...	সামরিক অভিযান সম্পর্কে জাপানের সহিত চুক্তি সম্পাদন, সিঙ্গাপুরে প্রত্যাবর্তন
৪ঠা ফেব্রুয়ারী,	১৯৪৪	...	রেঙ্গুনের অগ্রবর্তী সামরিক ঘাঁটি থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধযাত্রা, সর্বাধিনায়কের 'অর্ডার অব দি ডে' ঘোষণা
১৮ই মার্চ,	১৯৪৪	...	আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ, কোহিমার যুদ্ধে জয়লাভ, ইম্ফল অবরোধ
এপ্রিল,	১৯৪৪	...	জাপানের বিমান সাহায্য প্রত্যাহার, সহযোগী জাপ-বাহিনীর রণস্থল ত্যাগ, প্রচণ্ড অকাল বর্ষণে সরবরাহ বিঘ্নিত
২৪শে এপ্রিল,	১৯৪৪	...	আজাদ হিন্দ ফৌজের পশ্চাদাপসরণ
১লা নভেম্বর,	১৯৪৪	...	নতুন অভিযানের প্রস্তুতি সম্পর্কে টোকিও গমন
১৯ই ডিসেম্বর,	১৯৪৪	...	সিঙ্গাপুরে প্রত্যাবর্তন ও ফৌজ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ
জানুয়ারী-এপ্রিল,	১৯৪৫	...	ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বার্মায় প্রতিরক্ষা সংগ্রাম পরিচালনা
১৬ই আগস্ট,	১৯৪৫	...	জাপ সামরিক বিমানে সিঙ্গাপুর ত্যাগ
১৭ই আগস্ট,	১৯৪৫	...	সাইগনে আগমন ও জাপ সামরিক বিমানে নিরুদ্দেশ যাত্রা
২২শে আগস্ট,	১৯৪৫	...	টোকিও যাবার পথে ১৮ই আগস্ট তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু সংবাদ প্রচার

নির্ঘণ্ট-পত্র

ক

খ

গ

ন

প

ফ

আকর গ্রন্থপঞ্জী

Indian Struggle : Subhas Chandra Bose.
An Indian Pilgrim or Autobiography of Subhas Chandra Bose.
Netaji His life and work : Edited by Sri Ram Sharma.
Unto Him a witness : S. A Ayer.
The Springing Tiger : Hugh Toye.
Netaji in Germany : Alexander Werth.
History of the Indian National Congress : Pattabhi Sitaramayya.
History of Freedom Movement in India : R. C. Majumdar.
India Wins Freedom : Abul Kalam Azad.
The last years of British India : Michael Edwards.
The last Days of British Raj : Leonard Mosley.
My struggle : Adolf Hitler.
The Calcutta Municipal Gazette, Netaji Birth Day Supplement.
The History of Modern Times : D. M. Ketelbey.
The origin of the Second World War : A. J. P. Taylor.
Mutiny of the Innocents : B. C. Dutt.
Outline of History : H. G. Wells.
The I. N. A. and its Netaji : Major General Shah Nawaz Khan.
Gandhi and Civil Disobedience : Judith M. Brown.
Dissentient Report : Suresh Chandra Bose, Member Netaji Enquiry Committee.
Netaji Dead or Alive ? : Samar Guha.

ভারতে জাতীয় আন্দোলন : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব : ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়।
আমি সুভাষ বলছি : শ্রীশৈলেশ দে।
ভারতের মুক্তি সংগ্রাম : শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।
সুভাষ স্মৃতি : শ্রীবিশ্বনাথ দে সম্পাদিত।
নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা : সমর গুহ।
আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃতবাজার পত্রিকা, স্টেটস্‌ম্যান, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, যুগান্তর।
পত্রাবলী।

●

॥ পূর্ণ গ্রন্থতালিকা পরপৃষ্ঠায় ॥

॥ রম্য-রচনা ॥

প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়
[প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ঃ
কলকাতা হাইকোর্ট]

রাস্তা ৮.০০

॥ বিচিত্রা ॥

তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়

নারী রহস্যময়ী ৫.০০

॥ ধর্মতত্ত্ব ॥

কালীপদ সরকার
মুখবন্ধ ঃ শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী

কৃষ্ণকথা চিরন্তনী ১২.০০

ডঃ সুকুমার বসু ও
সুহৃদগোপাল দত্ত

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ ১২.০০

সৎ চিৎ আনন্দময় ঃ
শ্রীঅরবিন্দ ভাষ্য ৫ ০০

॥ ভক্তিগীতি ॥

কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়

মায়ের গান ৩.০০

॥ নাটক ॥

বের্টোল্ট্ ব্রেশট্/অজিত
গঙ্গোপাধ্যায়

মাল বাজারের মা-মালতী ১৫.০০

গোপীনাথ নন্দী

উমাবনম্ ঃ একত্রে
চারখানি নাটিকা ১০.০০

॥ কাব্য নাটিকা ॥

চিত্তরঞ্জন মাইতি

বসন্ত বিলাপ ৪ ০০

॥ উপন্যাস ॥

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপসী বিহঙ্গিনী ৫.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অন্য এক নাম ৪.০০

ঠিকানা সঠিক ৫.০০

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

আজও তারা ডাকে ৩.৫০

এখানে মৃত্যুর হাওয়া ৪.০০

এখানে মৃত্যুর হাওয়া ১.৫০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

একই বৃন্ত ৬.০০

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর মেলেনি ৩.০০

রমাদাস হালদার

ছন্দপতন ৪.০০

বিমলজ্যোতি দাস

মঞ্জরী ও মধুকর ৫.০০

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

নতুন জনপদ ৬.০০

নিঃসঙ্গ নায়ক ৩.০০

জ্যোতিরিন্দ্র রায়

প্রণয় এক প্রাণশিল্প ৬.০০

সুধাংশু ঘোষ

ফানুসের উপমা ৩.০০

সমরেশ বসু

যৌবন ৫.৫০

অজিতকৃষ্ণ বসু

শেষ বসন্ত ৪.০০

শেষ বসন্ত ১.৫০

দেবব্রত রেজ

স্বপ্নলোকের চাবি ৩.৫০

আশাপূর্ণা দেবী

শুধু তারা দুজন ৬.০০

।। উপন্যাস ।।

বাণী রায়

চক্ষে আমার তৃষ্ণা ৬.০০

বনশ্রী রায়

ধান শুধু ধান ৪.০০

জ্যোতির্ময়ী দেবী

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা ৪.৫০

শিপ্রা দত্ত

আলো-ছায়ার অন্তরালে ৬.০০

কাওআবাতা/সন্দীপকুমার ঠাকুর

তুষার গ্রাম ৬.০০

টমাস মান/সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মধুর আমি নারী ৩.০০

নাবোকভ/দেবব্রত রেজ

প্রজাপতি জীবন ৬.০০

স্তেফান জেবায়াইগ/দীপক চৌধুরী

উত্তরণ ৩.০০

দস্তয়েভস্কি/দেবব্রত রেজ

বাড়ীউলি ৪.০০

।। গল্প-সংগ্রহ ।।

মপাসাঁ/গীতা গুহরায় ও অরুণ চক্রবর্তী

মপাসাঁর সেরা প্রেমের গল্প ২০.০০

।। গল্প-সংগ্রহ ।।

তারাপদ রাহা পরিবেশিত

আরব্য রজনী

২য় পর্ব : পূর্বে প্রকাশিত ৫ম থেকে ৮ম খণ্ডের

২য় মুদ্রণ একত্রে ৩০.০০

২য়, ৩য় এবং ১০ম থেকে ১৬শ খণ্ড। প্রতি খণ্ড ৮.০০

স্তেফান জেবায়াইগ/দীপক চৌধুরী

স্তেফান জোয়াইগের গল্প-সংগ্রহ

১ম খণ্ড ৫.০০

বারট্রাণ্ড রাসেল/অজিতকৃষ্ণ বসু

শহরতলির শয়তান ৪.৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বরবর্ণিনী ৩.০০

চিত্তরঞ্জন মাইতি

অনেক বসন্ত দুটি মন ৩.৫০

।। অপরাধতত্ত্ব ।।

ডঃ সুকুমার বসু

মুখবন্ধ ঃ শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়

অপরাধ ও অপরাধী ১২.০০